জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

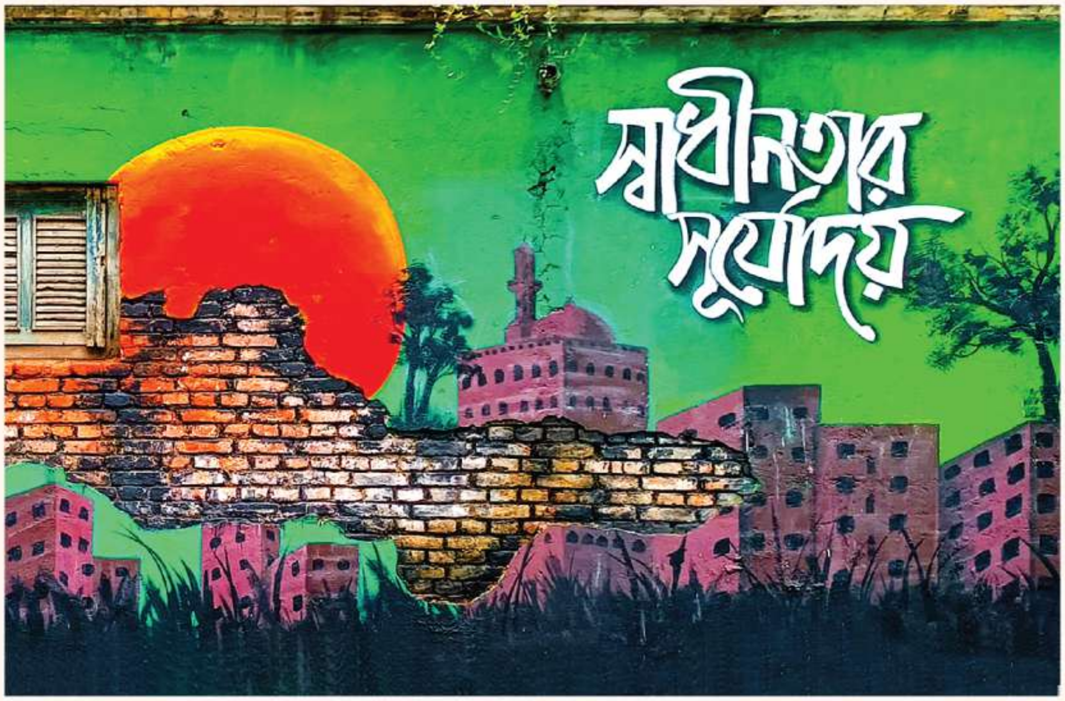
স্বাধীনতার
সূর্যোদয়

গড়ব
বাংলাদেশ

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	১ম খন্ড (ঢাকা সিটি)	
১	শহীদ মো: আসাদুল্লাহ	২৭-২৯
২	শহীদ মো: জোবায়ের বেপারী	৩০-৩৩
৩	শহীদ জসিম	৩৪-৩৬
৪	শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর	৩৭-৪০
৫	শহীদ জাবির ইব্রাহীম	৪১-৪৪
৬	শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম	৪৫-৪৭
৭	শহীদ মো: গোলাম নাফিজ	৪৮-৫১
৮	শহীদ খুবাইব আহমাদ	৫২-৫৫
৯	শহীদ রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ	৫৬-৫৯
১০	শহীদ সোহেল মিয়া	৬০-৬২
১১	শহীদ মিরাজ হোসেন	৬৩-৬৭
১২	শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস	৬৮-৭২
১৩	শহীদ মো: মাসুদুর রহমান জনি	৭৩-৭৬
১৪	শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকত	৭৭-৭৯
১৫	শহীদ মো: নুরু বেপারী	৮০-৮৩
১৬	শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ	৮৪-৮৭
১৭	শহীদ দীন ইসলাম বেপারী	৮৮-৯১
১৮	শহীদ মো: মমিনুল ইসলাম রিদয়	৯২-৯৩
১৯	শহীদ মো: নাঈম	৯৪-৯৭
২০	শহীদ মো: আব্দুল্লাহ কবির	৯৮-১০১
২১	শহীদ মো: নাদিম	১০২-১০৪
২২	শহীদ মো: মাসুদ	১০৫-১০৯
২৩	শহীদ মো: ইমন	১১০-১১৩
২৪	শহীদ মো: মেহেদী হাসান	১১৪-১১৭
২৫	শহীদ মো: সোহেল	১১৮-১২২
২৬	শহীদ মো: আসিব মিয়া	১২৩-১২৫
২৭	শহীদ মো: মাহাদী হাসান প্রান্ত	১২৬-১২৮
২৮	শহীদ মো: আহমাদ আব্দুল্লাহ	১২৯-১৩১
২৯	শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান জয়	১৩২-১৩৫
৩০	শহীদ মো: ইয়ামিন চৌধুরী	১৩৬-১৩৮
৩১	শহীদ মো: ইব্রাহীম খলিল	১৩৯-১৪২
৩২	শহীদ মো: আসিফ ইকবাল	১৪৩-১৪৫
৩৩	শহীদ লিটন হাসান লালু	১৪৬-১৪৯

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৪	শহীদ মো: শাহরিয়ার হাসান আলভী	১৫০-১৫২
৩৫	শহীদ মো: সেলিম আলী শেখ	১৫৩-১৫৫
৩৬	শহীদ ওবায়দুল ইসলাম	১৫৬-১৫৯
৩৭	শহীদ মো: হৃদয় হাওলাদার	১৬০-১৬৩
৩৮	শহীদ মো: নুর হোসেন	১৬৪-১৬৭
৩৯	শহীদ আব্দুর রহমান জিসান	১৬৮-১৭০
৪০	শহীদ মো: আরিফ	১৭১-১৭৪
৪১	শহীদ মো: সাজিদ হাওলাদার	১৭৫-১৭৭
৪২	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর	১৭৮-১৮২
৪৩	শহীদ মো: ইমন হোসেন আকাশ	১৮৩-১৮৬
৪৪	শহীদ মো: ইমন	১৮৭-১৮৯
৪৫	শহীদ আব্দুল জব্বার	১৯০-১৯৩
৪৬	শহীদ মো: নাসির হোসেন	১৯৪-১৯৭
৪৭	শহীদ রাকিব হোসেন	১৯৮-২০০
৪৮	শহীদ রাসেল মিয়া	২০১-২০৩
৪৯	শহীদ শাহ আলম	২০৪-২০৭
৫০	শহীদ আবু বকর রিফাত	২০৮-২১০
৫১	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম	২১১-২১৩
৫২	শহীদ মো: আসলাম	২১৪-২১৬
৫৩	শহীদ মো: জসিম	২১৭-২১৯
৫৪	শহীদ জিল্লুর শেখ	২২০-২২৪
৫৫	শহীদ মো: মনসুর মিয়া	২২৫-২২৭
৫৬	শহীদ মো: মোসলেহ উদ্দিন	২২৮-২৩০
৫৭	শহীদ মো: ইসমাইল	২৩১-২৩৩
৫৮	শহীদ মো: বাবুল হাওলাদার	২৩৪-২৩৭
৫৯	শহীদ মো: আমির হোসেন	২৩৮-২৩৯
৬০	শহীদ মো: নাইমুর রহমান	২৪০-২৪৫
৬১	শহীদ নুর হোসেন (পিয়াস)	২৪৬-২৪৮
	২য় খন্ড (ঢাকা সিটি)	
৬২	শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম	৭-৯
৬৩	শহীদ মো: রুমান	১০-১২
৬৪	শহীদ রমিজ উদ্দীন আহমেদ	১৩-১৬
৬৫	শহীদ মো: ইউসুফ মিয়া	১৭-২০
৬৬	শহীদ মো: আব্দুল মোতালেব	২১-২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬৭	শহীদ মো: সাব্বির হোসেন	২৪-২৬
৬৮	শহীদ জোবাইদ হোসেন ইমন	২৭-৩০
৬৯	শহীদ হান্নান	৩১-৩৩
৭০	শহীদ শফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফ	৩৪-৩৭
৭১	শহীদ মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ	৩৮-৪১
৭২	শহীদ মো: রমজান আলী	৪২-৪৪
৭৩	শহীদ মো: মনির হোসাইন	৪৫-৪৭
৭৪	শহীদ মো: ইসহাক জমদ্দার	৪৮-৫০
৭৫	শহীদ মো: শাহাবুদ্দিন	৫১-৫৩
৭৬	শহীদ মো: রাকিব হোসাইন	৫৪-৫৬
৭৭	শহীদ ইয়াসির সরকার	৫৭-৬১
৭৮	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর মৃধা	৬২-৬৫
৭৯	শহীদ মো: হাবিব	৬৬-৭০
৮০	শহীদ আবু ইসহাক	৭১-৭৪
৮১	শহীদ মো: রিয়াজ	৭৫-৭৭
৮২	শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীন	৭৮-৮২
৮৩	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৮৩-৮৬
৮৪	শহীদ মো: সাকিল	৮৭-৮৯
৮৫	শহীদ শাহরিয়ার হাসান রোকন	৯০-৯৩
৮৬	শহীদ মো: সুজন	৯৪-৯৬
৮৭	শহীদ মো: হোসেন	৯৭-৯৯
৮৮	শহীদ মো: সবুজ	১০০-১০৩
৮৯	শহীদ মো: আক্তার হোসেন	১০৪-১০৫
৯০	শহীদ মোহাম্মদ সাজিদুর রহমান ওমর	১০৬-১০৯
৯১	শহীদ মো: জাহিদ হোসেন	১১০-১১৩
৯২	শহীদ জাকির হোসেন	১১৪-১১৬
৯৩	শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ	১১৭-১২৩
৯৪	শহীদ নাসিব হাসান রিয়ান	১২৪-১২৭
৯৫	শহীদ মারুফ হোসেন	১২৮-১৩০
৯৬	শহীদ সুমন সিকদার	১৩১-১৩৩
৯৭	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম	১৩৪-১৩৬
৯৮	শহীদ মো: রিয়াজ	১৩৭-১৪০
৯৯	শহীদ মমিন ইসলাম	১৪১-১৪৩
১০০	শহীদ মো: সোহেল রানা	১৪৪-১৪৭

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১০১	শহীদ হাসনাইন আহমেদ	১৪৮-১৫০
১০২	শহীদ মো: সোহাগ	১৫১-১৫৪
১০৩	শহীদ মো: আলাউদ্দিন	১৫৫-১৫৭
১০৪	শহীদ সাব্বির হোসেন রনি	১৫৮-১৬১
১০৫	শহীদ মো: হাসিব আহসান	১৬২-১৬৪
১০৬	শহীদ জোবায়ের ওমর খান	১৬৫-১৬৭
	(সিলেট বিভাগ)	
১০৭	শহীদ মো: আকিনুর রহমান	১৬৮-১৭১
১০৮	শহীদ মো: সাদিকুর রহমান	১৭২-১৭৪
১০৯	শহীদ শেখ নয়ন হোসেন	১৭৫-১৭৮
১১০	শহীদ মো: আনাছ মিয়া	১৭৯-১৮১
১১১	শহীদ মো: মোজাক্কির মিয়া	১৮২-১৮৫
১১২	শহীদ মো: তোফাজ্জল হোসেন	১৮৬-১৮৯
১১৩	শহীদ মো: আশরাফুল আলম	১৯০-১৯২
১১৪	শহীদ মো: হাসাইন মিয়া	১৯৩-২০০
১১৫	শহীদ আজমত আলী	২০১-২০৩
১১৬	শহীদ মামুন আহমেদ রাফসান	২০৪-২০৬
১১৭	শহীদ মো: নাহিদুল ইসলাম	২০৭-২১০
১১৮	শহীদ মোনায়েল আহমেদ আষাঢ়	২১১-২১৪
১১৯	শহীদ রিপন চন্দ্র শীল	২১৫-২১৯
১২০	শহীদ তাজউদ্দিন	২২০-২২২
১২১	শহীদ মিনহাজ আহমদ	২২৩-২২৫
১২২	শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম	২২৬-২২৯
১২৩	শহীদ কামরুল ইসলাম পাবেল	২৩০-২৩২
১২৪	শহীদ জয় আহমেদ হাসান	২৩৩-২৩৫
১২৫	শহীদ সানি আহমদ	২৩৬-২৩৮
১২৬	শহীদ গৌছ উদ্দিন	২৩৯-২৪১
১২৭	শহীদ ময়নুল ইসলাম	২৪২-২৪৪
১২৮	শহীদ মো: রায়হান উদ্দিন	২৪৫-২৪৮
	৩য় খন্ড (সিলেট বিভাগ)	
১২৯	শহীদ তারেক আহমেদ	৭-৯
১৩০	শহীদ সোহেল আহমাদ	১০-১২
১৩১	শহীদ এটিএম তুরাব	১৩-১৫
১৩২	শহীদ পঙ্কজ কুমার কর	১৬-১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	(ঢাকা বিভাগ)	
১৩৩	শহীদ রিয়াজুল ফরাজী	১৯-২১
১৩৪	শহীদ মো: সজল	২২-২৬
১৩৫	শহীদ মো: শাকিল হোসেন	২৭-২৯
১৩৬	শহীদ নুর মোহাম্মদ সরদার	৩০-৩২
১৩৭	শহীদ মানিক মিয়া	৩৩-৩৫
১৩৮	শহীদ মো: ফরিদ শেখ	৩৬-৩৮
১৩৯	শহীদ মো: আল আমিন	৩৯-৪০
১৪০	শহীদ মো: সাইদুল ইসলাম শোভন	৪১-৪৩
১৪১	শহীদ মো: ইরফান ভূঞা	৪৪-৪৬
১৪২	শহীদ পারভেজ হাওলাদার	৪৭-৪৯
১৪৩	শহীদ ছলেমান	৫০-৫২
১৪৪	শহীদ আফিকুল ইসলাম সাদ	৫৩-৫৫
১৪৫	শহীদ **শহীদুল খান**	৫৬-৫৮
১৪৬	শহীদ সুমাইয়া বেগম	৫৯-৬০
১৪৭	শহীদ সৈয়দ মো: মোস্তফা কামাল রাজু	৬১-৬৩
১৪৮	শহীদ মো: মনির হোসেন	৬৪-৬৬
১৪৯	শহীদ হযরত বিল্লাল	৬৭-৬৮
১৫০	শহীদ মো: হোসেন	৬৯-৭০
১৫১	শহীদ শাইখ আস-হা-বুল ইয়ামিন	৭১-৭৪
১৫২	শহীদ মো: হৃদয়	৭৫-৭৬
১৫৩	শহীদ মো: তুহিন	৭৭-৭৮
১৫৪	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৭৯-৮১
১৫৫	শহীদ মো: ছায়াদ মাহমুদ খান (অন্তর)	৮২-৮৫
১৫৬	শহীদ সজল মিয়া	৮৬-৮৮
১৫৭	শহীদ আবদুর হান্নান	৮৯-৯১
১৫৮	শহীদ মো: আদিল	৯২-৯৪
১৫৯	শহীদ আব্দুর রহমান	৯৫-৯৬
১৬০	শহীদ মো: মাবরুর হুসাইন	৯৭-৯৮
১৬১	শহীদ মো: মেহেদী হাসান	৯৯-১০১
১৬২	শহীদ ইমরান হাসান	১০২-১০৩
১৬৩	শহীদ মো: স্বজন	১০৪-১০৬
১৬৪	শহীদ মো: মাহফুজ	১০৭-১১০
১৬৫	শহীদ মোশারফ	১১১-১১৪

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১৬৬	শহীদ মো: তুহিন	১১৫-১১৮
১৬৭	শহীদ মোহাম্মাদ নুরু	১১৯-১২২
১৬৮	শহীদ রাহাত হোসেন শরিফ	১২৩-১২৬
১৬৯	শহীদ মো: জুয়েল রানা	১২৭-১৩১
১৭০	শহীদ নাদিমুল ইসলাম এলেম	১৩২-১৩৫
১৭১	শহীদ মো: আরিফুল মিয়া	১৩৬-১৩৮
১৭২	শহীদ মো: সুজন খান	১৩৯-১৪২
১৭৩	শহীদ মো: কবির	১৪৩-১৪৫
১৭৪	শহীদ মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৪৬-১৪৯
১৭৫	শহীদ হাফেজ মো: শরিফুল ইসলাম	১৫০-১৫২
১৭৬	শহীদ মো: তাজুল ইসলাম	১৫৩-১৫৫
১৭৭	শহীদ মো: জাকির হোসেন	১৫৬-১৫৯
১৭৮	শহীদ মো: জুয়েল মিয়া	১৬০-১৬৩
১৭৯	শহীদ মো: নজরুল ইসলাম	১৬৪-১৬৭
১৮০	শহীদ মো: এলিম হোসেন	১৬৮-১৭০
১৮১	শহীদ জাকারিয়া হাসান	১৭১-১৭৪
১৮২	শহীদ মো: রশিদ	১৭৫-১৭৭
১৮৩	শহীদ কামাল মিয়া	১৭৮-১৮০
১৮৪	শহীদ শাখাওয়াত হোসেন শাহাদাত	১৮১-১৮৪
১৮৫	শহীদ মো: অহিদ মিয়া	১৮৫-১৮৮
১৮৬	শহীদ মো: সামিউ আমীন নূর	১৮৯-১৯২
১৮৭	শহীদ মো: রুখতন মিয়া	১৯৩-১৯৬
১৮৮	শহীদ জিয়াউর রহমান	১৯৭-১৯৯
১৮৯	শহীদ মোহাম্মাদ সাইফুল হাসান	২০০-২০২
১৯০	শহীদ মো: সুজন মিয়া	২০৩-২০৫
১৯১	শহীদ ফয়যুল ইসলাম রাজন	২০৬-২০৮
১৯২	শহীদ মো: আশিকুল ইসলাম রাব্বি	২০৯-২১১
১৯৩	শহীদ মো: ইমন মিয়া	২১২-২১৪
১৯৪	শহীদ কাজী মো: আব্দুর রহমান	২১৫-২১৯
১৯৫	শহীদ মো: শাওন	২২০-২২৪
১৯৬	শহীদ সুমন মিয়া	২২৫-২২৯
১৯৭	শহীদ জাহাঙ্গীর আলম	২৩০-২৩৪
১৯৮	শহীদ মো: মহসিন	২৩৫-২৩৭
১৯৯	শহীদ আমজাদ হোসেন	২৩৮-২৪০

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২০০	শহীদ রিয়া গোপ	২৪১-২৪৩
২০১	শহীদ আহসান কবির শরীফ	২৪৪-২৪৮
	৪র্থ খন্ড (ঢাকা বিভাগ)	
২০২	শহীদ মো: সাগর আহম্মেদ	৭-১০
২০৩	শহীদ মো: সিরাজুল বেপারী	১১-১৪
২০৪	শহীদ সামচু মোল্যা	১৫-১৭
২০৫	শহীদ মুহাম্মদ জান শরিফ (মিঠু)	১৮-২০
২০৬	শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতু	২১-২৩
২০৭	শহীদ মো: রিয়াজ হোসেন	২৪-২৬
২০৮	শহীদ মো: আব্দুল আহাদ	২৭-২৯
২০৯	শহীদ তামিম শিকদার	৩০-৩২
২১০	মো: মঈনুল ইসলাম	৩৩-৩৫
২১১	শহীদ সাবিদ হোসেন	৩৬-৩৮
২১২	শহীদ বাবু মোল্লা	৩৯-৪১
২১৩	শহীদ দীপ্ত দে	৫২-৪৪
২১৪	শহীদ মো: মনিরুজ্জামান মোল্যা	৪৫-৪৮
২১৫	শহীদ মামুন সরদার	৪৯-৫১
২১৬	শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি	৫২-৫৫
২১৭	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৫৬-৫৮
২১৮	শহীদ রুমান বেপারী	৫৯-৬১
২১৯	শহীদ হাসিবুর রহমান	৬২-৬৪
২২০	শহীদ তাওহীদ সন্যামাত	৬৫-৬৮
২২১	শহীদ সোবাহান মুন্সী	৬৯-৭১
২২২	শহীদ মো: আল আমিন	৭২-৭৪
২২৩	শহীদ বাঁধন	৭৫-৭৭
২২৪	শহীদ মো: রিয়াজুল তালুকদার	৭৮-৭৯
২২৫	শহীদ মো: জুনায়েত হোসেন	৮০-৮১
২২৬	শহীদ মামুন মিয়া	৮২-৮৩
২২৭	শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন	৮৪-৮৬
২২৮	শহীদ মো: দুলাল	৮৭-৮৯
২২৯	শহীদ আশরাফুল হাওলাদার	৯০-৯২
২৩০	শহীদ তাহমিদ ভুঁইয়া	৯৩-৯৬
২৩১	শহীদ মো: জোনায়েদ	৯৭-১০০
২৩২	শহীদ মো: আযিযুল মিয়া	১০১-১০৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২৩৩	শহীদ ডা: সজিব সরকার	১০৪-১০৬
২৩৪	শহীদ মো: সিয়াম	১০৭-১১০
২৩৫	শহীদ মো: সুজন মিয়া	১১১-১১৩
২৩৬	শহীদ তামিন হৃদয়	১১৪-১১৬
২৩৭	শহীদ মো: সুজন মিয়া	১১৭-১১৯
২৩৮	শহীদ আনোয়ার মিয়া	১২০-১২১
২৩৯	শহীদ আরমান মোল্লা	১২২-১২৩
২৪০	শহীদ মো: রাছেল মিয়া	১২৪-১২৬
২৪১	শহীদ মো: লাল মিয়া	১২৭-১২৯
২৪২	শহীদ মারুফ মিয়া	১৩০-১৩১
২৪৩	শহীদ একরামুল হক সাজিদ	১৩২-১৩৪
২৪৪	শহীদ মো: ইমন	১৩৫-১৩৭
২৪৫	শহীদ হাফেজ সাদিক	১৩৮-১৩৯
২৪৬	শহীদ ফিরোজ তালুকদার	১৪০-১৪১
২৪৭	শহীদ আহনাফ আবীর আশরাফুল্লাহ	১৪২-১৪৩
২৪৮	শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল	১৪৪-১৪৭
২৪৯	শহীদ শেখ জাহাঙ্গীর আলম	১৪৮-১৫০
২৫০	শহীদ মিরাজুল ইসলাম অর্ণব	১৫১-১৫৪
২৫১	শহীদ আরাফাত মুন্সি	১৫৫-১৫৮
২৫২	শহীদ গনি মিয়া	১৫৯-১৬১
২৫৩	শহীদ মোবারক	১৬৩-১৬৫
২৫৪	শহীদ মো: রাসেল গাজী	১৬৬-১৬৮
২৫৫	শহীদ মো: মিঠু বিশ্বাস মারুফ	১৬৯-১৭১
২৫৬	শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া	১৭২-১৭৯
২৫৭	শহীদ মেহেদী হাসান	১৮০-১৮২
২৫৮	শহীদ নাজমুল মিয়া	১৮৩-১৮৫
	(রাজশাহী বিভাগ)	
২৫৯	শহীদ মো: শাখিল আনোয়ার	১৮৬-১৮৯
২৬০	শহীদ মো: বিপ্লব মন্ডল	১৯০-১৯২
২৬১	শহীদ মো: মাহফুজ আলম শ্রাবণ	১৯৩-১৯৬
২৬২	শহীদ মো: রাসেল রানা	১৯৭-২০০
২৬৩	শহীদ আস সবুর	২০১-২০৪
২৬৪	শহীদ মো: বায়েজিদ বোস্তামী	২০৫-২০৯
২৬৫	শহীদ মো: রায়হান আলী	২১০-২১৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২৬৬	শহীদ মো: তারিক হোসেন	২১৪-২১৮
২৬৭	শহীদ মো: মিনারুল ইসলাম	২১৯-২২৩
২৬৮	শহীদ মো: সাকিব আনজুম	২২৪-২২৭
২৬৯	শহীদ মো: রায়হান আলী	২২৮-২৩২
২৭০	শহীদ সাইফুল ইসলাম আলিফ	২৩৩-২৩৫
২৭১	শহীদ রেজাউল হক সরকার	২৩৬-২৩৮
২৭২	শহীদ মো: মাহবুব হাসান নিলয়	২৩৯-২৪১
২৭৩	শহীদ জুলকার নাইন	২৪২-২৪৪
২৭৪	মো: খোকন সরদার	২৪৫-২৪৮
	৫ম খন্ড (রাজশাহী বিভাগ)	
২৭৫	শহীদ মো: আব্দুল হান্নান খান	৭-১০
২৭৬	শহীদ মো: জাহিদুল ইসলাম	১১-১৪
২৭৭	শহীদ মো: সুমন সেখ	১৫-১৮
২৭৮	শহীদ মো: আব্দুল লতিফ	১৯-২২
২৭৯	শহীদ মো: সোহানুর রহমান খান রঞ্জু খান	২৩-২৬
২৮০	শহীদ মো: আব্দুল আলীম	২৭-৩০
২৮১	শহীদ মো: সুজন মাহমুদ	৩১-৩৪
২৮২	শহীদ মো: অন্তর ইসলাম	৩৫-৩৮
২৮৩	শহীদ মো: ইয়াহিয়া আলী	৩৯-৪২
২৮৪	শহীদ মো: সিয়াম হোসেন	৪৩-৪৬
২৮৫	শহীদ শিহাব আহমেদ	৪৭-৫০
২৮৬	শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম	৫১-৫৪
২৮৭	শহীদ মো: জিল্লুর সরদার	৫৫-৫৮
২৮৮	শহীদ মো: শাকিল হাসান	৫৯-৬২
২৮৯	শহীদ মো: সাব্বির হাসান	৬৩-৬৬
২৯০	শহীদ আব্দুল আহাদ সৈকত	৬৭-৭০
২৯১	শহীদ মো: সোহেল রানা	৭১-৭৪
২৯২	শহীদ মো: আবু রায়হান	৭৫-৭৮
২৯৩	শহীদ মো: মুনিরুল ইসলাম	৭৯-৮২
২৯৪	শহীদ মো: রনি	৮৩ -৮৫
২৯৫	শহীদ মো: কমর উদ্দিন খাঁ (বাঙ্গি)	৮৬-৮৮
২৯৬	শহীদ মো: শিমুল	৮৯-৯২
২৯৭	শহীদ সিয়াম শুভ	৯৩-৯৬
২৯৮	শহীদ মো: সেলিম হোসেন	৯৭-১০০

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২৯৯	শহীদ মো: আব্দুল মান্নান	১০১-১০৪
৩০০	শহীদ মো: রিপন ফকির	১০৫-১০৭
৩০১	শহীদ মোছা: রিতা আক্তার	১০৮-১১০
৩০২	শহীদ মো: নজিবুল সরকার	১১১-১১৪
৩০৩	শহীদ মেহেদী হাসান	১১৫-১১৮
৩০৪	শহীদ মো: মিনহাজ হোসেন	১১৯-১২২
৩০৫	শহীদ মো: শাওন খান	১২৩-১২৬
৩০৬	শহীদ শরিফুল ইসলাম মোহন	১২৭-১৩০
৩০৭	শহীদ মেহেদী হাসান রবিন	১৩১-১৩৪
৩০৮	শহীদ ইয়াসিন আলী	১৩৫-১৩৮
৩০৯	শহীদ মিকদাদ হোসাইন খান	১৩৯-১৪২
৩১০	শহীদ মো: হৃদয়	১৪৩-১৪৬
৩১১	শহীদ মো: রমজান আলী	১৪৭-১৫০
৩১২	শহীদ মো: সোহেল রানা	১৫১-১৫৪
	(বরিশাল বিভাগ)	
৩১৩	শহীদ আরিফুর রহমান রাসেল	১৫৫-১৫৮
৩১৪	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১৫৯-১৬২
৩১৫	শহীদ মো: ইমরান হোসেন	১৬৩-১৬৬
৩১৬	শহীদ মো: সাগর হাওলাদার	১৬৭-১৬৯
৩১৭	শহীদ এম ডি ইলিয়াস হোসাইন	১৭০-১৭৩
৩১৮	শহীদ মো: জামাল হোসেন শিকদার	১৭৪-১৭৬
৩১৯	শহীদ রাকিব হোসাইন	১৭৭-১৮০
৩২০	শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত	১৮১-১৮৪
৩২১	শহীদ আল-আমিন রনি	১৮৫-১৮৭
৩২২	শহীদ হাফেয মো: জসিম উদ্দীন	১৮৮-১৯০
৩২৩	শহীদ মো: রাকিব বেপারী	১৯১-১৯৪
৩২৪	শহীদ মো: সিফাত হোসেন	১৯৫-১৯৮
৩২৫	শহীদ মো: জিহাদ হোসেন	১৯৯-২০২
৩২৬	শহীদ সরোয়ার হোসেন শাওন	২০৩-২০৭
৩২৭	শহীদ মো: আতিকুর রহমান	২০৮-২১১
৩২৮	শহীদ শাওন সিকদার	২১২-২১৫
৩২৯	শহীদ মো: শাহিন বাড়ি	২১৬-২১৯
৩৩০	শহীদ মো: সুজন	২২০-২২৩
৩৩১	শহীদ রুবেল হোসেন	২২৪-২২৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৩২	শহীদ রাকিব হাওলাদার	২২৭-২২৯
৩৩৩	শহীদ রফিকুল ইসলাম	২৩০-২৩২
৩৩৪	শহীদ মো: ইফতি আব্দুল্লাহ	২৩৩-২৩৫
৩৩৫	শহীদ মামুন খন্দকার	২৩৬-২৩৮
৩৩৬	শহীদ আবু জাফর হাওলাদার	২৩৯-২৪১
৩৩৭	শহীদ মো: ইমদাদুল হক	২৪২-২৪৪
	৬ষ্ঠ খন্ড (বরিশাল বিভাগ)	
৩৩৮	শহীদ মো: আল আমিন হোসেন আগমন	৭-৯
৩৩৯	শহীদ মো: টিটু হাওলাদার	১০-১৩
৩৪০	শহীদ মো: লিটন	১৪-১৬
৩৪১	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১৭-২০
৩৪২	শহীদ মো: রাসেল মাহমুদ	২১-২৪
৩৪৩	শহীদ মো: আমিন	২৫-২৭
৩৪৪	শহীদ মো: দুলাল সরদার	২৮-৩০
৩৪৫	শহীদ মো: বাচ্চু	৩১-৩৪
৩৪৬	শহীদ মো: রায়হান আকন	৩৫-৩৮
৩৪৭	শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া	৩৯-৪৩
৩৪৮	শহীদ মো: মিলন	৪৪-৪৬
৩৪৯	শহীদ মো: জসিম উদ্দীন	৪৭-৪৯
৩৫০	শহীদ মো: নবীন তালুকদার	৫০-৫২
৩৫১	শহীদ সাংবাদিক মো: মেহেদী হাসান	৫৩-৫৬
৩৫২	শহীদ মো: সাইদুর রহমান ইমরান	৫৭-৫৯
৩৫৩	শহীদ জিহাদ হোসেন	৬০-৬২
৩৫৪	শহীদ মো: আতিকুল ইসলাম	৬৩-৬৫
৩৫৫	শহীদ মো: রাসেল	৬৬-৬৮
৩৫৬	শহীদ মো: সাগর গাজী	৬৯ -৭১
৩৫৭	শহীদ মো: মামুন	৭২-৭৪
৩৫৮	শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল)	৭৫-৭৭
৩৫৯	শহীদ আখতারুজ্জামান নাইম	৭৮-৮২
৩৬০	শহীদ মো: জাকির হোসেন	৮৩-৮৪
৩৬১	শহীদ মো: আরিফ	৮৫-৮৭
৩৬২	শহীদ মো: বাবলু মৃধা	৮৮-৯০
৩৬৩	শহীদ মো: মনির	৯১-৯৩
৩৬৪	শহীদ মো: রাব্বি	৯৪-৯৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৬৫	শহীদ মো: ইয়াছিন	৯৭-৯৯
৩৬৬	শহীদ মো: সজিব	১০০-১০২
৩৬৭	শহীদ মো: সিয়াম	১০৩-১০৫
৩৬৮	শহীদ মোসা: লিজা	১০৬-১০৮
৩৬৯	শহীদ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	১০৯-১১১
৩৭০	শহীদ মো: বাহাদুর হোসেন মনির	১১২-১১৪
৩৭১	শহীদ মো: নাহিদুল ইসলাম	১১৫-১১৮
৩৭২	শহীদ মো: শাহিন	১১৯-১২১
৩৭৩	শহীদ সাইদুল ইসলাম	১২২-১২৪
৩৭৪	শহীদ মো: সেলিম তালুকদার	১২৫-১২৮
৩৭৫	শহীদ কামাল হোসেন	১২৯-১৩৩
৩৭৬	শহীদ মিরাজ	১৩৪-১৩৫
৩৭৭	শহীদ মো: রনি	১৩৬-১৩৮
৩৭৮	শহীদ মো: শামিম হাওলাদার	১৩৯-১৪১
৩৭৯	শহীদ হাবিবুর রহমান	১৪২-১৪৪
৩৮০	শহীদ মো: ফজলু	১৪৫-১৪৭
৩৮১	শহীদ মো: শিহাব উদ্দিন	১৪৮-১৫০
৩৮২	শহীদ মো: রাকিব	১৫১-১৫৩
৩৮৩	শহীদ ওমর ফারুক	১৫৪-১৫৬
৩৮৪	শহীদ মো: জসিম	১৫৭-১৬০
	(খুলনা বিভাগ)	
৩৮৫	শহীদ মো: হাফিজ উদ্দিন	১৬১-১৬৪
৩৮৬	শহীদ সামিউর রহমান সাদ	১৬৫-১৬৮
৩৮৭	শহীদ আব্দুল আজিজ (চাঁন মিয়া)	১৬৯-১৭১
৩৮৮	শহীদ মো: রিয়াদ শেখ	১৭২-১৭৫
৩৮৯	শহীদ ফজল মাহদী চয়ন	১৭৬-১৭৮
৩৯০	শহীদ মো: খালিদ হোসেন শান্ত	১৭৯-১৮১
৩৯১	শহীদ মো: সাকিবুল হাসান মাহি	১৮২-১৮৪
৩৯২	শহীদ মো: ইউসুফ আলী	১৮৫-১৮৭
৩৯৩	শহীদ মো: মেহেদী হাসান আলিফ	১৮৮-১৯০
৩৯৪	শহীদ মো: মেহেদী হাসান	১৯১-১৯৩
৩৯৫	শহীদ রোকনুজ্জামান রাকিব	১৯৪-১৯৬
৩৯৬	শহীদ মো: রাসেল রানা বাশার	১৯৭-১৯৯
৩৯৭	শহীদ মো: আলামিন বিশ্বাস	২০০-২০২

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৯৮	শহীদ মো: তারেক রহমান	২০৩-২০৬
৩৯৯	শহীদ সিফাত হোসেন ফেরদৌস	২০৭-২০৮
৪০০	শহীদ এম এম তৌহিদুর রহমান	২০৯-২১১
৪০১	শহীদ ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবির	২১২-২১৪
৪০২	শহীদ সাকিবুল হাসান সাকিব	২১৫-২১৮
৪০৩	শহীদ মো: সোহানুর রহমান শিহাব	২১৯-২২১
৪০৪	শহীদ সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ	২২২-২২৪
	৭ম খন্ড (খুলনা বিভাগ)	
৪০৫	শহীদ ফয়সাল হোসেন	৭-৯
৪০৬	শহীদ মো: সাওয়ান্ত মেহতাব (প্রিয়)	১০-১২
৪০৭	শহীদ মো: রুহান ইসলাম	১৩-১৫
৪০৮	শহীদ মো: রাকিবুল হোসেন	১৬-১৯
৪০৯	শহীদ মো: সাব্বির হোসেন	২০-২২
৪১০	শহীদ মো: শাহরিয়া	২৩-২৫
৪১১	শহীদ মো: মাসুদ রানা মুকুল	২৬-২৮
৪১২	শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম	২৯-৩১
৪১৩	শহীদ মো: সুরুজ আলী বাবু	৩২-৩৪
৪১৪	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিন	৩৫-৩৭
৪১৫	শহীদ মো: ইউসুফ শেখ	৩৮-৪০
৪১৬	শহীদ মো: উসামা	৪১-৪৪
৪১৭	শহীদ মো: আলমগীর সেখ	৪৫-৪৭
৪১৮	শহীদ মো: সেলিম মণ্ডল	৪৮-৫০
৪১৯	শহীদ আব্দুস সালাম	৫১-৫৪
৪২০	শহীদ মাহিম হোসেন	৫৫-৫৮
৪২১	শহীদ মো: জামাল উদ্দীন শেখ	৫৯-৬১
৪২২	শহীদ মো: বাবলু ফরাজী	৬২-৬৫
৪২৩	শহীদ মো: ছাব্বির ইসলাম সাকিব	৬৬-৬৮
৪২৪	শহীদ বিপ্লব শেখ	৬৯ -৭১
৪২৫	শহীদ আলিফ আহমেদ সিয়াম	৭২-৭৫
৪২৬	শহীদ শাকিব রায়হান	৭৬-৭৯
৪২৭	শহীদ ইয়াসিন আলী শেখ	৮০-৮২
৪২৮	শহীদ মো: হামিদ শেখ	৮৩-৮৬
৪২৯	শহীদ নবী নুর মোড়ল	৮৭-৯০
৪৩০	শহীদ হাফেজ আনাজ বিল্লাহ	৯১-৯৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৪৩১	শহীদ আলম সরদার	৯৪-৯৬
৪৩২	শহীদ আবুল বাশার আদম	৯৭-৯৯
৪৩৩	শহীদ মো: আসিফ হাসান	১০০-১০৩
৪৩৪	শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি	১০৪-১০৬
৪৩৫	শহীদ আল আমীন	১০৭-১০৯
৪৩৬	শহীদ মো: মারুফ হোসেন	১১০-১১৩
৪৩৭	শহীদ মো: আহাদ আলী	১১৪-১১৭
৪৩৮	শহীদ সুমন মিয়া	১১৮-১২১
৪৩৯	শহীদ রাজু আহমদ	১২২-১২৪
৪৪০	শহীদ মো: মুত্তাকিন বিল্লাহ	১২৫-১২৮
৪৪১	শহীদ ফরহাদ হোসেন	১২৯-১৩১
	(চট্টগ্রাম বিভাগ)	
৪৪২	শহীদ আউয়াল মিয়া	১৩২-১৩৪
৪৪৩	শহীদ ইমাম হাসান তায়িম ভূঁইয়া	১৩৫-১৩৭
৪৪৪	শহীদ আল মামুন আমানত	১৩৮-১৪০
৪৪৫	শহীদ মো: ফারুক	১৪১-১৪৩
৪৪৬	শহীদ মো: পারভেজ	১৪৪-১৪৬
৪৪৭	শহীদ মো: বাবু	১৪৭-১৪৯
৪৪৮	শহীদ মো: জিহাদ হাসান	১৫০-১৫৩
৪৪৯	শহীদ রিফাত হোসেন	১৫৪-১৫৬
৪৫০	শহীদ মো: সাগর	১৫৭-১৬০
৪৫১	শহীদ মো: হোসাইন	১৬১-১৬৩
৪৫২	শহীদ মহিন উদ্দীন	১৬৪-১৭১
৪৫৩	শহীদ মো: জাহিদ হোসেন রাব্বি	১৭২-১৭৫
৪৫৪	শহীদ মো: আব্দুর রাজ্জাক রুবেল	১৭৬-১৭৯
৪৫৫	শহীদ রবিন মিয়া	১৮০-১৮৩
৪৫৬	শহীদ মো: ফয়সাল সরকার	১৮৪-১৮৬
৪৫৭	শহীদ হামিদুর রহমান	১৮৭-১৯০
৪৫৮	শহীদ আল আমিন	১৯১-১৯৩
৪৫৯	শহীদ জামসেদুর রহমান	১৯৪-১৯৭
৪৬০	শহীদ হাফেজ মো: মাসুদুর রহমান	১৯৮-২০০
৪৬১	শহীদ সৈয়দ মুনতাসির রহমান আলিফ	২০১-২০৪
৪৬২	শহীদ মাসুম মিয়া	২০৫-২০৭
৪৬৩	শহীদ কাওসার মাহমুদ	২০৮-২১০

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৪৬৪	শহীদ মো: ইউসুফ	২১১-২১৩
৪৬৫	শহীদ মো: জহিরুল ইসলাম	২১৪-২১৬
৪৬৬	শহীদ সোহাগ মিয়া	২১৭-২২০
৪৬৭	শহীদ হাসান হোসেন	২২১-২২৪
৪৬৮	শহীদ আজাদ সরকার	২২৫-২২৮
৪৬৯	শহীদ মো: ইমন গাজী	২২৯-২৩২
৪৭০	শহীদ আব্দুল কাদির	২৩৩-২৩৬
৪৭১	শহীদ মো: আবুল হোসেন মিজি	২৩৭-২৩৯
৪৭২	শহীদ নিশান খান	২৪০-২৪২
৪৭৩	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসাইন সাব্বির	২৪৩-২৪৫
৪৭৪	শহীদ আব্দুর রহমান গাজী	২৪৬-২৪৯
৪৭৫	শহীদ সিয়াম সরদার (জিহাদ)	২৫০-২৫২
৪৭৬	শহীদ রোহান আহমেদ খান	২৫৩-২৫৬
	৮ম খন্ড (চট্টগ্রাম বিভাগ)	
৪৭৭	শহীদ পারভেজ বেপারী	৭-১০
৪৭৮	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১১-১৩
৪৭৯	শহীদ রাব্বি আলম	১৪-১৬
৪৮০	শহীদ রাসেল বকাউল	১৭-১৯
৪৮১	শহীদ সাহাদাত হোসেন	২০-২২
৪৮২	শহীদ নাঈমা সুলতানা	২৩-২৬
৪৮৩	শহীদ আরিফ বেপারী	২৭-২৯
৪৮৪	শহীদ জসিম উদ্দিন	৩০-৩২
৪৮৫	শহীদ ফয়েজ বেপারী	৩৩-৩৪
৪৮৬	শহীদ মাহমুদুল হাসান	৩৫-৩৮
৪৮৭	শহীদ আলাউদ্দিন	৩৯-৪১
৪৮৮	শহীদ জুয়েল	৪২-৪৪
৪৮৯	শহীদ আশিক মিয়া	৪৫-৪৮
৪৯০	শহীদ মো: তুহিন আহমেদ	৪৯-৫২
৪৯১	শহীদ রফিকুল ইসলাম	৫৩-৫৬
৪৯২	শহীদ কামরুল মিয়া	৫৭-৫৯
৪৯৩	শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয়	৬০-৬৩
৪৯৪	শহীদ মোহাম্মদ ইশমামুল হক	৬৪-৬৬
৪৯৫	শহীদ আহসান হাবিব	৬৭-৬৯
৪৯৬	শহীদ নূর মোস্তফা	৭০-৭২

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৪৯৭	শহীদ তানভীর সিদ্দিকী	৭৩-৭৫
৪৯৮	শহীদ ওয়াসিম আকরাম	৭৬-৭৯
৪৯৯	শহীদ আমিনুল ইসলাম সাব্বির	৮০-৮২
৫০০	শহীদ পারভেজ	৮৩-৮৬
৫০১	শহীদ শহীদুল ইসলাম	৮৭-৮৯
৫০২	শহীদ সাদ আল আফনান	৯০-৯৩
৫০৩	শহীদ মো: ওসমান পাটওয়ারী	৯৪-৯৬
৫০৪	শহীদ শাব্বির হোসেন	৯৭-১০০
৫০৫	শহীদ কাউসার হোসেন	১০১-১০৪
৫০৬	শহীদ ইউনুছ আলী শাওন	১০৫-১০৮
৫০৭	শহীদ মো: মাযহারুল ইসলাম	১০৯-১১২
৫০৮	শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ	১১৩-১১৭
৫০৯	শহীদ ছাইদুল ইসলাম	১১৮-১২১
৫১০	শহীদ ওয়াকিল আহমেদ শিহাব	১২২-১২৪
৫১১	শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদ	১২৫-১২৭
৫১২	শহীদ মো: মাহবুবুল হাসান	১২৮-১৩২
৫১৩	শহীদ মো: সবুজ	১৩৩-১৩৬
৫১৪	শহীদ জাকির হসেন (শাকিব)	১৩৭-১৪০
৫১৫	শহীদ একরাম হোসেন কাউছার	১৪১-১৪৬
৫১৬	শহীদ আবদুল গনি	১৪৭-১৪৯
৫১৭	শহীদ মো: আবু বকর সিদ্দিক	১৫০-১৫২
৫১৮	শহীদ জাফর আহম্মদ	১৫৩-১৫৫
৫১৯	শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ	১৫৬-১৫৮
৫২০	শহীদ ইফাত হাসান খন্দকার	১৫৯-১৬১
৫২১	শহীদ নাসিমা আক্তার	১৬২-১৬৪
৫২২	শহীদ নিজাম উদ্দিন ইমন	১৬৫-১৬৭
৫২৩	শহীদ মো: রুবেল	১৬৮-১৭০
৫২৪	শহীদ মো: সজীব	১৭১-১৭৩
৫২৫	শহীদ বেলাল হোসেন	১৭৪-১৭৭
৫২৬	শহীদ আব্দুল কাইয়ুম	১৭৮-১৮০
৫২৭	শহীদ মো: আসিফ হোসেন	১৮১-১৮৫
৫২৮	শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ	১৮৬-১৮৮
৫২৯	শহীদ ইয়াসিন	১৮৯-১৯১
৫৩০	শহীদ মাঈন উদ্দিন	১৯২-১৯৪

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৫৩১	শহীদ মো: হাসান	১৯৫-১৯৮
৫৩২	শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী	১৯৯-২০২
৫৩৩	শহীদ মো: রিটন উদ্দিন	২০৩-২০৫
৫৩৪	শহীদ মো: রায়হান	২০৬-২০৮
৫৩৫	শহীদ ফারুক	২০৯-২১১
৫৩৬	শহীদ আরাফাত হোসেন আকাশ	২১২-২১৪
৫৩৭	শহীদ শাহাদাত হোসেন শাওন	২১৫-২১৭
৫৩৮	শহীদ আলমগীর হোসেন	২১৮-২২০
৫৩৯	শহীদ মো: ইমতিয়াজ হোসেন	২২১-২২৩
৫৪০	শহীদ মো: মামুন হোসেন	২২৪-২২৬
৫৪১	শহীদ ওমর বিন নুরুল আবছার	২২৭-২২৯
৫৪২	শহীদ মো: মাহিন	২৩০-২৩২
	৯ম খন্ড (রংপুর বিভাগ)	
৫৪৩	শহীদ আব্দুল্লাহ আল তাহির	৭-১০
৫৪৪	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন	১১-১৩
৫৪৫	শহীদ মো: মেরাজুল ইসলাম	১৪-১৬
৫৪৬	শহীদ মো: মোসলেম উদ্দীন মিলন	১৭-২০
৫৪৭	শহীদ মো: মানিক মিয়া	২১-২৪
৫৪৮	শহীদ হাফেজ মো: নাসির ইসলাম	২৫-২৬
৫৪৯	শহীদ মো: আবু সাঈদ	২৭-৩২
৫৫০	শহীদ মো: সোহাগ	৩৩-৩৬
৫৫১	শহীদ মো: মঞ্জু মিয়া	৩৭-৩৯
৫৫২	শহীদ মো: মামুন	৪০-৪২
৫৫৩	শহীদ বদিউজ্জামান	৪৩-৪৬
৫৫৪	শহীদ আব্দুল লতিফ	৪৭-৪৮
৫৫৫	শহীদ লাবলু মিয়া	৪৯-৫১
৫৫৬	শহীদ জাহিদুল ইসলাম	৫২-৫৩
৫৫৭	শহীদ হাফেজ রিদওয়ান আলী	৫৪-৫৬
৫৫৮	শহীদ তৌফিক ইসলাম	৫৭-৫৯
৫৫৯	শহীদ আল শাহ রিয়াদ	৬০-৬২
৫৬০	শহীদ মো: জোবায়ের হোসেন	৬৩-৬৫
৫৬১	শহীদ মো: জাহিদুর রহমান	৬৬-৬৮
৫৬২	শহীদ মো: শাহরিয়ার আল আফরোজ শ্রাবন	৬৯-৭১
৫৬৩	শহীদ মিরাজুল ইসলাম	৭২-৭৪

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৫৬৪	শহীদ মো: সুজন হোসেন	৭৫-৭৭
৫৬৫	শহীদ আজিজুল ইসলাম	৭৮-৮০
৫৬৬	শহীদ নুরুজ্জামান	৮১-৮৩
৫৬৭	শহীদ রায়হানুল হাসান	৮৪-৮৬
৫৬৮	শহীদ মো: সাহান পারভেজ	৮৭-৮৯
৫৬৯	শহীদ আল মামুন	৯০-৯২
৫৭০	শহীদ মো: রাকিবুল হাসান রকি	৯৩-৯৫
৫৭১	শহীদ মো: সুমন ইসলাম	৯৬-৯৯
৫৭২	শহীদ আবু ছায়েদ	১০০-১০২
৫৭৩	শহীদ মো: সাগর রহমান	১০৩-১০৫
৫৭৪	শহীদ মো: সাজু ইসলাম	১০৬-১০৯
৫৭৫	শহীদ মো: শাহাবুল ইসলাম	১১০-১১৩
৫৭৬	শহীদ মো: রায়হানুল ইসলাম	১১৪-১১৭
৫৭৭	শহীদ মো: নূর আলম	১১৮-১২০
৫৭৮	শহীদ রাশেদুল হক	১২১-১২৪
৫৭৯	শহীদ মো: গোলাম রব্বানী	১২৫-১২৮
৫৮০	শহীদ মোহাম্মাদ আশিকুল ইসলাম	১২৯-১৩১
৫৮১	শহীদ মো: আশাদুজ্জামান নুর সূর্য	১৩২-১৩৫
৫৮২	শহীদ মো: মোহতাসিম হাসান ফাহিম	১৩৬-১৩৮
৫৮৩	শহীদ মো: সুমন পাটয়ারী	১৩৯-১৪১
৫৮৪	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম রাহুল	১৪২-১৪৫
৫৮৫	শহীদ মো: আসাদুল হক বাবু	১৪৬-১৫০
৫৮৬	শহীদ মো: জিয়াউর রহমান	১৫১-১৫৩
৫৮৭	শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্তর	১৫৪-১৫৬
	(ময়মনসিংহ বিভাগ)	
৫৮৮	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মাহিন	১৫৭-১৫৯
৫৮৯	শহীদ মো: রিদওয়ান হোসেন	১৬০-১৬২
৫৯০	শহীদ মো:আসীর ইনতিশারুল হক	১৬৩-১৬৫
৫৯১	শহীদ মো: নাজমুল ইসলাম রাজু	১৬৬-১৬৮
৫৯২	শহীদ মো:আমিরুল ইসলাম	১৬৯-১৭১
৫৯৩	শহীদ তোফাজ্জল হোসেন	১৭২-১৭৫
৫৯৪	শহীদ হাফিজুল ইসলাম	১৭৬-১৭৯
৫৯৫	শহীদ মো: রবিউল ইসলাম রকিব	১৮০-১৮৩
৫৯৬	শহীদ হুমায়ুন কবির	১৮৪-১৮৭

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৫৯৭	শহীদ এ কে এম শহিদুল ইসলাম	১৮৮-১৯০
৫৯৮	শহীদ মো: জামাল মিয়া	১৯১-১৯৩
৫৯৯	শহীদ কবির	১৯৪-১৯৬
৬০০	শহীদ মো: জুবাইদ ইসলাম	১৯৭-১৯৯
৬০১	শহীদ শাকিবুল হাসান সাজু	২০০-২০২
৬০২	শহীদ বিপ্লব হাসান	২০৩-২০৫
৬০৩	শহীদ মো: নূরে আলম রাব্বি	২০৬-২০৮
৬০৪	শহীদ জুবায়ের আহমদ	২০৯-২১১
৬০৫	শহীদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন	২১২-২১৫
৬০৬	শহীদ মো: ওবায়দুল হক	২১৬-২১৮
৬০৭	শহীদ মো: কামাল হোসেন	২১৯-২২১
৬০৮	শহীদ মো: শাহজাহান	২২২-২২৪
৬০৯	শহীদ মো: সাদিকুর রহমান	২২৫-২২৭
৬১০	শহীদ মাজিদুল	২২৮-২৩০
৬১১	শহীদ মো: কাওসার মিয়া	২৩১-২৩২
৬১২	শহীদ রাজু	২৩৩-২৩৪
৬১৩	শহীদ মো:আনারুল ইসলাম	২৩৫-২৩৭
৬১৪	শহীদ মো:মাসুম শেখ	২৩৮-২৪০
৬১৫	শহীদ মো:মাহিন মিয়া	২৪১-২৪৩
৬১৬	শহীদ মো:সাইফুল ইসলাম	২৪৪-২৪৭
৬১৭	শহীদ সামিদ হোসেন	২৪৮-২৫২
	১০ম খন্ড (ময়মনসিংহ বিভাগ)	
৬১৮	শহীদ জাকির হোসেন	৭-৯
৬১৯	শহীদ ওমর ফারুক	১০-১২
৬২০	শহীদ সাইফুল ইসলাম	১৩-১৪
৬২১	শহীদ মো: মাসুম বিল্লাহ	১৫-১৭
৬২২	শহীদ মো: আহাদুন	১৮-২০
৬২৩	শহীদ সোহাগ মিয়া	২১-২৩
৬২৪	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন	২৪-২৬
৬২৫	শহীদ মো: নাজিম উদ্দিন	২৭-২৯
৬২৬	শহীদ সাব্বির ইসলাম	৩০-৩৩
৬২৭	শহীদ মো: জিন্নাতুল ইসলাম খোকন	৩৪-৩৬
৬২৮	শহীদ মো: আলী হুসেন	৩৭-৩৯
৬২৯	শহীদ তোফাজ্জল হোসেন	৪০-৪২

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬৩০	শহীদ মো: তরিকুল ইসলাম রুবেল	৪৩-৪৫
৬৩১	শহীদ শিফাত উল্লাহ	৪৬-৪৮
৬৩২	শহীদ তনয় চন্দ্র দাস	৪৯-৫১
৬৩৩	শহীদ জোবায়েদ	৫২-৫৪
৬৩৪	শহীদ কুদ্দুস মিয়া	৫৫-৫৭
৬৩৫	শহীদ মো: রাহুল	৫৮-৬০
৬৩৬	শহীদ মোবারক হোসেন	৬১-৬৩
৬৩৭	শহীদ মো: রুবেল	৬৪-৬৬
৬৩৮	শহীদ রহমত মিয়া	৬৭-৬৯
৬৩৯	শহীদ মো: ফারুক	৭০-৭১
৬৪০	শহীদ সাফওয়ান আকতার সদ্য	৭২-৭৪
৬৪১	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৭৫-৭৬
৬৪২	শহীদ মো: লিটন	৭৭-৭৯
৬৪৩	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	৮০-৮২
৬৪৪	শহীদ মো: মোস্তফা	৮৩-৮৫
৬৪৫	শহীদ মো: সবুজ	৮৬-৮৮
৬৪৬	শহীদ মো: আমজাদ	৮৯-৯১
৬৪৭	শহীদ মো: জসীম উদ্দিন	৯২-৯৪
৬৪৮	শহীদ মো: আবুজর শেখ	৯৫-৯৭
৬৪৯	শহীদ মোখলেসুর রহমান	৯৮-১০০
৬৫০	শহীদ মো: রাব্বি মিয়া	১০১-১০৩
৬৫১	শহীদ রবিউল ইসলাম	১০৪-১০৬
৬৫২	শহীদ সফিক মিয়া	১০৭-১১০
৬৫৩	শহীদ আব্দুল আজিজ	১১১-১১৩
৬৫৪	মো: মাহবুব আলম	১১৪-১১৭
৬৫৫	শহীদ সুমন হাসান	১১৮-১২০
৬৫৬	শহীদ মো: সবুজ মিয়া	১২১-১২৩
৬৫৭	শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ	১২৪-১২৬
৬৫৮	শহীদ শাহাদাত হোসেন	১২৭-১২৯
৬৫৯	শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম	১৩০-১৩২
৬৬০	শহীদ সারদুল আশীষ সৌরভ	১৩৩-১৩৫
৬৬১	শহীদ মো: বকুল মিয়া	১৩৬-১৩৮
৬৬২	শহীদ আব্দুল রাকিব	১৩৯-১৪১
৬৬৩	শহীদ আব্দুল্লাহ	১৪২-১৪৫

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬৬৪	শহীদ ফারহান ফায়াজ	১৪৬-১৪৯
৬৬৫	শহীদ জুনায়েদ ইসলাম রাতুল	১৫০-১৫৩
৬৬৬	শহীদ খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ	১৫৪-১৫৬
৬৬৭	শহীদ মো: আক্কাস আলী	১৫৭-১৫৯
৬৬৮	শহীদ মো: ইমরান	১৬০-১৬৩
৬৬৯	শহীদ মো: সাকিব হাসান	১৬৪-১৬৬
৬৭০	শহীদ পারবেজ মিয়া	১৬৭-১৬৯
৬৭১	শহীদ রফিকুল ইসলাম	১৭০-১৭২
৬৭২	শহীদ হাফিজুল শিকদার	১৭৩-১৭৫
৬৭৩	শহীদ সাব্বির হাওলাদার	১৭৬-১৭৮
৬৭৪	শহীদ সাইফুল ইসলাম তন্ময়	১৭৯-১৮১
৬৭৫	শহীদ সায়েম হোসেন	১৮২-১৮৪
৬৭৬	শহীদ শাহিনুর বেগম	১৮৫-১৮৭
৬৭৭	শহীদ শামছুল ইসলাম	১৮৮-১৯২
৬৭৮	শহীদ শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ	১৯৩-১৯৫
৬৭৯	শহীদ সোহাগ	১৯৬-১৯৯
৬৮০	শহীদ তাহিদুল ইসলাম	২০০-২০৪
৬৮১	ওয়াশিম শেখ	২০৫-২০৮
৬৮২	শহীদ শাওন তালুকদার	২০৯-২১০
৬৮৩	শহীদ রুবেল ইসলাম	২১১-২১৩
৬৮৪	শহীদ রুবাইদুজ্জামান রেজওয়ান	২১৪-২১৬
৬৮৫	শহীদ মাহফুজুর রহমান	২১৭-২১৮
৬৮৬	শহীদ মো: আয়াতুল্লাহ	২১৯-২২১
৬৮৭	শহীদ মো: ছমেছ উদ্দিন	২২২-২২৩
৬৮৮	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন	২২৪-২২৬
৬৮৯	শহীদ রুদ্র সেন	২২৭-২২৮
৬৯০	শহীদ মো: সোহেল আখঞ্জী	২২৯
৬৯১	শহীদ মো: ইউসুফ	২৩০-২৩১
৬৯২	শহীদ মতিউর রহমান	২৩২-২৩৩
৬৯৩	শহীদ আলমগীর মোল্লা	২৩৪-২৩৬
৬৯৪	শহীদ ফজলুল করিম (ফঝল মিয়া)	২৩৭-২৩৮
৬৯৫	শহীদ রমজান আলী	২৩৯-২৪১
৬৯৬	শহীদ কুরমান	২৪২-২৪৪
৬৯৭	শহীদ মোজাহিদ মল্লিক	২৪৫-২৪৭

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬৯৮	শহীদ সোহাগ মিয়া	২৪৮-২৫১
৬৯৯	শহীদ মোস্তাক আহমদ	২৫২-২৫৪
৭০০	শহীদ নাজমুল হাসান	২৫৫-২৫৭
৭০১	শহীদ রিপন	২৫৮-২৬০
৭০২	শহীদ শাহাদাত হোসাইন শামীম	২৬১-২৬৩
৭০৩	শহীদ সৈকত চন্দ্র দে	২৬৪-২৬৫
৭০৪	শহীদ শাকিল	২৬৬-২৬৮
৭০৫	শহীদ জামাল হোসাইন	২৬৯-২৭১
৭০৬	শহীদ আবদুল গনি	২৭২-২৭৪
৭০৭	শহীদ শাকিনুর রহমান	২৭৫-২৭৮
৭০৮	শহীদ আবদুল ওয়াদুদ	২৭৯-২৮১
৭০৯	শহীদ তাহির জামান প্রিয়	২৮২-২৮৪
৭১০	শহীদ কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজ	২৮৫-২৮৭
৭১১	শহীদ শ্রাবন গাজী	২৮৮-২৯১
৭১২-৭১৬	অজ্ঞাতনামা	২৯২

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
১৭ রংপুর
০৮ দিনাজপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
৭৫ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
১৩ সিলেট
সিলেট ২৮
মৌলভীবাজার
১৪ হবিগঞ্জ
০৭ টাঙ্গাইল
০৭ কিশোরগঞ্জ
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০১ রাজবাড়ী
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
০৮ লক্ষীপুর
১২ ফেনী
২১ নোয়াখালী
২০ বরিশাল
বরিশাল ৭৪
০৪ পিরোজপুর
২২ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

সদ্যজাত সন্তানকেও দেখার সুযোগ হলো না

শহীদ মোঃ আসাদুল্লাহ
ক্রমিক : ০০১
আইডি : ঢাকা সিটি ০০১

শহীদ পরিচিতি

প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেড়ে উঠা দরিদ্র পরিবারের পরিশ্রমী সন্তান শহীদ মো: আসাদুল্লাহ। তিনি ২০০০ সালের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানার রহমতপুর গ্রামে। পিতা মাতার বিচ্ছেদের কারণে জন্মের পর থেকে তিনি নানার বাড়িতে লালিত-পালিত হন। পরবর্তীতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত স্থানীয় বালিয়াচন্ডি মাদরাসায় পড়ালেখা করেন। নানার মৃত্যুর পর ইতি টানতে হয় পড়ালেখায়। এরপর মামা তাকে ঢাকায় এনে রেস্টুরেন্টে কাজ খুঁজে দেন। তাছাড়া ঢাকায় আসার পর তিনি গাড়ি মেরামত, ড্রাইভিংসহ বিভিন্ন কাজ শুরু করেন। তিনি ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর নুরানী খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তারা শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন। তার শশুর ছিলেন একজন সবজি বিক্রেতা। কষ্টার্জিত টাকা হতে তিনি ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে আসাদুল্লাহকে একটি লেগুনা কিনে দেন। লেগুনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ দিয়েই শহীদ আসাদুল্লাহ রুটি-রুজি আর পারিবারিক ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। শাহাদাতের সময় তার স্ত্রী ৮ মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

সামগ্রিক ঘটনার বর্ণনা

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার উপর বিপথগামী প্রশাসন ও সরকারদলীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর হামলায় ক্রমান্বয়ে আহত ও নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ছাত্র-জনতার পাশাপাশি সমাজের কৃষক, শ্রমিক, বৃদ্ধ, জেলে, কুমারসহ সকল পেশার মানুষ তখন রাস্তায় নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ছাত্র জনতার আন্দোলনে যোগ দেন আসাদুল্লাহ। প্রতিদিনের মতো ১৮ জুলাই বিকেল ৩টায় লেগুনা নিয়ে তিনি আসেন আজমপুর। সেখানে আগে থেকেই স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ এবং দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিল।

দেশকে জুলুমবাজ শাসকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আসাদুল্লাহও নিজ লেগুনা থেকে নেমে এসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেন। সেদিন দুপুর থেকেই পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্র-জনতার উপর টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়ছিল। আসাদুল্লাহ অবস্থান নিয়েছিল আজমপুরস্থ উত্তরা থানার ঠিক পাশেই। তিনি রাজপথ না ছাড়তে ছাত্র-জনতাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। দুপক্ষের সংঘাত চলাকালে বিকেল ৫টার দিকে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের ছোড়া ৩টি বুলেট তার পেট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছাত্ররা তৎক্ষনাৎ তাকে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আসাদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করেন। দুনিয়ার সফর শেষ করার সময় তার স্ত্রীর গর্ভে ছিল ৮ মাসের সন্তান।

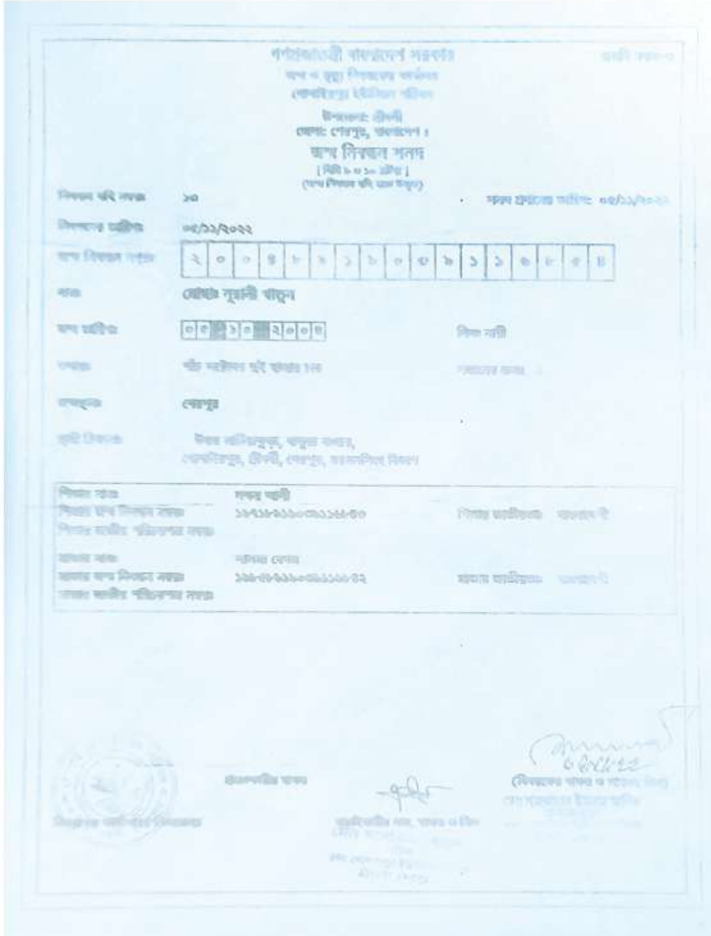

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম নিবন্ধন সনদ

শহীদ আসাদুল্লাহ'র প্রতিবেশীর বক্তব্য

আসাদুল্লাহ'র প্রতিবেশী ইবরাহীম বলেন, প্রতিবেশী আসাদুল্লাহ আমাদের প্রতিবেশি। তিনি ভদ্র ও মিশুক ছিলেন। দেখা হলে সালাম দিয়ে কথা বলতেন, খোঁজ খবর নিতেন। ১৮ জুলাই সে আমাকে জানালো যে, আজমপুরে গোলাগুলি চলছে; আমি যেন সেদিকে না যাই। অথচ সন্ধ্যা বেলায় জানতে পারি, আসাদুল্লাহ'ই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ আসাদুল্লাহ
Name: MD. ASADULLAH
পিতা: মোঃ জৈনদ্দিন
মাতা: মোছাঃ রাশেদা বেগম
Date of Birth: 01 Jul 2000
ID NO: 1515564761

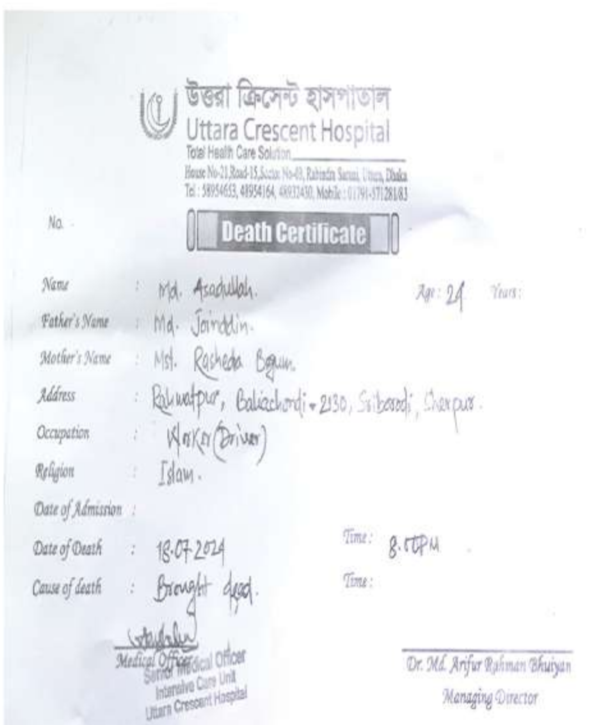

উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল
Uttara Crescent Hospital
Total Health Care Solution
House No-21, Road-15, Sector No-03, Rabindra Sarani, Uttara, Dhaka

No.

Death Certificate

Name : Md. Asadullah. Age: 24 Years
Father's Name : Md. Joinddin.
Mother's Name : Mst. Rasheda Begum.
Address : Raluwatpur, Baliachondi-2130, Sribordi, Sherpur.
Occupation : Worker (Driver)
Religion : Islam.
Date of Admission :
Date of Death : 18-07-2024 Time: 8.05PM
Cause of death : Brought dead. Time:

Medical Officer
Senior Medical Officer
Intensive Care Unit
Uttara Crescent Hospital

Dr. Md. Arifur Rahman Bhuiyan
Managing Director

এক নজরে শহীদ মো: আসাদুল্লাহ

নাম	: মো: আসাদুল্লাহ
ধর্ম	: ইসলাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: নবম শ্রেণি
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-০৭-২০০০; ২৪ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই, ২০২৪
শাহাদাতের তারিখ	: ১৮ জুলাই, ২০২৪
স্থান	: উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল
শাহাদাতের সময়	: রাত-৮ টা
ঘটনার স্থান	: আজমপুর, উত্তরা পূর্ব থানার পাশে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: শ্রীবরদী, শেরপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রহমতপুর, ইউনিয়ন: বালিয়াচন্ডি থানা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর
বর্তমান ঠিকনা	: বাসা: মধ্যপাড়া, এলাকা: সরকারপাড়া, থানা: উত্তরখান, জেলা: ঢাকা
পিতা	: মো: জৈনুদ্দিন, বয়স: ৬৫ বছর
মাতা	: মোসা: রাশেদা বেগম, পেশা ও বয়স: গৃহিণী, ৫৫ বছর
আয়ের উৎস	: লেগুনা ড্রাইভিং থেকে। রুট: হেলাল মার্কেট-আব্দুল্লাপুর
মাসিক আয়	: আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা
পারিবারিক সদস্য	: ৩
স্ত্রী	: নুরানী খাতুন
বয়স	: ২০, বিবাহের তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
সন্তান	: কোনো সন্তান নেই, তবে গর্ভে ৮ মাসের সন্তান রয়েছে
পারিবারিক তথ্য	: ছোট অবস্থায় পিতা মাতার বিচ্ছেদ ঘটে, মা পরবর্তীতে আবারও বিয়ে করেছেন

শহীদ মো: জোবায়ের বেপারী

ক্রমিক : ০০২

আইডি : ঢাকা সিটি ০০২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জোবায়ের বেপারী ০১ জানুয়ারি ১৯৮১ সালে ঢাকার উত্তরখান এলাকার দোবাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব আ: ছুবুর বেপারী (৭৬) অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মাতা জনাবা আমেলা বেগম (৫৫) গৃহিণী। নিজ গ্রাম থেকে এইচ এস সি পাশ করার পর তিনি গাড়ি ক্রয় করে ব্যবসা শুরু করেন। বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ নিজস্ব পৈতৃক বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন। তার দুই সন্তান রাফিউল বেপারী জায়ান এবং রাইয়ান বেপারী মেহরাব স্থানীয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যথাক্রমে নার্সারি ও প্লে শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার বৃদ্ধ মা-বাবা এবং সন্তানদের সার্বিক খরচ বহন করতেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

শহীদ জোবায়ের বেপারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৯ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে তার নিজ বাড়ি থেকে আজমপুর এর উদ্দেশ্যে বের হন। আজমপুর জামে মসজিদে জুমা'র নামাজ আদায় করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, তিনি নামাজ শেষ করে আজমপুর বি এন এস সেন্টারের পাশে অবস্থান করেন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। চতুর্দিক থেকে ছাত্র-জনতা আজমপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে, স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র হাতে সজ্জিত যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। ছাত্র-জনতার উপর উপর্যুপরি টিয়ারশেল নিক্ষেপ, ছররা গুলি, রাবার বুলেট নিক্ষেপ করলে ছাত্র-জনতা একের পর এক গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়তে থাকে। শহীদ জোবায়ের এই দৃশ্য দেখে গুলির উৎস খুঁজতে লাগলেন। তার মনে হলো গুলি উপর থেকে আসছে। তৎক্ষণাৎ জোবায়ের তার পাশে থাকা ছাত্র-জনতাকে সতর্ক করেন। রাস্তার উভয় পাশে উঁচু উঁচু ভবনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ঘাতকেরা অত্যাধুনিক অস্ত্র হাতে ছাত্রজনতাকে টার্গেট করে গুলি করতে থাকে। তখনও শহীদ জোবায়ের জানতেন না যে, এরই মধ্যে তাকেও টার্গেট করে ফেলেছে ঘাতকেরা। আনুমানিক বিকাল ৫ টার দিকে তাকে লক্ষ্য করে কাপুরুষের মতো পিছন থেকে পিঠে গুলি করা হয়। গুলিটি সরাসরি তার পিঠ ফেড়ে বুক দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথেই রাস্তায় ঢলে পড়েন শহীদ জোবায়ের। রক্তে সিক্ত হয় পিচঢালা রাস্তা। তখনো তাকে জীবিতই মনে হচ্ছিল। ছাত্রজনতা জোবায়ের বেপারীকে উদ্ধার করে কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবেই একটি যৌক্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শহীদ জোবায়ের নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিলেন।

২০ জুলাই সকাল ৯ টায় দোবাদিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে শহীদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাড়ির পিছনের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদের প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদের প্রতিবেশী বিল্লাল হোসেন বলেন শহীদ জোবায়ের অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও নম্রভদ্র ছিলেন। তিনি কাউকে কখনও অহেতুক কষ্ট দেননি। নিজের কাজ করার সময় অন্যের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। এলাকায় গরিব-অসহায়দের খোঁজ-খবর নিতেন। তাদের সমস্যার কথা শুনতেন। বিপদে এগিয়ে আসতেন। ঋণগ্রস্থদের কর্জে হাসানা দিতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন মানুষের পরোপকারী বন্ধু।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৯.৭.২০২৪
উত্তরায় পুলিশ ও র‍্যাবের গুলিতে নিহত হন
শহীদ জোবায়ের আহমেদ
শহীদ জোবায়ের আহমেদ হত্যার বিচার
চাইবো কার কাছে ??

একনজরে শহীদের তথ্যসমূহ

নাম	: মো: জোবায়ের বেপারী
পিতা	: আ: ছুবুর বেপারী
মাতা	: আমেলা বেগম
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১ জানুয়ারি ১৯৮১, বয়স ৪৩ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫ টা, বিএনএস সেন্টার আজমপুর
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: দোবাদিয়া, উত্তরখান, ঢাকা
বাড়িঘর ও সম্পদের অবস্থা	: দুই তলা বিশিষ্ট ডুপ্লেক্স বাড়ি, প্রাইভেট কার ও মাইক্রো গাড়ি
স্ত্রী	: রিফা আক্তার তামান্না চাঁদমনি
পেশা	: গৃহিণী
১ম ছেলে	: রাফিউল বেপারী জায়ান, বয়স: ৭ বছর, শ্রেণি: নার্সারি, প্রতিষ্ঠান: স্কলাস্টিকা স্কুল
২য় ছেলে	: রাইয়ান বেপারী মেহরাব, বয়স: ৪ বছর, শ্রেণি: প্লে, প্রতিষ্ঠান: স্কলাস্টিকা স্কুল

শহীদ জসিম

ক্রমিক : ০০৩
আইডি : ঢাকা সিটি ০০৩

শহীদ পরিচিতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম শহীদ জসিম ১৯৮২ সালের ০১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার মাটিয়াকুড়া গ্রাম। তার পিতা মরহুম আবুল কাশেম এবং মাতা জনাবা সুরুজ বানু। স্ত্রী-সন্তান এবং বৃদ্ধ মাকে নিয়ে তিনি ঢাকার দক্ষিণখানে এক রুমের একটি কক্ষে ভাড়া থাকতেন। তার বৃদ্ধ মা দুর্ঘটনাজনিত কারণে পা ভেঙে যাওয়ায় অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতেন।

শহীদ জসিম দক্ষিণখান এলাকায় ভাড়ায় অটো রিকশা চালিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে মো: ফরহাদ, বয়স ৭ বছর। সে বাইতুন নূর মাদ্রাসায় নূরানী শ্রেণিতে পড়ে। মেয়ে হালিমার বয়স ৫ বছর। শহীদ জসিম ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার বিকাল ৩ টায় শহীদ জসিম বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার আন্দোলনে অংশ নিতে উত্তরার জসিম উদ্দিন মোড়ে উপস্থিত হন। সে সময় পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী সাধারণ ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশের ছোড়া দুটো গুলি শহীদ জসিমের দুই পায়ের উরুতে বিদ্ধ হয়। মূহূর্তেই রক্তে ভেসে যায় রাজপথ। প্রচণ্ড গুলি আর টিয়ারশেলের মুখে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে গোলাগুলি কিছুটা কমলে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ রক্ত ক্ষরণের ফলে তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পরেরদিন মঙ্গলবার শেরপুর নিজ গ্রামের মসজিদে শহীদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদের প্রতিবেশী লোকমান শরীফ বলেন "শহীদ জসিম অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও ভদ্র একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী। তাকে কারো সাথে কখনও কোনো খারাপ আচরণ করতে দেখিনি। যখন যে কাজ পেরেছেন করেছেন। কখনো কারোর কোনো ক্ষতি করেননি। আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জসিম
JASIM
আবুল কাশেম
01 Mar 1982
283 771 0041

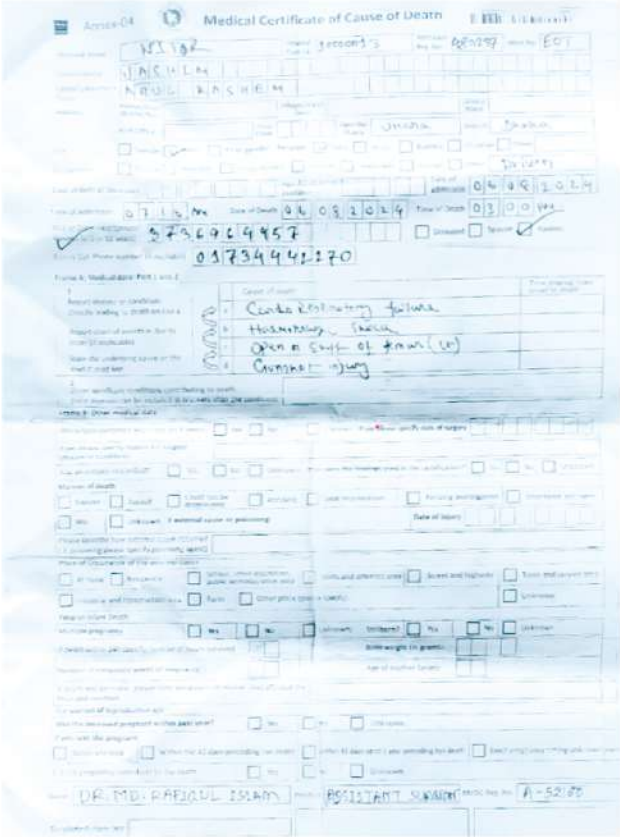
Medical Certificate of Cause of Death
JASHIM
ABUL KASHEM
01734444270
DR. MD. RAFIQUL ISLAM
ASSISTANT SURGEON

ব্যক্তিগত পরিচিতি

নাম	: জসিম
পেশা	: রিকশা চালক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৯৮২ সালের ১ মার্চ, ৪১ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার, বিকেল সাড়ে তিনটা
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধা ৭ টা, উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাটিয়াকুড়া, উপজেলা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম মোল্লারটেক, আশকোনা, থানা: দক্ষিণখান, জেলা: ঢাকা
পিতা	: মরহুম আবুল কাশেম
মাতা	: সুরুজ বানু, বয়স ৭০ বছর, অসুস্থ পা ভাঙা
বাড়ি ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: সহায় সম্পদ তেমন নেই
স্ত্রী'র বিবরণ	: স্ত্রী বাসাবাড়িতে রান্নার কাজ করেন
ছেলে	: মো: ফরহাদ, বয়স: ৭ বছর, শ্রেণি: নূরানী, বাইতুল নূর মাদ্রাসা
মেয়ে	: হালিমা, বয়স: ৫ বছর

শেখ ফাহমিন জাফর

ক্রমিক : ০০৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৪

“আমি মারা গেলে আমার লাশটা রাজপথে রেখে দিও”

শহীদ পরিচিতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক বীর সৈনিক ছিলেন শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর। ২০০৬ সালের ১০ জুলাই রাজশাহীতে তার জন্ম। গ্রামের বাড়ি নওগাঁ জেলার শাহাগোলা থানাধীন রঘুরামপুর ইউনিয়নের তারাটিয়া গ্রামে। ফাহমিন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি টঙ্গী সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। বাবা মা ডাক্তার হওয়ার পরামর্শ দিলেও ছোটবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। ছেলের পড়াশোনার জন্যই রাজশাহী ছেড়ে ঢাকায় এসেছিলেন ফাহমিনের মা কাজী লুলুল মাখমিন।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতেন ফাহমিন। ঘরে সাজানো ম্যাথ অলিম্পিয়াড আর বিজ্ঞান মেলার বেশ কিছু পুরষ্কার রয়েছে। টঙ্গি কলেজের বিজ্ঞান ক্লাবটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তার পরিচালনায়। বহুমুখী প্রতিভাবান দেশপ্রেমিক ছেলেটি দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত কবিতাও লিখতেন।

যেভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন

১৮ জুলাই ২০২৪। বৃহস্পতিবার। দুপুরের খাবার রান্না করে বসে আছেন মিসেস লুলুল মাখমিন। দুই ছেলেকে নিয়ে ঢাকার আব্দুল্লাহপুরের কাছে দক্ষিণখানে গাওয়াইর মাদ্রাসা রোডে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন তিনি। স্বামী আবু জাফর চাকুরির কারণে ছোট ছেলে ফারদিনকে নিয়ে রাজশাহীতে থাকেন। ফারদিন সেখানে MRK কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। বড় ছেলে ফারহান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজির বিবিএ আর মেজ ছেলে ফাহমিন টঙ্গী সরকারি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তেন।

ফাহমিনের প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয় ১১ জুলাই। ১৮ জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলাকালে উত্তরার আজমপুরে আন্দলোনরত অকুতোভয় ছাত্রসমাজের একজন ছিলেন ফাহমিন। সকাল ১১ টা থেকে স্বৈরাচারের লালিত পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের সাথে যুক্ত হয় যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। আজমপুর মূল সড়ক থেকে ছাত্রদের সরাতে উভয় হিংস্র বাহিনী গুলি ছুড়তে থাকে।

১৮ জুলাই সকাল সাড়ে দশটার দিকের ঘটনা। আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয় ফাহমিন। যাওয়ার আগে মায়ের কাছে দোয়া চায় সে যেন এই আন্দোলনে সফল হয়ে ঘরে ফিরতে পারে। বুকের ভেতরটা কী এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠে মিসেস জাফরের। তারপরও আন্দোলনে যেতে ছেলেকে নিরুৎসাহিত করেননি তিনি। ছেলে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করতে চাইছে। তাই অনুমতি দেন। না দিলে হয়তো অপরাধবোধে ভুগতেন তিনি। বের হওয়ার সময় দুই ছেলেকেই বলে দেন যেন তারা দুপুরে সময়মত এসে খাবার খেয়ে নেয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। কিন্তু কোনো ছেলেই ফিরে আসে না।

জানা যায়, পুলিশ যখন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে তখন উপর্যুপরি গুলিতে টিকতে না পেরে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। ডান হাতের পিছনে পিঠের কাছে ছররা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে রাজউক মার্কেটের সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ে ফাহমিন। সহযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে উত্তরা রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে ফাহমিনের বাসায় তখন মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বারবার বলে দেওয়ার পরও তার ছেলেরা দুপুরে বাসায় খেতে আসেনি। ঘড়ির কাঁটা তখন বিকাল তিনটা ছুঁই ছুঁই। খবর এলো ফাহমিন হাসপাতালে ভর্তি। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো মিসেস জাফরের। সংবাদবাহকের সাথে ছুটে চললেন তিনি। উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে গিয়ে দেখেন ফাহমিনের রক্তাক্ত লাশ। গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন লুলুল মাখমিন। ততক্ষণে কর্তব্যরত ডাক্তাররাও ফাহমিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফাহমিনের শাহাদাতের সাথে সাথে প্রিয় মাতৃভূমিতে স্বৈরাচারের গড়া বৈষম্যের ইমারতকে কবর দেওয়ার সংগ্রামে শেষ হয়ে যায় ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আরো একটি স্বপ্ন।

জ্ঞান ফিরলে ছেলের লাশ নিয়ে নওগাঁর আত্রাইয়ের দিকে রওনা হন লুলুল মাখমিন। সেখানে জানাজা শেষে তারাটিয়া গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে শহীদের লাশ দাফন করা হয়।

লুলুল মাখমিনের অশ্রুভেজা চোখে আজ তার কোলঘেঁষা সন্তানের স্মৃতি। কানে শুধু বাজে ফাহমিনের শেষ কথাগুলো-"আমি মারা গেলে আমার লাশ রাজপথে রেখে দিও। দাবি আদায় হওয়ার পর দেশ শান্ত হলে আমার লাশ রাজপথ থেকে এনে দাফন করো। আমার মতো অনেকের মৃত্যু হলে সবার লাশ রাজপথে পড়ে থাকবে। অনেক মা-ই তোমাকে সহযোগিতা করবে, চিন্তা করো না।"

শাহাদাত

১৮ জুলাই ২০২৪ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে উত্তরার আজমপুরে আন্দলোনরত অবস্থায় পুলিশ-যুবলীগের গুলিতে আহত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ ফাহমিন। নওগাঁ জেলার তারাটিয়া গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ ফাহমিন জাফরের পরিবারের একমাত্র উপার্জক্ষম ব্যক্তি তার বাবা শেখ আবু জাফর। তিনি রাজশাহীতে একটি বীমা কোম্পানীতে কর্মরত আছেন। তার মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা। সন্তানদের ভালোভাবে লেখাপড়া করাতে তার স্ত্রী বড় দুই সন্তানকে নিয়ে গত দুই বছর ধরে ঢাকায় একটি ভাড়া বাসায় অবস্থান করছেন।

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

শহীদের মাকে মাসিক বা বাৎসরিক সহযোগিতা প্রদান বা বাবাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার জন্য বা অপর দুই ভাইয়ের পড়াশোনা কেন্দ্রিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

Tongi Govt. College, Gazipur
TGC

TONGI GOVT. COLLEGE
GAZIPUR
IDENTITY CARD
Class : XI - XII
Group : Science
ID No. : 25 01 05 164
Session : 2023-2024
Principal

Government of the People's Republic of Bangladesh

WARD 22

RAJSHAHI CITY CORPORATION, RAJSHAHI

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Place of Birth: Rajshahi, Bangladesh

টঙ্গী সরকারি কলেজ

The Government of the People's Republic of Bangladesh

Tongi govt. College

প্রত্যয়ন পত্র

Uttara Crescent Hospital

Death Certificate

Mother's Name : KAZI LULUL MAKMIN

Address : HOUSE NO-417, GAWAI MADRASHA ROAD, DAKKHIN KHAN, UTTARA, DHAKA-1230

I examined the patient thoroughly & have found-

- Pulse - not palpable
- BP - not recordable
- Heart Sound - not audible
- Breath Sound - not audible
- Pupil - fixed, dilated, not reacting to light
- ECG - flat line

On the basis of above findings I have declared the patient dead.

Signature and name of attending physician

Uttara Crescent Diagnostic & Consultation Centre

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণনাম	: শেখ ফাহমিন জাফর
জন্ম	: ১০ জুলাই, ২০০৬, রাজশাহী
শহীদের পেশা	: ছাত্র, টঙ্গী সরকারি কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ
পিতা	: শেখ আবু জাফর (৬২), বেসরকারি চাকরিজীবী
মাতা	: কাজী লুলুল মাখমিন (৪৭), গৃহিণী
ভাইবোন সংখ্যা	: শহীদেরা ৩ ভাই
ভাই-বোনদের মধ্যে অবস্থান	: ২য়
স্থায়ী ঠিকানা	: নওগাঁ জেলার শাহাগোলা আত্রাই থানাধীন রঘুরামপুর ইউনিয়নের তারাটিয়া গ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: ৪৫, জামাল মঞ্জিল, গাওয়াইর মাদ্রাসা রোড, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: ২ ভাই
বড় ভাই	: শেখ ফারহান জাফর (২২), ছাত্র, BUBT, BBA.
ছোট ভাই	: শেখ ফারদিন জাফর (১৭), ছাত্র, রাজশাহী MRK কলেজ, একাদশ শ্রেণি

"কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও জাবিরকে বাঁচাতে পারিনি।"

শহীদ জাবির ইব্রাহিম

ক্রমিক : ০০৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শিশু জাবির ইব্রাহিম ২০১৮ সালের ১৯ মে সোমবার ঢাকার দক্ষিণখান থানার পশ্চিম মোল্লারটেক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কবির হোসাইন বেসরকারি মোবাইল রিটেইলার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং মাতা রোকেয়া বেগম একজন গৃহিণী। পরিবারের ৪ সদস্য নিয়ে শহীদের পিতা জনাব কবির হোসাইন পশ্চিম মোল্লারটেকে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত একটি ফ্লাটে বসবাস করেন। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে শহীদ জাবির সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। শহীদ জাবিরের বড় বোন জুমাইনা কবির নেহা এবং বড় ভাই জুহায়ের মাহতাব আবদুল্লাহ উভয়ই লেখাপড়া করছেন। শহীদ জাবির কেসি মডেল স্কুল ও কলেজ-এর ইংরেজি ভার্সনের নার্সারীতে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শিশু জাবির শান্ত স্বভাবের ছিলেন, খেলনার জন্য কখনো কান্নাকাটি করতেন না বরং বাসায় ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে হ্যান্ড ক্রাফট ও খেলনা বানাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জাবির সৎ, ধার্মিক ও নামাজী শিশু ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আর্মি অফিসার হবার স্বপ্ন দেখতেন।

" আম্মু আমি আন্দোলনে যাব "

সামগ্রিক ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী তথা কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিশু জাবির শুরু থেকেই আন্দোলনে অংশ নিতে পীড়াপীড়ি করতো, বারবার বলত "আম্মু আমি আন্দোলনে যাব।" আন্দোলনের শুরু থেকেই পুলিশ বাহিনী ও স্বৈরাচারী সরকারের ক্যাডার বাহিনী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাতে থাকে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ঘটনাগুলো জাবিরের পরিবার সহ্য করতে পারছিল না। জাবিবের মা সিদ্ধান্ত নেন পরিবারে সবাই মিলে শিক্ষার্থীদের লংমার্চে অংশ নেবেন। কিছুক্ষণ পর জানতে পারেন স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। রাস্তায় স্বৈরাচারী সরকার পতন ও স্বাধীনতার আনন্দে সবাই বিজয় মিছিল বের করে।

মিছিল দেখতে জাবির এর মা শিশু জাবিরকে সঙ্গে নিতে চাননি। কিন্তু শিশু জাবির এর জেদ এর কাছে হার মেনে অনেকটা বাধ্য হয়েই জাবিরকে নিয়ে উত্তরায় জসীমউদ্দীন সড়কে মিছিল দেখতে যান। বিজয় মিছিল হচ্ছে এ খবর জানিয়ে জাবিবের মা সন্তানদের বাবাকেও ফোনে জসীমউদ্দীন সড়কে আসতে বলেন। জাবির এর বাবাও সেখানে আসেন। এক পর্যায়ে জাবিরকে নিয়ে বাসায় ফিরে যেতে চাইলে আরও কিছুক্ষণ থাকার বায়না করে সে। ঐদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জসীমউদ্দীন সড়কে বিজয় মিছিল দেখতে আরও গিয়েছিলেন জাবির এর চাচা আইনজীবি নাজমুল হোসেন। তিনি বলেন ৫ আগস্ট বিকালে উত্তরা পূর্ব থানা ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোড়া হয়। এক পর্যায়ে পুলিশও পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে।"

জাবির এর মা জানান, ৪.৩০ এর সময় ৪নং সেক্টর এব বাইতুস সালাম মাদ্রাসার গেইট থেকে স্বৈরাচারী সরকারের উত্তরা পূর্ব থানার পুলিশ এপিবিএন অফিসের দিক থেকে তাদের দিকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। তখন জাবিরের বাবা-মা শিশু জাবির এর হাত ধরে সামনের দিকে দৌড় দেন। দৌড়াতে গিয়ে রাস্তায় জাবির পড়ে যায়। তখনো জাবিরের হাত ধরে ছিলো ওর বাবা, দৌড়ে এসে দেখেন রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থার পড়ে আছে জাবির। ওর উরুতে গুলি লেগেছে, রক্তে প্যান্টসহ শরীর ভেসে যাচ্ছে। রক্তাক্ত জাবিরকে কোলে করে দ্রুতই কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। দায়িত্বরত চিকিৎসক রক্ত দিতে বলেন। রক্ত জোগাড় হলেও ক্রস ম্যাচের অভাবে ৫ আগস্ট, ২০২৪ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতালে মাত্র ৬ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ জাবির। ৪ নং সেক্টর সংলগ্ন কবরস্থানে শহীদ জাবির ইব্রাহিমকে দাফন করা হয়।

শহীদ শিশু জাবির এর গর্বিত মা-

শহীদের গর্বিত মা তার আদরের কলিজার টুকরোকে হারিয়ে মর্মাহত। আল্লাহর কাছে জান্নাত লাভের জন্য দু'আ করেন। শহীদ জাবির এর মা বলেন, "ওর বাবা ওকে রক্তাক্ত অবস্থায় কোলে নিয়ে দৌড়াতে লাগলেন। পরে আমি জাবিরকে কোলে তুলে নেই। কয়েকটি হাসপাতাল ঘুরেও জাবিরকে বাঁচাতে পারিনি।"

ADVENTURE
AWAITS

শোকাহত
বৈষম্য বিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিজয় উল্লাসে
পুলিশ কর্তৃক এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষনে গত ৫ই আগষ্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন।
শহীদ জাবির ইব্রাহিম
আমরা গভির ভাবে শোকাহত।
সৌজন্যে ঃ কোটা সংস্কার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কবৃন্দ।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

নাম	: জাবির ইব্রাহিম
পেশা	: শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৯ মে ২০১৮, ৬ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল: ৪.৩০ টা
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৬:৩০, স্থান: কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: ৪ নং সেক্টর কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: রোড: ৯২, ইউনিয়ন: পশ্চিম মোল্লারটেক, থানা: দক্ষিণ খান, জেলা: ঢাকা
পিতা	: কবির হোসাইন
মাতা	: রোকেয়া বেগম
বাড়ী ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: পৈতৃক সূত্রে একটি ফ্লাট বাসা
ভাই-বোনের বিবরণ	: ১. জুমাইনা কবির নেহা, বয়স: ১৯, পেশা: ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান: আকিজ ফাউন্ডেশন শ্রেণি: এইচএস সি উত্তীর্ণ, সম্পর্ক: বোন
	: ২. জুহায়ের মাহতাব আব্দুল্লাহ, বয়স: ১২, পেশা: ছাত্র প্রতিষ্ঠান: কে সি স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রেণি: ৫ম, সম্পর্ক : ভাই

শহীদ সাইফুল ইসলাম

ক্রমিক : ০০৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৬

শহীদ পরিচিতি

পরিবারের একমাত্র অভিভাবক ছিলেন শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবক হলেও তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি। শহীদ সাইফুল ইসলাম ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি ঝালকাঠি সদরের দেউলকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় ছোট বেলাতেই তিন ভাই ও এক বোনের দায়িত্ব এসে পড়ে সাইফুল ইসলামের ওপর। তারই ধারাবাহিকতায় মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পড়ালোখার স্বপ্ন ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় থেকে রাজধানীতে। পরিবারের সামর্থ্য ছিল না। তাই ঢাকায় আসতে নিজের পাঠ্যবই বিক্রি করতে হয়েছিল তাকে। ঢাকায় এসে দীর্ঘ ছয় বছর তিনি শহরের বিভিন্ন জায়গায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। ২০০৬ সালে ২১ বছর বয়সেই তিনি নতুন কাজের সন্ধান পান এবং ঢাকা দক্ষিনখাণের ব্যবসায়ী মসরু চৌধুরির অধীনে কন্ট্রাকটর হিসেবে যুক্ত হন। সেখানেই দীর্ঘ ১৭ বছর যাবৎ স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে তিনি বসবাস করেছেন। ৩০ হাজার টাকার বেতনের চাকরি করলেও তিনি ছিলেন নিরহংকারী। তিনি বরাবরই নিরবে কাজ করে গিয়েছেন। পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে তিনি ছিলেন বটবৃক্ষ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ও নাম না জানা অনেককেই তিনি খাদ্য, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন, অথচ এগুলো কাউকে বলেও বেড়াননি। শাহাদাতের সময় তিনি স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে রেখে গিয়েছেন। তার একমাত্র কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যয়ন করছেন। শহীদ মো: সাইফুল ইসলাম নিজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ না করতে পারলেও, মেয়ের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার সন্ধ্যা ৬ টায় নিজ কর্মস্থল ৪ নং সেক্টরের ৯ নং হাউজ থেকে সাইফুল ইসলাম বাসায় ফিরছিলেন। ঐ মূহূর্তে ঢাকা শহরের সকল এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে শুরু করেছে। স্বৈরাচারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় ছাত্র-জনতা বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করছিল। সাইফুল ইসলাম ভেবেছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অফিস থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরে তিনি বুক ও হাতে গুলিবিদ্ধ হন।

তার একমাত্র কন্যা সোহানা আক্তার মীম বলেন, “৫ আগস্ট সকালে আমার অফিসে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় আমি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েও সরাসরি বাসায় না গিয়ে বাবার অফিসে যাই। তখন বেলা ২টা। সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে বাবার সাথে খোশ মেজাজে কিছুক্ষণ আড্ডা দেই। বাবাকে বাসায় যাওয়ার কথা বলি। তিনি বললেন যে, তুমি যাও, আমার একটু দেরী হবে। বাসায় আসার কিছুক্ষণ পর চাচ্চুর ফোন আসে। জানালেন-বাবা গুলিবিদ্ধ। ৫টার সময় আমি আর আম্মু কুয়েত মৈত্রী হসপিটালে যেয়ে বাবাকে মর্গে পাই। বাবার বুকে ও হাতে একটি গুলি লেগেছিল। এত সহজে বাবার হাসিমাখা মুখটা হারিয়ে ফেলবো তা আমি মানতেই পারছিলাম না। অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে আমি আর আমার চাচ্চু বাবাকে কোলে করে রিক্সার মাধ্যমে উত্তরা আধুনিকে নিয়ে যাই। সেখানেও যখন ডাক্তাররা বাবার মৃত্যুর কথা বলে তখন আমরা তাকে নিয়ে আবদুল্লাহপুরে আইচি হসপিটালে যাই। সেখানেও একই কথা শোনার পর নিশ্চিত হই বাবা আর নেই, তখন হার মানতে বাধ্য হই। নির্মম সত্য মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তখন।”

জানাজা ও দাফন

শহীদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণখান নিপা গ্রুপের সামনে এবং ২য় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দেউলকাঠি, ধানসিড়ি, ঝালকাঠী জেলায়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

দক্ষিণখান, ঢাকার ডাক্তার হাবিব বলেন

জনাব সাইফুল ইসলাম অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। সবসময় মানুষের উপকার করতেন। আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা কামনা করছি।

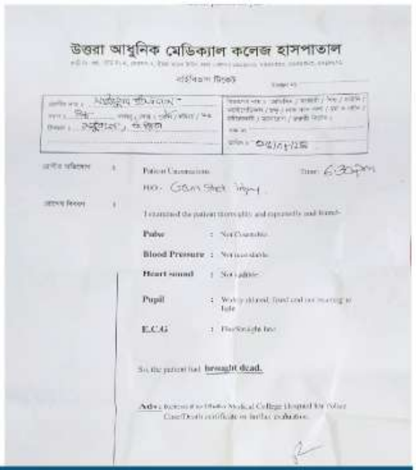

উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

Patient Examination Time: 6:30pm

H/O: Gun Shot Injury

I examined the patient thoroughly and repeatedly and found:

Pulse : Not Countable

Blood Pressure : Not recordable

Heart sound : Not audible

Pupil : Widely dilated, fixed and not reacting to light

E.C.G : Flat/Straight line

So, the patient had **brought dead.**

Adv: Referred to Dhaka Medical College Hospital for Police Case/Death certificate or further evaluation.

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: সাইফুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/১৯৭৫
পেশা	: চাকুরীজীবী
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: নিপা গ্রুপ অব কোম্পানীজ লিমিটেড
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দেউলকাঠি, ইউনিয়ন: ধানসিড়ি, থানা: ঝালকাঠি, জেলা: ঝালকাঠি
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: হলান রোড, এলাকা: ইসলামবাগ, থানা: দক্ষিণখান, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: আ: সামাদ মৌলভী
মায়ের নাম	: মোছা: সেতারা বেগম
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৭৫ বছর
স্ত্রীর নাম	: গুল নাহার, পেশা: গৃহিণী
কন্যার নাম	: সোহানা আক্তার মিম, বয়স: ২৪, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রেণি: মাস্টার্স
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: সন্ধ্যা: ৬:৩০, তারিখ: ৫ আগস্ট
মৃত্যুর তারিখ সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা: ৬:৩০, উত্তরা আধুনিক হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: দেউলকাঠি গ্রাম, ধানসিড়ি, ঝালকাঠী

আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়

শহীদ মো: গোলাম নাফিজ

ক্রমিক : ০০৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: গোলাম নাফিজ ২০০৮ সালের ২২ মে ঢাকা জেলার উত্তরখান থানার দোবাদিয়া ইউনিয়নের ২৪৬/এ/২ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মো: গোলাম রহমান (৫৪) পেশায় ব্যবসায়ী এবং তার মা জনাবা নাজমা আক্তার (৪৫) গৃহিণী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র গোলাম নাফিজ রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন ছোট। বড় ভাই গোলাম রাসেল (১৯) বি এ এফ শাহিন কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক। ছোট্ট এই পরিবারটি বসবাস করে রাজধানীর মহাখালীতে। তার বাবা গুলশান শপিং সেন্টারে একটি দোকান নিয়ে ব্যবসা করতেন। কিন্তু সেই সেন্টারটি ফেব্রুয়ারী ২০২৪ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়, যার কারণে বর্তমানে তিনি দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরে শহীদ নাফিজ ঘরে বসে থাকতে পারেননি। ৪ আগস্ট ২০২৪ রোজ রবিবার সকাল ১১ টার সময় বাবার কাছ থেকে বংলাদেশের পতাকা কেনার জন্য ৩০ টাকা নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত যৌক্তিক আন্দোলনে তিনি অংশ নেবেন। নাফিজ বাসা থেকে পায়ে হেটে ফার্মগেট এলাকায় তার বন্ধুদের সাথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সকাল থেকেই ছাত্র-জনতা বের হওয়ার চেস্টা করেন। তবে দুপুর থেকে আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনী ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা থেমে থেমে আক্রমণ চালাচ্ছি। পুলিশ এবং সন্ত্রাস বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে ছাত্রজনতা পিছু না হটে সামনে আগ্রসর হতে থাকলে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়।

সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন গোলাম নাফিজ এবং তার বন্ধুরাও। তারা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেউ আহত হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য হাসপাতালে নেয়ার ক্ষেত্রেও গোলাম নাফিজ ভূমিকা রেখেছিলেন। সময় গড়াতে গড়াতে যখন বিকাল আনুমানিক ৩ টা, তখন মেধাবী ছাত্র গোলাম নাফিজ সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়াল আক্রমণের শিকার হন। একটা গুলি তার বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলি খেয়ে রাস্তায় ঢলে পড়েন নাফিজ।

এদিকে স্বৈরাচারের ঘাতক পুলিশ ও যুবলীগের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমনে সাধারণ ছাত্ররা পিছু হটে। ঐ সময় একজন পুলিশ সদস্য একটি রিকশা ডেকে নাফিজকে তাতে তুলে দেন। গুলিবিদ্ধ গোলাম নাফিজকে পুলিশ যখন রিকশায় তুলে দিচ্ছিল তখনো সে রিকশার রডটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ তাকে নিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে ঢুকতে গেলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা তাকে বাধা দেয় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন সাংবাদিক। পরে ১৬ বছরের গোলাম নাফিজকে নিয়ে রিকশাচালক খামারবাড়ির দিকে চলে যান। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাদের বাধার পরও রিকশার পাদানিতে ঝুলতে থাকা নাফিজের কয়েকটি ছবি তুলতে পেরেছিলেন দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ।

অন্যদিকে দিন গড়িয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসলে তার মা বাবা নাফিজের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেন। ৪ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার পর পত্রিকাটির প্রথম পাতায় ছাপা নাফিজের একটি ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছবি দেখেই নাফিজের মা-বাবা সন্তানের খোঁজ পান। ছবি দেখেই কষ্টে ফেটে পড়ে তার পরিবার। কারণ তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের প্রিয় নাফিজ আর বেঁচে নেই। তবে যা কিছুই হোক লাশটা যে পেতে হবে। মন তো আর মানে না। রাত ৩ টার দিকে তার মামা আবুল হাসেম ফোন করে জানান যে, নাফিজের লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। এরপর তারা লাশ আনতে সেখানে যান। বাসায় লাশ আনার পর গোলাম নাফিজকে গোসল করানো হয়। পরেরদিন ৫ আগস্ট দোবাদিয়া মসজিদে জানাজা শেষে নাফিজের দাফন সম্পন্ন হয়।

শহিদ সম্পর্কে তার মায়ের অনুভূতি:

শহিদ সম্পর্কে তার মা নাজমা আক্তার বলেন, ' নিজেই চাইতাম আন্দোলনে ছাত্ররা জিতুক। নামাজ পড়ে দোয়া করতাম আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়। ছেলের মোবাইলে আন্দোলনের অনেক ছবি ছিলো। নিরাপত্তার জন্য ছবি ডিলেট করতে বলায় ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিল।'

কারও তাঁবেদারি করে না
মানবজমিন

এখন যারা সহিংসতা চালাচ্ছে তারা সন্ত্রাসী

জনবিস্ফোরণ নিহত শতাধিক

সরকার পতনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি
'মার্চ টু ঢাকা' আজ

সশস্ত্র বাহিনীকে ছাত্র-জনতার মুখোমুখি দাঁড় করাবেন না

অভিমত-বিশ্লেষণ | ৫

শিশুদের নিয়ে স্বপ্নগুলো যেভাবে হারিয়ে গেল

গুলিবিদ্ধ নাফিজ তখনো রিকশার রড ধরে ছিল

গোলাম নাফিজ

জুলাইয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশের ওপরে, ১৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

WALTON
Air Conditioner

ব্যক্তিগত পরিচিতি

নাম	: শহীদ মো: গোলাম নাফিজ
পিতা	: মো: গোলাম রহমান, পেশা: ব্যবসা
মাতা	: নাজমা আক্তার, পেশা: গৃহিণী
জন্ম	: ৫ এপ্রিল ২০০৮, বয়স: ১৬ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: বিকাল ৩টা, স্থান: ফার্মগেট ফুটওভার ব্রিজের নিচে
স্থায়ী ঠিকানা	: ২৪৬/এ/২, থানা: উত্তরখান, ইউনিয়ন: দোবাদিয়া বাজার, জেলা: ঢাকা-১২৩০

শহীদ মাওলানা খুবাইব আহমাদ

ক্রমিক : ০০৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৮

শহীদ মাওলানা খুবাইব আহমাদ

-আমি চলে যাবো তাতে আমার আফসোস নেই, আফসোস এই যে দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর কাছে যাওয়ার মতো যথেষ্ট আমল আমার নেই-

জন্ম-কর্ম ও বংশ পরিচয়

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার উজানি গ্রামে ১৯৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন খুবাইব আহমাদ। তিনি ছিলেন এক নিভৃতচারী মুহাক্কীক আলেমে দ্বীন। অত্যন্ত মেধাবী এই শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় চাঁদপুরের দ্বীনি শিক্ষার বাতিঘর জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানি মাদ্রাসা থেকে। পরবর্তীতে জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড় যাত্রাবাড়ী মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ শিক্ষা (ফারেগ) অর্জন করেন। সর্বশেষ দাওরা শেষ করে ইফতা জামাতে থাকাকালীন তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এছাড়াও দ্বীনের দ্বায়ী হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি বয়ান, ওয়াজ-নসিহত ও লেখালেখি করে গিয়েছেন। অল্প বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঈমান আক্বীদা রক্ষা ও ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার এক অগ্রসৈনিক। তার বাবা আল্লামা আব্দুর রহমান সাহেব দেশের একজন বিখ্যাত আলেম। তিনি চাঁদপুর জেলার উজানী মাদ্রাসাখ্যাত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সচিব এবং দেশ ও বিদেশের হাজারো আলেম গড়ার কারিগর।

সহোদরদের পরিচয়

মরহুমের চার ভাই যাত্রাবাড়ীই বসবাস করেন এবং ছয় বোনের সকলে বিবাহিতা। বড় ভাই হাফেজ মাসুদ একজন ব্যবসায়ী। রাজধানীর নিউমার্কেটে গার্মেন্টসের দোকান রয়েছে। মেজ ভাই মাওলানা মাহমুদ, সেজ ভাই হাফেজ জুবায়ের এবং সর্বশেষ মাওলানা সোহাইল। সকলেই কওমি মাদরাসার শিক্ষকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

দিন বদলের ডাক এসেছে, বাতাসে লাগাও কান
বাঙালী আজ উঠবে জেগে, বাজে শিকল ভাঙ্গার গান।

দিন বদলের ডাক

হঠাৎ দেশে দিন বদলের ডাক আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোটা আন্দোলনের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠন। সারাদেশের জনতা এক হয়ে দিন বদলের ডাকে অংশগ্রহণ করেন। একপর্যায়ে অসহযোগ থেকে শুরু করে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় কোটা বিরোধী আন্দোলন।

সংগঠনটির পরিচয়

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তৈরি একটি সংগঠন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয় এবং এই প্লাটফর্মটি সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করত বাধ্য হয়। ২০২৪ সালের ১ জুলাই এই প্লাটফর্মের সৃষ্টি হয় এবং সৃষ্টির পরপরই আন্দোলন সফল করার জন্য ৮ জুলাই সংগঠনটি ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি ঘোষণা করে, যার মধ্যে ২৩ জন সমন্বয়ক ও ৪২ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন। আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ৩ আগস্টে সংগঠনটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক দল গঠন করে, যার মধ্যে ৪৯ জন সমন্বয়ক ও ১০৯ জন সহ-সমন্বয়ক ছিলেন।

আন্দোলন ঘিরে কর্মসূচী ঘোষণা

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে চার দফা দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা লাগাতার কর্মসূচি দেয়। ২ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।

'মুমিনের জীবনপথের শুরুটা হয় বিপদ আর পরীক্ষা দিয়ে। এরপর আসে সবর ও তাওয়াক্কুলের সময়।'

শহীদের একাত্মতা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন মাওলানা খুবাইব আহমাদ। প্রতিটি কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংস হয়ে উঠলেও দমে যাননি স্বৈরাচার বিরোধী অকুতোভয় এ বীর সেনানী। বরং অন্য সহযোদ্ধাদের মত আরও বেশি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নিজেকে শামিল করেছিলেন তিনি।

" মুমিনের শেষটা হয় আলোকিত, হেদায়াতের, বিজয়ের "

বিজয় ও শাহাদাত

৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশ যেন রক্তখেকো হয়ে উঠে। একযোগে গণহত্যা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ঘাতক পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে মহাবীর মাওলানা খুবাইব উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহু আঁকবার ধনীতে মুখরিত করে রেখেছিলেন চারিদিক। হঠাৎ তিনি পুলিশের রোষানলে পড়েন। কয়েকজন পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলে। হামলার শিকার হন তিনি। পুলিশ তাকে উদ্দেশ্য করে দৌড় দিতে বলে। শাসিয়ে বলে "কথা বললে জামাত শিবিরের মামলা দিয়ে দেব। তারপরও চোখে-চোখ রেখে কথা

Government of the People's Republic of Bangladesh

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Birth Registration Number 19991315839042345

Date of Birth	05/03/1999	Sex : Male	
In Word	Fifth of March Nineteen Ninety Nine		
		Name	Khobaib Ahmad
		Mother	Abida Sultana
		Nationality	Bangladeshi
		Father	Maolana Abdur Rahman
		Nationality	Bangladeshi
		Place of Birth	Chandpur, Bangladesh
		Permanent Address	Road: Ujani, Vill: Ujani, Post Office: Ujani, Kachua Uttar, Kachua, Chandpur

Seal & Signature

Seal & Signature

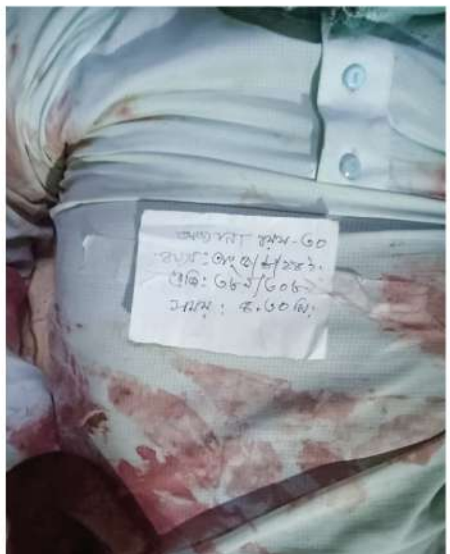

বলেছিলেন তিনি। একপর্যায়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত পুলিশ তাকে আক্রমণ করতে আসে। আক্রমণ থেকে বাঁচতে কাজলা ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। কিছুদূর দৌড়াতেই পিছন থেকে ঘাতক পুলিশ তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বীর সেনানী খুবাইব আহমাদ। ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন-"মুমিনের জীবনপথের শুরুটা হয় বিপদ আর পরীক্ষা দিয়ে। এরপর আসে সবর ও তাওয়াক্কুলের সময়। কিন্তু মুমিনের শেষটা হয় আলোকিত, হেদায়াতের, বিজয়ের।"

বিশেষ মর্যাদা

শহীদের লাশ অজ্ঞাত নামে খুঁজে পায় তার পরিবার। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে নিভৃতচারী মুহাক্কীক আলেমে দ্বীনের শাহাদতের খবর। সর্বপ্রথম জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড় যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় শহীদের লাশ নেয়া হয়। প্রিয় রাহাবারকে এক নজর দেখতে ভিড় জমায় ত্বলবে এলেমরা। সেখানেই শহীদের প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়। অতঃপর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদপুরের উজানি গ্রামে। প্রিয় সন্তানের নিজ মাদরাসা প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজা সম্পন্ন করেন আল্লামা আব্দুর রহমান সাহেব। পরবর্তীতে শহীদ মাওলানা খুবাইব আহমাদের লাশ চাঁদপুরের পৈতৃক বাড়ির আঙ্গিণয় দাফন করা হয়।

শেষকথা

শহীদ হওয়ার দিন সকালে তিনি তার আম্মাকে বলেছিলেন, "আম্মা আমার নাম খোবাইব না? খোবাইব রাযি. তো শহীদ হয়েছিলেন। আমিও একদিন শহীদ হবো ইন-শা-আল্লাহ।" মহান আল্লাহ তার কথা কবুল করে নিয়েছেন।

স্মৃতি বিবরণ

মাওলানা নাফিস আহমাদ (সহপাঠী) বলেন-

"একই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি। ছেলেটা সবসময় হাসি-খুশি থাকত। তার মুখে হাসি কখনো শেষ হত না। কেউ তাকে আঘাত করলেও হাসত। আজ সেই হাসিমাখা চেহারাটা আমাদের মাঝে আর নেই! খোবাইব, তোমার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ যেন তোমাকে জান্নাতের সবুজ পাখি হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!"

মাওলানা সোহাইল আহমাদ (সহোদর) বলেন- "তার সাথে যে সাক্ষাৎ করেছে, দেখা করেছে, তাকেই সে আনন্দিত করেছে, আশ্চর্য করেছে।"

মাওলানা নাঈম হাসান বলেন- "হে আল্লাহ! মনটাকে কিভাবে মানাই, এমন একটা তরতাজা প্রাণ, কিভাবে উড়ে গেল। হে আল্লাহ শহীদ খুবাইবকে আপনি শাহাদতের উচ্চ মাকাম দান করুন। তাঁর কথা মনে পড়লে ভিতরটা নাড়া দিয়ে ওঠে।"

শহীদ মাওলানা মোঃ খুবাইব আহমাদ

এর লেখা কবিতা

যখন তখন মৃত্যু এসে যদি আপনার সাজানো স্বপ্নে হানা দেয় তবে এই ধোঁকার রাজ্যের মিছে স্বপ্নে নিজেকে ব্যস্ত রেখে কি লাভ? কি লাভ এতো মায়া বাড়ানোর! কিংবা ভালোবাসার এক পৃথিবী গল্প বুনার। যদি চলেই যেতে হয় তবে ক্ষণস্থায়ী এই কষ্টের জন্য কেন এত আহাজারি !

কেন অপ্রাপ্তি আর হতাশার দীর্ঘশ্বাসের ভীড় ?
কেন চোখের লোনা সমুদ্রে অপ্রাপ্তির ঢেউ ?
বলুন না! কেন এসব ?

বারবার নিজেকে প্রশ্ন করুন,
দেখুন আপনার ভিতর কি বলে।
যদি ভিতর বলে এগুলো মিছে,
তবে আপনার হতাশা গুলোর মৃত্যু হোক।
আখেরাতের জন্য চোখের অশ্রু গুলো মুছে আবার আপনি জেগে উঠুন।

আপনি কি এতে খুশি না? যে তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে

শহীদ মাদরাসা শিক্ষার্থী

শহীদ মাওলানা খুবাইব

যাত্রাবাড়ী জামিয়া ইবরাহিমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড়-এর মুহতামিম মাওলানা আবদুর রহমান উজানী সাহেবের ছোট ছেলে

যাত্রাবাড়ী বড় মাদরাসার স্পটে পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

এক নজরে শহীদ খুবাইব আহমাদ

নাম	: মাওলানা খুবাইব আহমাদ
পিতার নাম	: মাওলানা আব্দুর রহমান
মাতার নাম	: আবিদা সুলতানা
পেশা	: ছাত্র ও খণ্ডকালীন শিক্ষক
মাদ্রাসার নাম	: জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহীমিয়া ইসহাকিয়া কাজলার পাড় যাত্রাবাড়ী মাদরাসা
প্রাথমিক শিক্ষা	: জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া উজানি মাদ্রাসা, চাঁদপুর
শ্রেণি	: ইফতা (মাস্টার্স)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উজানি, ইউনিয়ন: উজানি, উপজেলা: কচুয়া জেলা: চাঁদপুর
মৃত্যুর তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪
কিভাবে মারা যায়	: পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে কাজলা, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নীচে মারা যায়
কবরস্থান	: উজানি পারিবারিক কবরস্থান (মাদরাসা প্রাঙ্গণ), উজানি, কচুয়া, যাত্রাবাড়ী
জন্মতারিখ	: ০৫/০৩/১৯৯৯
বয়স	: ২৫

মৃত্যুর ভয়কে জয় করেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদ জয়

শহীদ রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ (জয়)

ক্রমিক : ০০৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০০৯

শহীদ পরিচিতি

বাবা মায়ের অতি আদরের কনিষ্ঠ সন্তান। নাম তার রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ (জয়)। নিজের কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই বাবা-মায়ের দেয়া নামকে যেন তিনি স্বার্থক করে তুলেছেন। ২০০৪ সালের ২২ আগস্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এই ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ। পিতৃভূমি নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার শ্রীরামপুর গ্রামে হলেও বেড়ে উঠেছেন টঙ্গীর তুরাগ (কামারপাড়া) এলাকায়। দুই ভাইবোন, পিতা-মাতা এবং একমাত্র ভাগ্নেকে নিয়ে গঠিত জয়দের যৌথ পরিবার। স্কুল শিক্ষিকা বোন শাহনাজ আহমেদের স্বামী কর্মসূত্রে কাতার প্রবাসী। শহীদ জয়ের পিতা জনাব আহম্মদ উল্লাহ বাদল পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান। মা রুপালী আক্তার বিউটি গৃহিণী। পাশাপাশি পরিবারের আয়ে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি সেলাই কাজও করে থাকেন। শহীদ জয় কামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। অতঃপর টঙ্গী সরকারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ব্যক্তিগত জীবনে শহীদ জয় ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং বাস্তববাদী মানুষ। অল্প বয়সে নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং মায়ের সেবা করতেন। শহীদ জয় বাল্যকাল থেকে কৃচ্ছতা সাধনে অভ্যস্ত ছিলেন; প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কখনোই দাবী করতেন না। অর্থ অপচয় ভেবে ব্যক্তিগত উদযাপনও এড়িয়ে যেতেন। ইসলামী ফাউন্ডেশনের কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি।

সামগ্রিক ঘটনার বর্ণনা

জুলাই ২০২৪ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন পর্যায়ক্রমে প্রকট আকার ধারন করে। সমগ্র দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের পাশাপাশি প্রতিবাদে শরিক হন কৃষক, শ্রমিক, হকার, চাকরিজীবীসহ আবালবৃদ্ধবনিতা। সকল শ্রেনি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হওয়ায় ছাত্রজনতার উপর নেমে আসে স্বৈরাচারের নির্যাতন। পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির পাশাপাশি সরকার দলীয় যৌথ সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ছাত্রজনতার উপর মুহুর্মুহু তাজা গুলি, টিয়ার শেল, রাবার বুলেট ইত্যাদি দিয়ে আক্রমণ শানানো হয়েছিলো। বিপ্লবী জনতা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রবল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জোরদার করতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় শহীদ জয় উত্তরা-৭ নং সেক্টরের হাউজবিল্ডিং এলাকায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগদান করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ১৯ জুলাই ২০২৪ রোজ শুক্রবার দেশব্যাপী 'কমপ্লিট শাটডাউন' পালিত হয়। শহীদ রিদোয়ান জয় ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকেল ৩ টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে অংশ নেন। তার মা মসজিদে দান করার জন্য কিছু টাকাও তাকে দিয়েছিলেন। শহীদ জয় টাকাগুলো মসজিদে দান না করে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনে ছাত্রদের মাঝে বিলিয়ে দেন। কেননা আগেরদিন অর্থাৎ, ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার এই এলাকায় অনেক ছাত্র আহত হওয়ায় তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েছিলো। কিন্তু আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ব্যান্ডেজের গজ কাপড় না থাকায় আহত অনেকেই নানাবিধ সংকটের মুখে পড়েছিলেন।

যাই হোক, শহীদ জয় অবস্থান করছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের সামনে। ঐ সময় পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনীর যৌথ আক্রমণ ক্রমে বেড়ে চলছিলো। সাহসী যোদ্ধা শহীদ রিদোয়ান জয় আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি তিনি সহযোদ্ধা ছাত্রদের ব্যাগগুলো পাহারায় নিয়োজিত থাকেন। বিকেলে আছরের নামাজ পড়তে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করলে বিরুপ পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়নি। বিকেল ৫:৩০ মিনিটে মায়ের সাথে মোবাইল ফোনে তার শেষ কথা হয়।

ঘটনার পরিক্রমায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তার দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী অনুসারীদেরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গুলি করতে করতে এগুতে থাকলে ছাত্রজনতা তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে জাহাঙ্গীর আলমের সন্ত্রাসী দল পর্যুদস্ত হয়। তবে তাদের নির্বিচার গোলাগুলিতে অনেকে আহত ও নিহত হন। যুগপৎ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মাঝে ঘটনার আকস্মিকতায় রাত আনুমানিক ৮:৩০ মিনিটে সন্ত্রাসী ঘাতকের একটি গুলি রিদোয়ান জয়ের মাথার পিছনে এসে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলে তার বন্ধুও পেটে গুলিবিদ্ধ হন। আহত বন্ধুটি প্রাণে বেঁচে গেলেও রিদোয়ান জয় ঘটনাস্থলে শাহাদাত বরণ করেন। পাশ্ববর্তী বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শহীদের পিতামাতা এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন এবং হাসপাতাল থেকে লাশ সংগ্রহ করেন। শহীদের জানাজা না করার জন্য প্রশাসন ও বিতর্কিত দল আওয়ামিলীগের নেতাকর্মীদের ব্যাপক হুমকি ও চাপ থাকা স্বত্ত্বেও পরদিন সকালে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং কামারপাড়া কবরস্থানে শহীদ মুগ্ধর পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

নিকটাত্মীয় ও সহযোদ্ধাদের অভিব্যক্তি:

নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য থেকে জানা যায়, শহীদ জয় টিনেজ বয়স থেকেই সব ধরনের বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলেন। সৎসাহস এবং আত্মসংযম ছিলো তার উল্লেখযোগ্য দুটি বৈশিষ্ট্য। রমজানে সবগুলো রোজা তিনি রাখতেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতায়ও তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

প্রতিবেশীর অনুভূতি:

অচল (প্রতিবেশীর সন্তান) আর জয় একসাথে বড় হয়েছে। টিনেজ হলেও জয় ভদ্র ও নম্র ছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন।

বন্ধুদের অনুভূতি:

শহীদ মুগ্ধ ও জয়ের কবর পাশাপাশি অবস্থিত। শহীদ মুগ্ধ জাতীয় রাজনীতির আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হলেও শহীদ জয়কে নিয়ে ততোটা আলোচনা হয় না। শহীদ জয়ের আলোচনা ও স্বীকৃতি প্রয়োজন। কারণ, দেশে আবার যুদ্ধ হলে জীবিত শহীদ জয় আবারও যুদ্ধে যেতেন।

শহীদের নিজের স্বপ্ন

শহীদ জয়ের এতিমখানা করার স্বপ্ন ছিলো। গ্রামের বাড়িতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং রাস্তা নির্মাণ করার ইচ্ছে ছিলো তার।

শহীদের এনআইডি কার্ড

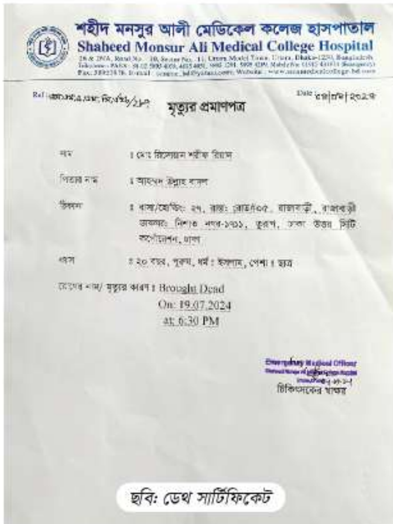

শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
Shaheed Monsur Ali Medical College Hospital

মৃত্যুর প্রমাণপত্র

নাম : মোঃ রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ

পিতার নাম : আহম্মদ উল্লাহ বাবুল

ঠিকানা : বাসা/হোল্ডিং: ২৭, রাস্তা: রোড#০৫, রাজাবাড়ী, রাজাবাড়ী আবাসন: নিশাত নগর-১৭১১, তুরাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা

বয়স : ২০ বছর, পুরুষ, ধর্ম : ইসলাম, পেশা : ছাত্র

রোগের নাম/ মৃত্যুর কারণ : Brought Dead
On: 19.07.2024
At: 6:30 PM

Emergency Medical Officer
চিকিৎসকের স্বাক্ষর

ছবি: ডেথ সার্টিফিকেট

ব্যক্তিগত পরিচিতি

শহীদের নাম	: রিদোয়ান শরীফ রিয়াদ (জয়)
জন্ম তারিখ	: ২২/০৮/২০০৪
জন্মস্থান	: গ্রাম: শ্রীরামপুর, উপজেলা: বদলগাছি, জেলা: নওগাঁ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: বাড়ি/২৭, রোড: ০৫, এলাকা: ব্লক-বি, রাজাবাড়ি থানা: তুরাগ (কামারপাড়া), জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: আহম্মদ উল্লাহ বাদল
পিতার পেশা ও বয়স	: ইলেক্ট্রিশিয়ান, ৬০
মাসিক আয়	: ৩০,০০০/- মাত্র
মায়ের নাম	: রুপালী আক্তার বিউটি
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৪৫
বোনের নাম	: শাহনাজ আহমেদ
বোনের পেশা	: স্কুল শিক্ষিকা
ঘটনার স্থান	: বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, হাউজ বিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত হওয়ার সময়	: রাত ৮:৩০, ১৯ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, হাউজ বিল্ডিং, উত্তরা
শহীদের কবরের অবস্থান	: কামারপাড়া, ঢাকা
প্রস্তাবনা	: শহীদের পিতার জন্য একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া

“বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে চলে গেলেন পরপারে।”

শহীদ সোহেল মিয়া

ক্রমিক : ০১০

আইডি : ঢাকা সিটি ০১০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সোহেল মিয়া ছিলেন একজন অকুতোভয় সাহসী নির্ভীক যোদ্ধা। তিনি ১৯৯৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের গোয়াতলা ইউনিয়নের জোকা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব হাকিম বয়স ৬০ বছর এবং মাতা মোছা: আমিনা খাতুন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শহীদ সোহেল মিয়া ছিলেন একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন। স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা করে একজন বড় মানুষ হবেন।

কিন্তু বৃদ্ধ বাবা অকর্মক্ষম হয়ে পড়লে নিজেই কাধে তুলে নেন সংসারের সব দায়-দায়িত্ব। অদম্য ইচ্ছা আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। বেঁচে থাকার জন্য জীবনের প্রতিটি মূহূর্তে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরিবারের একমাত্র সন্তান হওয়ায়, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপরে এসে বর্তায়। পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঢাকায় পাড়ি জমান জীবিকার উদ্দেশ্যে। ঢাকায় এসে একটি হোটেলে কাজ নেন। সেখানেই দীর্ঘ ৭ বছর ধরে মাত্র ১৮ হাজার টাকা বেতনে কাজ করে গিয়েছেন।

তার বেতনের টাকা দিয়েই কোনোরকম টেনেটুনে সংসার চলত। অনেকটা নূন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তার ঘরে একটি ছোট্ট ছেলেও আছে। ওর বয়স মাত্র ৪ বছর। পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি ঢাকার ভাটারায় তার শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। তার শ্বশুরের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়। সামান্য ঝুট ব্যবসা করে তিনি সংসার চালান। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। নিজের আয় দিয়ে বিদেশ যাওয়ার অর্থ যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব না। তাই তিনি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসার কাজ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করে সকল ধার দেনা শোধ করে পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবেন। তিনি শুধু একজন জীবন যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। যেখানে থাকবে না কোন অন্যায়, জুলুম, অবিচার। কিন্তু সহসা তার সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার পতনের দিন আনন্দ মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নৃশংস গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা

ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। শত শহীদের তাজা রক্তের বিনিময়ে ছাত্রজনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ৫ আগস্ট সারা দেশে আনন্দ মিছিল বের হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ মানুষ গণভবনে ছুটে আসে বিজয়ের অংশীদার হতে। সবার মতো সোহেল মিয়াও ছুটে এসেছিলেন। আনন্দ মিছিল শেষে রাতে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। মেরুল বাড্ডায় ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আসলে আওয়ামী হায়েনার দল তার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। সেখানে তারা অনবরত গুলি ছুড়তে থাকে। একটি গুলি এসে শহীদ সোহেলের গায়ে বিদ্ধ হয়। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। মূহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সোহেল মিয়া। কংক্রিটের রাস্তা মুহুর্তেই শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। মাটিতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ সোহেল মিয়া। মৃত্যু হয় এক স্বপ্নবাজের। আওয়ামী নরপিশাচরা তার মৃত্যুর পরও ক্ষান্ত হয় না। তারা শহীদের লাশ গুম করার চেষ্টা করে। অবশেষে ৫২ হাজার টাকার বিনিময়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাদের কাছ থেকে লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কতটা অমানবিক, পাষাণ হৃদয়ের হলে মানুষ এমন হীন কাজ করতে পারে? এটিই তার পরিবারের প্রশ্ন।

ঘটনার পরদিন ৬ আগস্ট সকালে তার লাশ ঢাকার ভাটারায় আনা হয়। সেখানে তাকে শেষ বিদায় জানাতে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হন। বিদায় জানাতে এসে আত্মীয় স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এরপর রাত ৯ টার দিকে শহীদের লাশ তার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় আনা হয়। সেখানেই তার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

পারিবারিক অবস্থা

তার পারিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তিনি একটি হোটেলে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। তার সামান্য আয়ে সংসার চলত। শহীদের একটি ৪ বছরের ছেলে সন্তান আছে। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিদেশ যেতে চেয়েছিলেন। পাসপোর্ট ভিসা করতে তাকে অনেক টাকা ঋণ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বিদেশ যাওয়ার আগেই শাহাদাত বরণ করলেন। এই ঋণের বোঝা বর্তমানে তার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

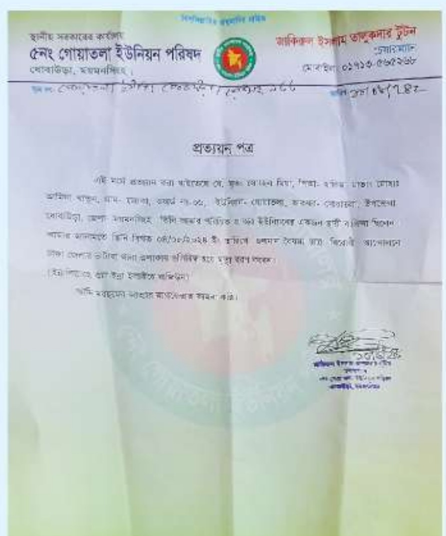

ব্যক্তিগত পরিচিতি

নাম	: শহীদ সোহেল মিয়া
পেশা	: হোটেল কর্মচারী
পিতা	: জনাব মো: হাকিম, বয়স: ৬০ বছর
মাতা	: মোছা: আমিনা খাতুন
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৬/০৯/১৯৯৭ শাহাদাতের সময় বয়স ছিল ২৭ বছর
শাহাদাৎ বরণের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, স্থান: মেরুল বাড্ডায় ব্রাক বিশ্বিবদ্যালয়ের সামনে
দাফন	: ৬ আগস্ট ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় তার নিজ গ্রামে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: জোকা, ইউনিয়ন: গোয়াতলা, থানা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ
বর্তমান ঠিকানা	: খ্রিস্টান গলি খিলবাড়ির টেক, ভাটারা, ঢাকা
পরিবার সংক্রান্ত তথ্য	: তার পরিবারে স্ত্রী, ৪ বছরের একটি ছেলে এবং বৃদ্ধ বা-মা আছে

মিরাজ ছিল-
"আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন"

শহীদ মিরাজ হোসেন

ক্রমিক : ০১১

আইডি : ঢাকা সিটি ০১১

শহীদ পরিচিতি

রাজধানী শহরের ব্যস্ততম এলাকা যাত্রাবাড়ীর মধুবাগ। অনেকেই মফস্বল থেকে এই শহরে বসবাস করতে আসেন। তেমনি জনাব মো: আব্দুর রব ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম ডেমরার পাড়াডগাইর সংলগ্ন মধুবাগে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে আসেন। জনাব মো: আব্দুর রব নতুন শহরে এসে ভাড়ায় চালিত একটি লেগুনাকেই নিজের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে নেন। সারাদিন পরিশ্রম করে স্ত্রীর সাথে ভবিষ্যতের বিষয়ে পরিকল্পনা করেন।

কিছুদিন পর ১৯৯৫ সালের ১১ মার্চ তাদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় শহীদ মিরাজ হোসেন। বাবা-মা একত্রে তাদের ছেলেকে আদর সোহাগে বড় করে তোলেন। পরবর্তীতে মিরাজের আরও দুজন ভাই-বোন হয়। যাদের নাম যথাক্রমে আব্দুল্লাহ ও পপি। সন্তানদের বড় হতে দেখে মমতাজ বেগম যেন আশায় বুক বাঁধেন। কিন্তু সে আশা হঠাৎ নিরাশা হয়ে যায়। মিরাজের বাবার ফুসফুসে ইনফেকশন ধরা পড়ে। অসুস্থতার কারণে চলা ফেরা কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। একপর্যায়ে স্বামীর চিকিৎসা করার জন্য পৈতৃক ভিটে মাটিও বিক্রি করেন তিনি।

মিরাজের একমাত্র বোন রুবিনা আক্তার পপি। অনেক স্বপ্ন নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা আব্দুর রব। আর্থিক দিক থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত হলেও মেয়ের বিয়ের আয়োজনে কোনো কমতি রাখেননি তিনি। দু-হাত ভরে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে উপহার পাঠিয়েছিলেন আব্দুর রব যাতে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে ভালো থাকে। বেশ কয়েক বছর সংসার ঠিক মত চলে। পরিবারে নতুন অতিথি জন্ম নেয়। তারপর হঠাৎ একদিন সে সম্পর্ক ভাঁটা পড়ে। একমাত্র আদরের কন্যা আবার আব্দুর রবের সংসারে ফিরে আসে। বিচ্ছেদের বেদনায় বিয়োগান্ত অধ্যায়ের সুচনা ঘটে। মেয়ের এই করুণ পরিণতি নিরবে সহ্য করে নিতে বাধ্য হন আব্দুর রব।

পরিস্থিতি মানুষকে বাস্তবতা শেখায়

দায়িত্ব যখন নিজের

একদিকে আব্দুর রবের অসুস্থতা আবার অন্যদিকে স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা মেয়ে পপির ফিরে আসায় গোটা পরিবারে দীনতা নেমে আসে। সংসার জুড়ে চলে ক্ষুধার তীব্র হাহাকার। দু-মুঠো খাবার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় মিরাজ হোসেনের। একটা পর্যায়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই পরিবারের সকল দায়দায়িত্ব মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিজের কাধে তুলে নেন তিনি। বিভিন্ন দোকান ঘুরে অবশেষে কর্মচারী হিসেবে 'আলো ডোর হাউজ স্টোরে' স্বল্প বেতনে চাকরি শুরু করেন। কখনও অভার টাইম, কখনও বা ছুটির দিন। যেন থামতে জানে না অদম্য এই সৈনিক। ধীরেধীরে মহাজনের বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। কর্মচারী থেকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বাসা ভাড়া, বাবার চিকিৎসা খরচ, সহোদরের লেখাপড়া এবং সংসারের যাবতীয় খরচের দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় তাকে। তারপরও যেন থেমে থাকে না মিরাজ।

ভাইয়ের প্রতি আস্থা

শহীদ মিরাজের ছোট ভাই আবদুল্লাহ (২৬)। আর্থিক দীনতায় দশম শ্রেণির পর আর পড়াশুনা করতে পারেননি। বর্তমানে দেশের একজন জাতীয় দাবা খেলোয়াড় তিনি। দাবাকে পেশা হিসেবে নিয়ে বিপাকে পড়লেও এর পিছনের গল্প যেন বাস্তবতাকে হার মানায়। প্রাইভেট ক্লাবের ফি, রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আব্দুল্লাহ'র এই পর্যায়ে আসতে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনিই হলেন শহীদ মিরাজ হোসেন। পরিবারের অভাব-অনটন দুর্দিনে তিনি ছিলেন একমাত্র অবলম্বন। যে কারণে নিজে না খেয়ে হলেও ভাইয়ের ক্লাব ফি পরিশোধ করেছেন তিনি।

"তুমি পাশে না বসলে আমি খেতে পারি না"

মায়ের সাথে সখ্যতা

সারদিন পরিশ্রম করে এসে সবার আগে মা'কে খুঁজতেন মিরাজ। তাই গভীর রাত হলেও সন্তানের জন্য জেগে থাকতে হতো মমতাজ বেগমকে। ঘুমিয়ে পড়লেও যেন নিস্তার নেই। বারবার মা-মা ডাকে ঠিকই খুঁজে নিতেন তিনি। মাঝে মাঝে মমতাজ বেগম বিরক্তির সুরে ছেলেকে বলতেন "সব সময় পাশে বসে থাকা যায়, অন্য কাজও তো থাকে।" জবাবে মিরাজ বলত, "তুমি পাশে না বসলে আমি খেতে পারি না"

হঠাৎ দেশে আন্দোলন

২০২৪ সালের জুলাই মাস। হঠাৎ দেশে গণ আন্দোলনের জোয়ার ওঠে। যেন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। সরকারি চাকরিতে বৈষম্যের কোটাকে মানতে না পেরে হাসিনা সরকারকে ধিক্কার জানায় সাধারণ জনতা। এই আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচী দেয় বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থীরা। একে একে কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাজপথে নেমে আসে তারা। আন্দোলনকে প্রশমন করতে উঠে-পড়ে লাগে তৎকালীন স্বৈরাচারী খুনি শেখ হাসিনা ও তার দোসররা। তাদের ইন্ধনে শতশত তাজা প্রাণ গুলি করে হত্যা করে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টকারী পুলিশ বাহিনী।

'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'

জনতার বিজয়

আন্দোলন ধীরেধীরে তরান্বিত হয়। জুলাই মাস যেন শেষ হয়েও হয় না। ৪ আগস্ট দেশের ৬৪ জেলায় জনতার জাগরণ থেকে হুংকার ওঠে- "দাবী এক দফা এক, খনি হাসিনার পদত্যাগ"। একপর্যায়ে মার্চ টু ঢাকা নামে লং-মার্চ কর্মসূচী ঘোষণা করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা। পরদিন ৫ আগস্ট দেশবাসীর একাত্মতায়

একদিকে আব্দুর রবের অসুস্থতা আবার অন্যদিকে স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা মেয়ে পপির ফিরে আসায় গোটা পরিবারে দীনতা নেমে আসে। সংসার জুড়ে চলে ক্ষুধার তীব্র হাহাকার। দু-মুঠো খাবার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় মিরাজ হোসেনের। একটা পর্যায়ে অনেকটা বাধ্য হয়েই পরিবারের সকল দায়দায়িত্ব মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিজের কাধে তুলে নেন তিনি। বিভিন্ন দোকান ঘুরে অবশেষে কর্মচারী হিসেবে 'আলো ডোর হাউজ স্টোরে' স্বল্পবেতনে চাকরি শুরু করেন। কখনও অভার টাইম, কখনও বা ছুটির দিন। যেন থামতে জানে না অদম্য এই সৈনিক। ধীরে ধীরে মহাজনের বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। কর্মচারী থেকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বাসা ভাড়া, বাবার চিকিৎসা খরচ, সহোদরের লেখাপড়া, এবং সংসারের যাবতীয় খরচের দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় তাকে। তারপরও যেন থেমে থাকে না মিরাজ।

"কিন্তু পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস-স্বৈরাচারী সরকারের শোষনের কাছে হেরে গেলো অদম্য শহীদ মিরাজ"

সারদেশ থেকে লং-মার্চে অংশ নেয় লক্ষ জনতা। অবস্থা বেগতিক দেখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা। জনতার রোষানলে একপর্যায়ে দেশ থেকে পালিয়ে সুদূর ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় তাকে।

-পালাইছে রে পালাইছে শেখ হাসিনা পালাইছে!

খুনি হাসিনার পদত্যাগে সারাদেশে বিজয় মিছিল বের হয়। ছোট বড় সকলের মুখে একই কথা শোনা যায়- "পালাইছে রে পালাইছে শেখ হাসিনা পালাইছে"!

-ভাইয়া একবার কথা বল"

বিজয় মিছিল ও শাহাদাত

ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার পর 'বিজয় মিছিলে যোগদান করে মিরাজ হোসেন। যাত্রাবাড়ী থানার সামনে মিছিল চলাকালীন ঘাতক পুলিশ বাহিনী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েন মিরাজ। এই অবস্থায় তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে এক প্রাইভেট হাসপাতাল কর্মী। অতঃপর তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল কতৃপক্ষ জানায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। শাহাদাতের খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। লাশ বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। শহীদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন শোঁকের মাতমে ভাসে। ছেলের মুখে শেষ চুম্বন দেয় মমতাজ বেগম। প্রতিবেশীদের ভালোবাসা ও সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়ে জাতীয় বীর উপাধি লাভ করেন শহীদ মিরাজ হোসেন। ছোট ভাই মাথার কাছে বসে বারবার ডাকতে থাকে- ভাইয়া, ভাইয়া একবার কথা বল। আদরের ছোট ভাইকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তার বোন। সন্তানকে রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে নিজের কাঁধে খাটিয়া তুলে নেন জনাব আব্দুর রব। ছলছল চোখে জানাজা প্রাঙ্গণে পোঁছান। শতশত মানুষের উপস্থিতিতে ডগাইর মসজিদের সামনে জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর পিতা আব্দুর রব তার শহীদ সন্তানকে নিজ হাতে ডগাইর কবরস্থানে দাফন করেন।

-'আজ আমি কি নিয়ে বাঁচব।'

শহীদের মা, ভাই ও বোনের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মিরাজ হোসেন ছিলেন তিন ভাই-বোনের মধ্যে পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান। ছোট থেকে পরিবারের হাল ধরায় সবাই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত। তাই ছেলে হারিয়ে দুখিনী মা ও ভাই-বোন আজ পাগল প্রায়।

মা বলেন, সে ছিল আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন" আমার ছেলেকে হারিয়ে আজ আমি কি নিয়ে বাঁচব। আমার সংসার আজ কীভাবে চলবে। কি দোষ ছিল আমার ছেলের। কারা আমার ছেলেকে এভাবে মেরে ফেলল ?

বোন বলেন- "মিরাজকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। এখন আমি কাকে ভাই বলে ডাকব। সে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে এটাই আমার সান্ত্বনা। আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন।"

ছোট ভাই বলেন,"আমি ভাইয়ার সাথে ছোট থেকে একই সঙ্গে ঘুমিয়েছি। আমাদের দুই ভাইয়ের একটাই খাট ছিল। এমন অনেক রাত আছে আমরা গল্প করে কাটিয়েছি। বিছানায় শুয়ে আমার ভাইয়াকে আমি স্মরণ করি। তিনি আমাকে বাবার মত স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন করতেন। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো।"

শহিদ পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি

শহীদ মিরাজ হোসেনের বাবা এখনও ফুসফুসের ইনফেকশনে ভুগছেন। তার মায়ের মাথায় জটিল অসুস্থতা রয়েছে। প্রতি মাসে পরিবারে ২০০০/- টাকার ঔষধের প্রয়োজন হয়। তাইতো সন্তানকে হারিয়ে বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তারা। শহীদের ছোট ভাই দাবা খেলাকে পেশা হিসেবে নিয়ে এক প্রকার বিপাকে পড়েছেন। দাবা ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ম্যাচ-ফি ছাড়া খেলোয়াড়দেরকে মাসিক বা এককালীন ভাতা দেয়া বন্ধ রেখেছে। যেহেতু পরিবারে এই মুহূর্তে উপার্জনক্ষম কোনো ব্যক্তি নেই। তাই ফেডারেশন থেকে অবসর নিতে চাচ্ছেন তিনি। যেকোন কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করছেন। ঘর ভাড়া এবং আনুষাঙ্গিক যাবতীয় খরচ শহীদ মেরাজ হোসেনই বহন করতেন। বর্তমানে তার পরিবারে ঔষধ ক্রয় করার মত সামান্য অর্থকড়িও নেই।

এখন আর সন্তানের পাশে বসতে হয় না শহীদ জননীর। এখন আর রাত জেগে অপেক্ষা করতে হয় না তাকে! শুধু দয়াময় মহান রবের দ্বারে হাত পেতে থাকেন। যেন সর্বক্ষণ প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন তিনি। ফরিয়াদ করেন প্রভুর কাছে "হে আল্লাহ! আপনি আমার সন্তানকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন। শহীদি মৃত্যুর কাতারে শামিল করুন। (আমিন)"

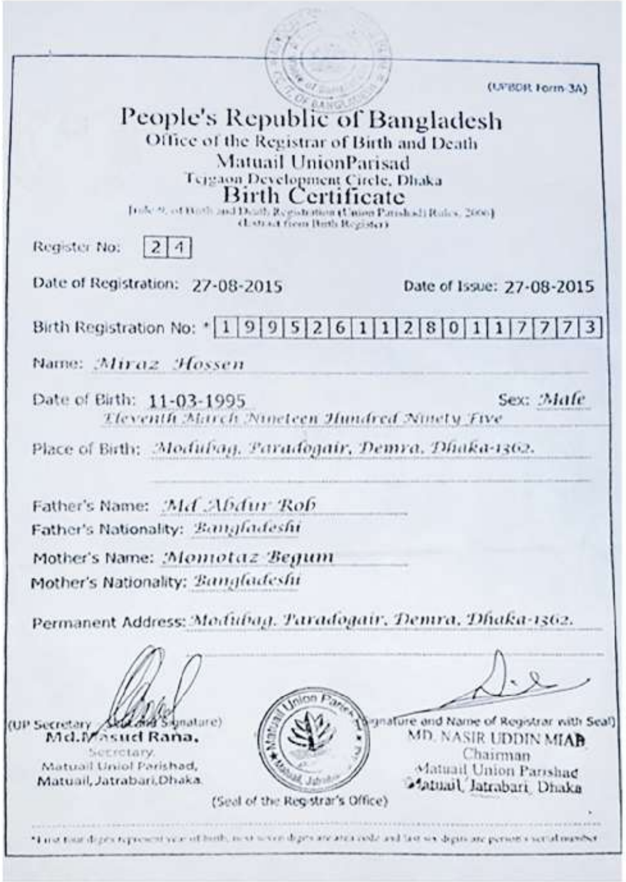

(UPBDR Form-3A)

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Matuail UnionParisad
Tejgaon Development Circle, Dhaka
Birth Certificate

Register No: 24

Date of Registration: 27-08-2015 Date of Issue: 27-08-2015

Birth Registration No: * 19952611280117773

Name: Miraz Hossen

Date of Birth: 11-03-1995 Sex: Male
Eleventh March Nineteen Hundred Ninety Five

Place of Birth: Modubag, Paradogair, Demra, Dhaka-1362.

Father's Name: Md Abdur Rob
Father's Nationality: Bangladeshi

Mother's Name: Momotaz Begum
Mother's Nationality: Bangladeshi

Permanent Address: Modubag, Paradogair, Demra, Dhaka-1362.

(UP Secretary Seal and Signature)
Md.Masud Rana,
Secretary,
Matuail Uniol Parishad,
Matuail,Jatrabari,Dhaka.

(Seal of the Registrar's Office)

(Signature and Name of Registrar with Seal)
MD. NASIR UDDIN MIAH
Chairman
Matuail Union Parishad
Matuail, Jatrabari, Dhaka

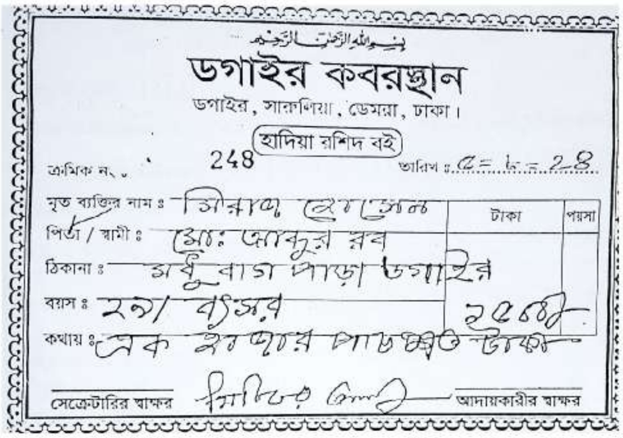

ডগাইর কবরস্থান

ডগাইর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

হাদিয়া রশিদ বই

ক্রমিক নং 248 তারিখ:

মৃত ব্যক্তির নাম: মিরাজ হোসেন

পিতা / স্বামী: মোঃ আব্দুর রব

ঠিকানা: মধুবাগ পাড়া ডগাইর

বয়স:

কথায়:

টাকা	পয়সা

সেক্রেটারির স্বাক্ষর আদায়কারীর স্বাক্ষর

ব্যক্তিগত পরিচিতি

নাম	: মিরাজ হোসেন
পেশা	: দোকানের ম্যানেজার, আলো ডোর হাউজ
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১ মার্চ ১৯৯৫, ২৯ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪, দুপুর: ১২:৪০টা
শাহাদাতের তারিখ	: ০৫-০৮-২০২৪, দুপুর: ২.৪৫টা
স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানা সংলগ্ন
দাফনের স্থান	: ডগাইর কবরস্থান, মধুবাগ, যাত্রাবাড়ী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মধুবাগ, পাড়াডগাইর, থানা: যাত্রাবাড়ী জেলা: ঢাকা
পিতা	: মো: আব্দুর রব, অবসর প্রাপ্ত ট্রাক চালক (৫১)
মাতা	: মমতাজ বেগম, গৃহিণী (৪৬)
বাড়ী-ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: পৈত্রিক কোনো আবাদি/বসতী জমি নেই
ভাই-বোনের বিবরণ	: ১. আবদুল্লাহ, বয়স: ২৬, পেশা: দাবা খেলোয়াড়, সম্পর্ক: ভাই
	: ২. মোসা: রুবিনা আকতার পপি, বয়স: ৩৬, (স্বামী পরিত্যাক্তা) সম্পর্ক: বোন

‘আমি যদি বেঁচে না ফিরি, তবে গর্বিত হইয়ো, জীবনে প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই’-আনাস

শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস

ক্রমিক : ০১২

আইডি : ঢাকা সিটি ০১২

শহীদের পরিচিতি

৫ আগস্ট গেন্ডারিয়ার বাসা থেকে গোপনে বেরিয়ে চানখাঁরপুলে আন্দোলনে যোগ দেন দশম শ্রেণির ছাত্র আনাস। সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি। আনাস বাসা থেকে গোপনে বের হওয়ার সময় তার স্কুলের খাতায় বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে আসে। চিঠিতে তিনি বলেন, “আমি যদি বেঁচে না ফিরি, তবে গর্বিত হইয়ো। জীবনে প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।” শাহরিয়ার খান আনাস তার জীবনে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা তার জীবন এবং দেশের ইতিহাসের গতিপথকে চিরতরে বদলে দিয়েছিল। যখন পুরো দেশ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, যখন চারপাশে ছিল রক্তের বন্যা আর মৃত্যু, তখন এমন অনেকেই ছিল যারা তাদের ঘর থেকেও বের হতে ভয় পাচ্ছিল এবং অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলার সাহস পাচ্ছিলো না। কিন্তু আনাস, একজন স্কুল ছাত্র হয়েও, সামনে থাকা বিপদের কথা ভাবেননি। তিনি ভাবছিলেন ভবিষ্যতের কথা, ন্যায়বিচারের কথা, স্বাধীনতার কথা। তিনি হয়তো কেবল একজন কিশোর ছিলেন, কিন্তু তার হৃদয়ে বহন করছিলেন সেই বিপ্লব যা তার দেশের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা তার ২০০৮ থেকে ২০২৪ সালের স্বৈরাচারী শাসনে অসংখ্য পরিবারকে কাঁদিয়েছে। নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে নিষ্পাপ শিশু, কিশোর, নারী, পুরুষসহ অধিকার আদায়রতদের। শেখ হাসিনার নির্দেশে দশম শ্রেণির ছাত্র আনাসকে তার পোষা পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করে। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আগে আনাস তার বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে রেখে যান।

বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা আনাসের আবেগ মিশ্রিত চিঠি পড়ে হাজার হাজার মানুষ কেঁদেছে। আনাস যেভাবে শহীদ হয়েছে, তার বর্ণনা শুনলেও একইভাবে সকলের হৃদয় ব্যথিত হবে। তাকে যেভাবে নির্মমভাবে খুন করেছে খুনি হাসিনার ঘৃণিত পুলিশ বাহিনী, তা কখনো যুদ্ধ ক্ষেত্রেও দেখা যায় না। যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন!

কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু থেকে আনাসকে গভীরভাবে ভাবাতো। কিন্তু বাবা-মায়ের সাথে তা কখনো শেয়ার করতেন না। মৃত্যুর পরে তার বাবা আনাসের পড়ার টেবিলে সবগুলো খাতা উল্টাতে গিয়ে দেখেন, একটা খাতায় ৭-৮ পৃষ্ঠা ধরে কোটা সংস্কার নিয়ে আনাস তার চিন্তাভাবনা লিখে রেখেছেন। যেটা থেকে বুঝা যায়, কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো শুরু থেকে গভীরভাবে খেলা করতো তার মনে।

আন্দোলনে যখন ব্যাপকতা বাড়ে। নির্বিচারে শিক্ষার্থীদের উপর গণহত্যা চালায় পুলিশলীগ, তখন আনাসের বাবা-মায়ের আগ্রহ তৈরি হয় ছাত্রদের পক্ষে। এরপর আনাসের মা এবং আনাস বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু প্রতিদিনই তার বাবা বলতেন, ' আজকে না, আরেক দিন। তোরা আজকে বের হইছ না, পরিস্থিতি ভালো হবে না আজকে' এভাবে না করতে করতে মা-ছেলে একসাথে আর আন্দোলনে যাওয়া হয় না।

এরমধ্যে আনাস ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি একাই বের হয়ে যাবেন। জুলাই মাসজুড়ে মার খেতে খেতে অবশেষে ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ শুরু করে। এদিন লং মার্চের ডাক দেওয়া হয়। তখন আনাস আন্দোলনে যুক্ত হতে ৫ আগস্টের দিনকে বেছে নেন। ৪ আগস্ট রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আনাস চুপিচুপি স্কুল ব্যাগের ভেতর কিছু জামা-কাপড় ঢুকিয়ে নেন। সাথে ঘরের ওষুধের কৌটা থেকে জ্বর-ব্যথা এসবের কিছু ওষুধ রাখেন। পরদিন সকাল আনুমানিক ৯ টার দিকে বাবা-মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্কুল ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে যান। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে আবেগ-মিশ্রিত একটা চিঠি লিখে যান, যেটা সামাজিক মাধ্যমে প্রচার হয়েছে।

বাসা থেকে বের হয়ে আনাস চলে আসেন তাঁতিবাজার। আনাস কিছুটা সহজ সরল প্রকৃতির ছিলেন। তার মায়ের কথা অনুযায়ী, রাস্তাঘাটও তার খুব একটা জানা নাই। তাই সে আগেই তার প্রাইভেট টিউটর (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী) ভাইয়ের কাছে থেকে রোডম্যাপ জেনে রাখেন। এটা আনাসের মা পরে জানতে পেরেছেন।

প্রাইভেট টিউটর ভাইয়া তাকে বলছিল, তাঁতিবাজার গেলে সেখানে আরও অনেকেই থাকবে তাদের সাথে চাঁনখারপুল গিয়ে যোগ দেবে। পরে তারা বকশিবাজার হয়ে হয়ে ঢাকা মেডিকেলের সামনে দিয়ে শহীদ মিনার এবং শাহবাগের দিকে যাবে। ঐখান থেকে দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তারা গণভবন অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে।

আনাস তাঁতিবাজার আসলে কয়েকজনের দেখা পায় যারা চেষ্টা করছিল একসাথে সামনে এগোতে কিন্তু পুলিশের বাঁধায় সামনে যেতে পারছিল না। ওখানে আনাস একজনকে বলে, "আপনারা আন্দোলনে যাচ্ছেন?"

আনাস তার কথা খুলে বললে, ঐ ছাত্ররা তাকে সাথে রাখে। (সেদিনের বর্ণনা যাদের কাছ থেকে পেয়েছেন তার মা, তাদের মধ্যে এই দলের একজন রয়েছে।) শেষ পর্যন্ত তারা পুলিশের পাশ কাটিয়ে চাঁনখারপুলের দিকে যেতে সক্ষম হয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ওখানে জমায়েত হতে থাকে ছাত্ররা। সেখানে আরেক ভাইয়ের সাথে পরিচয় ঘটে আনাসের। (উনার বর্ণনায় উঠে আসে আনাসের শহীদ হওয়ার আগ মুহূর্তের কাহিনি)

ঐ ছাত্র আনাসকে বলে, "তুমি ব্যাগ নিয়ে বের হইছো কেন? এতবড় ব্যাগ! কী আছে ভেতরে?"

আনাস উত্তর দেয়, "বাসায় ফিরলে আমার বাবা-মা বাসা থেকে আর বের হতে দিবে না। এজন্য কাপড়চোপড় নিয়ে বের হইছি। আন্দোলনে কোনো ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলে তার বাসায় থেকে যাব। শেষ হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে যাব।" (এখানে শেষ হওয়া পর্যন্ত বলতে আনাস বোধহয় শেখ হাসিনার পতন বুঝিয়েছে।)

ঐ ভাইয়া কথায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সাথে রাখে এবং আনাসের কাঁধ থেকে ব্যাগ নিয়ে নিজের কাছে নিয়ে রাখে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে জমায়েত হওয়া ছাত্রদের লক্ষ করে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুড়ে, কিন্তু ছাত্ররা পিছপা হয় না। এরপর বৃষ্টির মতো রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে। একটা রাবার বুলেট আনাসের গায়েও লাগে। সবাই দিগ্বিদিক শুন্য হয়ে আশপাশের গুলিতে ঢুকে। সে মুহূর্তে ঐ ব্যাগ নেয়া ছাত্রটি আনাসকে হারিয়ে ফেলে। আনাসরা কয়েকজন দৌড়ে নিমতলির ৯ নং নবাব কাটার গলির ভেতর ঢুকে পড়ে। একদম চিপা একটা গলি। পুলিশ ড্রোন পাঠিয়ে দেখে কয়েকজন অবস্থান করছে এ গলিতে। পুলিশের কয়েকজন আসে গলির ভেতর। ঐ অবস্থায় আশপাশের ছেলেরা বাসাবাড়ির গেইটের ফাঁক দিয়ে যে যেভাবে পারে আশ্রয় নেয়, কিন্তু আটকে পড়ে যান আনাস। জীবন বাঁচাতে সব বাসার গেইট আটকে দেয়া হয়, দোকানপাটের শাটারও সব বন্ধ। অসহায় আনাস একটা দোকানের শাটার ঘেঁষে

কাঁপতে থাকেন। ঠিক ঐসময় পুলিশ ক্লোজরেঞ্জ থেকে গুলি চালায়। প্রথম গুলিটা দোকানের শাটারে লাগে, দ্বিতীয় গুলিটা তার বুকে লাগে। গুলির আঘাতের পর আনাস বুকে হাত দিয়ে কয়েক কদম আগাতে গিয়েই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। (আনাস ঠিক যে অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল, ঐ দৃশ্যটা গলির দেয়ালে পরে গ্রাফিতি করেছিল এলাকাবাসী। আনাসের চিঠি ভাইরাল হলে, তার বাবা-মার খোঁজ পেয়ে জানানো হয় এই গ্রাফিতির কথা।

পরবর্তীতে পুলিশ মেইন রোডে চলে গেলে আশপাশে বিভিন্ন বাসার গেইটের চিপায় আশ্রয় নেওয়া ছাত্ররা আনাসকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মিটফোর্ড হাসপাতালে। কিন্তু তার আগেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান আনাস।

বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী খুনি শেখ হাসিনার পুলিশ এতো নির্মম হয়ে গিয়েছে যে, ভয়ে কাঁপতে থাকা একটি বালক ছেলেকে কাছে এসে গুলি করে হত্যা করে!

আনাসের ব্যাগ কাঁধে থাকা ছাত্রটি আনাসকে খুঁজে ফেরে। এদিকে গুলিবিদ্ধ আনাসের লাশ হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া লোকজন আনাসের পকেট ঘেঁটে একটা বাটন ফোন পায়। সেই ফোন দিয়ে আনাস গেমস খেলতো। কোনো সিম ছিল না। ফোনের কনটাক্ট লিস্টে ৪-৫টা নম্বর সেইভ করা। আনাসের বাবা-মা, নানা এবং মামাদের। সেখান থেকে কল দেওয়া হয় তার মায়ের নাম্বারে।

বরাবর ঠিক ১টা ১৮মিনিটে আনাসের মা একটা অপরিচিত নম্বর থেকে কল পান। রিসিভ করতেই ওপার থেকে শুনতে পান, "আপনাদের কেউ আন্দোলনে গিয়েছিল?" আনাসের মা বলেন, আমার ছেলে বের হইছে, আমাদের না জানিয়ে। তখন ওপাশ থেকে বলা হয়, আপনারা ইমার্জেন্সি মিটফোর্ড হাসপাতালে আসেন। ও আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আনাস ততক্ষণেই শহীদ হয়ে গিয়েছে। মায়ের কাছে গোপন রাখা হয়েছে ছেলের মৃত্যুর খবর।

ছেলের আঘাতের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে বাবা-মা ছুটে আসেন মিটফোর্ডে। হাসপাতালে এসে দেখেন স্ট্রেচারে দেশের পতাকা মোড়ানো আনাসের নিথর দেহ। বুক থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। সাদা জামা রক্ত লাল হয়ে গিয়েছে। কলিজার টুকরা ছেলের এই অবস্থা দেখে পাগলপ্রায় বাবা-মা। আনাসের বাবার কান্নায় হাসপাতালের আশপাশের সব মানুষ জড়ো হয়ে যায়।

অ্যাম্বুলেন্স খুঁজে পায় না, শেষ পর্যন্ত অটোতে করে বাবা-মা দুজনে ধরাধরি করে ছেলের লাশ নিয়ে ঘরে ফিরেন। একই এলাকার আরেক শহীদ শেখ মেহেদির সাথে তার জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জুরাইন কবরস্থানে দাদির কবরেই আনাসকে দাফন করা হয়।

আনাসের মা সানজিদা খান দীপ্তি বলেন,
"ছেলের লাশ নিয়ে যখন ঘরে ফিরে এসেছি, তখন ছেলের শরীরে রক্ত আর অবশিষ্ট ছিল না। সারা শহরের রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে আমার ছেলের রক্ত।"

আনাস যাত্রাবাড়ী গেন্ডারিয়ার আদর্শ একাডেমির বিজ্ঞান বিভাগে দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তার পুরো নাম শাহরিয়ার খান আনাস। তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবেন। বয়স মাত্র ১৬ বছর। এই বয়সে আমার, আমাদের জন্য নিজের জীবনটা স্যাক্রিফাইস করে ফেললেন।

আনাস আন্দোলনে যাওয়ার আগে বাবা-মায়ের উদ্দেশ্য যে চিঠিটি লিখে পড়ার টেবিলে বইয়ের ভেতর রেখে যান। সে চিঠি আনাসের ফুফাতো বোন আঁচলের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সামনে আসে। পরবর্তীতে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই গল্প ভবিষ্যতের জন্য আর্কাইভ করে রাখতে আনাসের মায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করা চিঠিটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

"মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য কোরে বের হোলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম কোরে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিষর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংরা মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেন বোসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতেই হবে। তাই মৃত্যুর ভয় কোরে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেঁচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনে প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই"। -আনাস

একশো শব্দে আনাসের এই ছোট্ট চিঠির ভার অনেক। যে ভার বইবার মতো সাধ্য আমাদের কারও নাই। যতদিন না আনাসের খুনিদের বিচার নিশ্চিত হবে, ততদিন আনাসের রক্তের কাছে আমরা দায়বদ্ধ থাকব।

বাবা সাহরিয়ার খান পলাশ বলেন: "আমার ছেলে খুবই ভদ্র ছিল। স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে। ছেলেটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হলো না। পুলিশের গুলি ওর জীবন কেড়ে নিলো। আমার ছেলে শহীদের মর্যাদা পাক, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাক।"

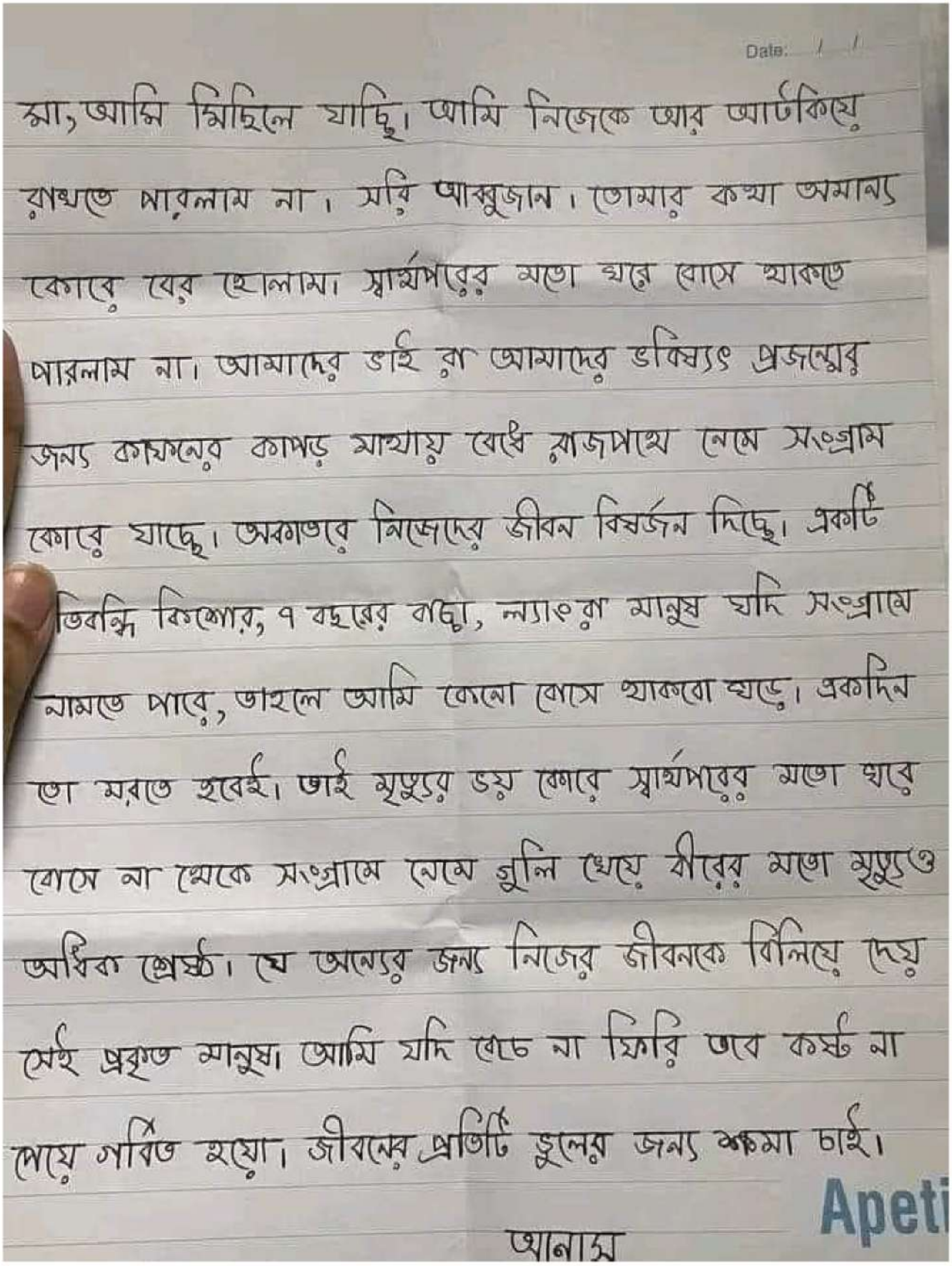

Date: / /

মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য করে বের হোলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি কিশোর, ৭ বছরের বাচ্চা, ল্যাংরা মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেনো বোসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয় করে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

Apeti

আনাস

jamuna|tv জাতীয় আন্তর্জাতিক সারাদেশ খেলাধুলা বিনোদন ক্যাম্পাস

শিক্ষার্থী আনাস হত্যা: ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনের নামে অভিযোগ

জাতীয় | 2ND OCTOBER, 2024 3:19 PM

এক নজরে শহীদ শাহরিয়ার খান আনাস

নাম	: শাহরিয়ার খান আনাস
পেশা	: ছাত্র, শ্রেণি: ১০ম, গেন্ডারিয়া আদর্শ একাডেমি, বিভাগ: বিজ্ঞান
পিতা	: সাহরিয়ার খান পলাশ
মাতা	: সানজিদা খান দীপ্তি
জন্ম	: ১৪ অক্টোবর ২০০৭
ঠিকানা	: ১২ নং কবিরাজ গলি, পটুয়াতল, গেন্ডারিয়া, ঢাকা
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: নিমতলির ৯ নং নবাব কাটার গলি, চানখারপুল, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: জুরাইন কবরস্থানে দাদীর কবরে
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: পরিবারটি ঢাকায় ভাড়া বাসায় অবস্থান করছেন
প্রস্তাবনা	: ১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

“মা, আমি বাইরে যাচ্ছি। আমার ছেলেকে তুমি খেয়াল রেখ”

শহীদ মোঃ মাসুদুর রহমান জনি

ক্রমিক : ০১৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৩

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

১৯৮৪ সালের ২২ এপ্রিল ঢাকা জেলার বংশাল এলাকায় জেবোল হোসেনের ঘর আলোকিত করে প্রথম জগত সংসারে পা রাখেন শহীদ মাসুদুর রহমান জনি। গ্রীষ্মের দাবদাহ, গরমে মাঠঘাট তখন ফেটে চৌচির। ঠিক তার বিপরীতে মায়ের কোলে ওম জড়িয়ে ঘরে আসে ছেলেটি। একমাত্র সবেধন নীলমনি সন্তানকে কাছে পেয়ে আনন্দ অশ্রু ঝরে মোমেনা বেগমের। সেদিনের ছোট্ট জনি বড় হয়ে দেশ প্রেমিক বীর যোদ্ধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন মোমেনা খাতুন ও জেবোল হোসেনের পালক পুত্র। মোমেনা খাতুনের কোনো সন্তান না হলে তাঁর শাশুড়ি নাতী হিসেবে জনিকে দত্তক নেয়। নিজের আপন মা'কে খালা এবং খালাকে মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল জনি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিষয়টি তিনি জানতে পারেন।

আঁধার দিল দেখা

দীর্ঘদিন পর সন্তানহারা মায়ের কাকুতি মিনতি কবুল করেন মহান রব। জনিকে দত্তক হিসেবে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েন মোমেনা বেগম ও জোবেল হোসেনের পরিবার। নাতিকে কাছে পেয়ে আদর সোহাগে মাতিয়ে রাখেন তার দাদী। কিন্তু সে আদর হঠাৎ অনাদরে রূপ নেয়। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় জনি এবং ওর মমতাময়ী মায়ের জীবন। হঠাৎ জেবোল হোসেনের মৃত্যু হয়। পরিবারকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর মোমেনা খাতুনের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন ও মানসিক যন্ত্রণা। একপর্যায়ে শশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে বোনের বাড়িতে চলে আসতে হয় মোমেনাকে।

আঁধার হল দূর

বাবার অবর্তমানে আত্মীয়স্বজনরা জনির পাশে এসে দাঁড়ায়। ধীরেধীরে বড় হতে থাকে জনি। একটু বড় হলে নিকটাত্মীয় ও কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। সকলে মিলে পুরাতন প্রাইভেট কার (মাইক্রো) ক্রয় করে সার্ভিস পয়েন্টে মেরামত করেন। এরপর বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে উপার্জন শুরু করেন তিনি। কিছুদিন পর খালার বাসা থেকে মা'কে নিয়ে আসেন জনি। আলাদা বাসা ভাড়া নিলে আবারও নতুন জীবন শুরু হয় মোমেনা খাতুনের।

-শেষ জীবনে আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।'

জীবন যখন রঙ্গিন

নিজের একাকীত্ব জীবনের অবসান ঘটাতে মনস্থির করেন জনি। কিছুদিন পর তিনি বিয়ে করেন। নতুন সংসার গুছিয়ে নিতে কোনো ত্রুটি ছিল না তার। অতঃপর সংসার আলোকিত করে জন্ম নেয় তার একমাত্র পুত্র আহমাদ ইসলাম মাহী (৫)। পরিবার জুড়ে চলে উৎসব আমেজ। মোমেনা খাতুন তার পুত্রবধূকে বলেন,"শেষ জীবনে আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।"

স্বপ্ন যখন ফিকে হয়ে যায়

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ একদিন স্ত্রীর সাথে বাকবিতণ্ডা হয় জনির। যা পরবর্তীতে বিচ্ছেদে রূপ নেয়। একপর্যায়ে তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদে জনির একমাত্র ছেলে মাহির জীবন হঠাৎ থমকে যায়। দাদীর কাছে বড় হতে থাকে সে। বর্তমানে মাহি স্থানীয় একটি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগে লেখাপড়া করছে।

দেশে এলো আন্দোলন

২০২৪ সালের ১ জুলাই। সারা বাংলাদেশে কোটা আন্দোলনের ডাক দেয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশি হামলার শিকার হয়। আন্দোলন দীর্ঘ হলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের "রাজাকারের নাতি-পুতি" হিসেবে অভিহিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিদ্রূপ মন্তব্যে শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে, "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" এবং "চাইতে গেলাম অধিকার; হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগান দেয়। ধীরে ধীরে আন্দোলন অসহযোগে রূপ নেয়। চারিদিকে হাসিনার পেটুয়া বাহিনী ও লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী ব্যাপক সহিংসতা চালায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়।

পালিয়ে গেল হাসিনা

৫ আগস্ট ২০২৪ কারফিউ ঘোষণা করে তৎকালীন খুনি শাসক শেখ হাসিনা। সেই কারফিউ ভেঙে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেয় ছাত্র-জনতা। তাদেরকে মূল সড়কে উঠতে বাধা দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। চালানো হয় নির্বিচারে গুলি। ওইদিনও প্রাণ হারান বহু মানুষ। এরপর বেলা দুইটার সময় গণমাধ্যমে খবর আসে, পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা একে অপরকে ধরে বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। নানা স্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের দিকে যাত্রা এবং গণভবনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ ভবনেও অবস্থান নেয় ছাত্র-জনতা।

-জনি ভাই রক্তের উপরে শুয়ে আছে

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

সেদিন যেন হিংস্র হায়েনায় রূপ নেয় হাসিনার পালিত পুলিশ বাহিনী। একদিকে চলে বিজয় মিছিল অন্যদিকে রক্তের স্রোতে ভেসে যায় যাত্রাবাড়ী ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তর। সে মিছিলে যোগদান করতে বাসা থেকে বের হয় জনি। যাওয়ার সময় মা'কে বলে যায়- 'মা, আমি বাইরে যাচ্ছি। আমার ছেলেকে তুমি খেয়াল রেখ'। কে জানত এই খেয়াল রাখার অর্থ সারাজীবনের দায়িত্ব গ্রহণ। অতঃপর যাত্রাবাড়ী থানা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় জনি। স্লোগানে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ। হটাৎ কয়েকটি গুলি জনীর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি। আশেপাশের ছাত্ররা তাকে দ্রুত মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। খবর পেয়ে জনির খালাত ভাই দ্রুত হাসপাতালে পৌছায়। মোমেনা খাতুনকে ফোন করে জানায়, **"খালা জনি ভাই রক্তের উপরে শুয়ে আছে। আমার ভাই আমাদেরকে ছেড়ে শহীদ হয়ে গিয়েছে।"** কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের। একমাত্র নাতিকে ধরে কাঁদতে থাকে জনির মা। লাশ বাড়ীতে এসে পৌছায়। শেষবারের মত সন্তানকে পাগলের মত ছুঁয়ে

দেখেন মোমেনা খাতুন। বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। পরবর্তীতে জানাজা শেষে শহীদের লাশ আজিমপুর কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

বারবার তার বায়নাগুলো আমার কানে ভেসে আসছে।

বড় বোনের ক্রন্দন অনুভূতি

জনি আমার আদরের ছোট ভাই ছিল। আমি বেতন পেয়েছি জানতে পারলে সারাদিন আমার পিছনে ঘুরঘুর করত। আর বলত- আপু কখন খাওয়াবি? বাইরের খাবার জনির খুব পছন্দ ছিল। জনির চলে যাওয়ার দুদিন পর আমি বেতন পেয়েছি। বারবার তার বায়নাগুলো আমার কানে ভেসে আসছে। আমার আদরের ছোট ভাইকে যারা হত্যা করেছে, তাদের যেন ফাঁসি হয়। তাদের যেন সঠিক বিচার হয়। - সাকিলা সোবাহান (খালাত বোন)

বৃদ্ধা মায়ের বিষাদময় জীবন

শহীদ মাসুদুর রহমান জনির মৃত্যুতে একমাত্র নাতীকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মোমেনা খাতুন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, হার্টের রোগে ভুগছেন। প্রতি মাসে পাঁচ-ছয় হাজার টাকার ঔষধ প্রয়োজন হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তিনি। তাই একমাত্র সন্তানই ছিল তার পথ চলার অবলম্বন। অনেক শখ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন শেষ বয়সে পুত্রবধূ ও ছেলেকে নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দে কাটবে তার জীবন। সকল স্বপ্ন ফিকে হয়েছে মোমেনা খাতুনের। বর্তমানে এক নাতীকে নিয়ে কীভাবে বাকি জীবন পার করবেন তার উত্তর হয়ত কেউ জানে না।

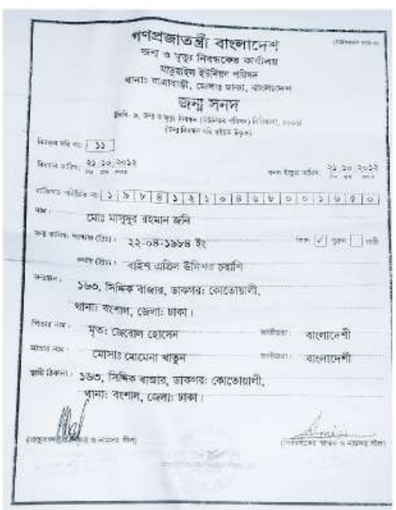

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

নাম: মোঃ মাসুদুর রহমান জনি

জন্ম তারিখ: ২২-০৪-১৯৮৪ ইং

১৬৩, সিদ্দিক বাজার, ডাকঘর: কোতোয়ালী, থানা: বংশাল, জেলা: ঢাকা।

পিতার নাম: মৃত: জেবোল হোসেন — জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোসাঃ মোমেনা খাতুন — জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: ১৬৩, সিদ্দিক বাজার, ডাকঘর: কোতোয়ালী, থানা: বংশাল, জেলা: ঢাকা।

"স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ইন্ধনে সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়েছে শহীদ জননীর। পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু আহমাদ ইসলাম মাহী বারবার লাঠি হাতে নেয়- যে লাঠি দিয়ে শেখ হাসিনাকে মারতে চায় সে। বারবার বলে-আমার আব্বাজানকে যে কবরে পাঠিয়েছে, আমি তাঁকে লাঠি দিয়ে মারব।

ঘাতকের একটি বুলেট মুহূর্তে তছনছ করে দিল মোমেনা খাতুনের স্বপ্ন । বন্ধ করে দিল মাহির অনাগত জীবনের পথচলা। বিয়োগান্ত এই শোঁক কিভাবে ভুলবে নিঃস্ব এই পরিবারটি।"

এক নজরে শহীদ মাসুদুর রহমান জনি

নাম	: মো: মাসুদুর রহমান জনি
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২২ এপ্রিল ১৯৯৪ ও (৪০)
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ০২:০০
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: আজিমপুর কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ছিপাতলি, উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম
পিতা	: জেবোল হোসেন (মৃত)
মাতা	: মোসা: মোমেনা খাতুন (গৃহিণী)
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: স্থায়ী কোনো জায়গা-জমি, বাসস্থান নেই
ভাইবোনের বিবরণ	: নেই
একমাত্র সন্তান	: আহমাদ ইসলাম মাহি, বয়স: ৫ বছর, সম্পর্ক: ছেলে

"অবিনাশী চেতনার সূর্য সন্তান শহীদ সৈকত"

শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকত

ক্রমিক : ০১৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৪

শহীদের পরিচয়

ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে চাপা উত্তেজনা। চায়ের টং দোকান গুলোতে সবার মুখে মুখে একই আলাপ। কী হবে? দেশের সকল ক্যাম্পাসগুলোতে কোটা সংস্কার-এর দাবীতে মিটিং মিছিল চলছে অবিরত। নূরজাহান রোডে বসবাসকারী সৈকতের বাবার ব্যবসাটি ছিল ঋণে জর্জরিত। ঋণগ্রস্ত বাবার মুখটার কথা মনে করে প্রায়ই আফসোস করতেন সৈকত। ছোট এই কিশোরের চেতনা জুড়ে একটি বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন। ছাত্রদের দাবি ছিল সবাই পড়ালেখা শেষ করে মেধার ভিত্তিতেই পাবে চাকরি। কিন্তু ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার কোনোভাবেই ছাত্রদের এই যৌক্তিক দাবী মেনে নিতে নারাজ। আন্দোলনের প্রথম থেকেই ছিল সৈকতের মৌন সমর্থন। সরকারী মোহম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে সৈকত। তার বাকি সহপাঠীরাও যে যার মতো সক্রিয় ছিল আন্দোলনে। রাজধানীর শাহবাগ থেকে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আন্দোলনের হাওয়া লাগে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মোহাম্মদপুরে। সেখানেই আন্দোলনে যোগ দেন শহীদ সৈকত। যার পুরো নাম মাহামুদুর রহমান সৈকত।

ঘটনাটি ১৯ জুলাই এর। সেদিন পুরো রাজধানীই ছিল উত্তপ্ত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সৈকতের পিতা জনাব মাহাবুবের রহমান তাকে ফোন করে বাসায় ফিরে আসার নির্দেশ দেন। যেন তার প্রাণপ্রিয় সোনার টুকরা সন্তানটি থাকে নিরাপদ। তাই শঙ্কিত বাবা থেকে তাগাদা আসছিল বারবার। কিন্তু সৈকত তার বাবাকে ফোনে জানান তিনি তার বন্ধুদের সাহায্য করতে যাবেন। কেননা তার সহপাঠীরা গুলিবিদ্ধ। এই কথাই যে বাবার সাথে সৈকতের শেষ কথা হবে, তা কে-ই বা জানতো!

যেভাবে শহীদ হন

সারা দেশে তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের নূর জাহান রোডে শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকত বাবার অনুপস্থিতিতে ব্যবসায় সময় দিচ্ছিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত বিবেচনা করে, সৈকতের পিতা জনাব মাহাবুবের রহমান তাকে ফোন করে বাসায় ফিরে আসার নির্দেশ দেন যেন মাহামুদুর রহমান আন্দোলনের ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদে থাকতে পারেন। কিন্তু সৈকত তার বাবাকে জানায় যে, সে তার বন্ধুদের সাহায্য করতে যাবেন, কারণ তার এক বন্ধু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মুঠোফোনে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই তার বাবার কাছে একটি মর্মান্তিক ফোনকল আসে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে জানানো হয়, "আপনার ছেলে রায়েরবাজারে পুলিশের একটি গুলিতে মাথায় আঘাত পেয়েছে। গুলি তার মাথার সামনের দিকে বিদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যায়।"

১৯ জুলাই বিকেল ৩:৩৭, নূর জাহান রোডে শহীদ সৈকত গুলিবিদ্ধ হন। আন্দোলনকারীরা তাকে দ্রুত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরে মোহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডের মাথার মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। গভীর শোক ও ব্যথার মধ্যে দিয়ে তার দাফন সম্পন্ন হয় মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডস্থ কবরস্থানে।

শহীদ সম্পর্কে শিক্ষকের কথা

"আমার ছাত্র শহীদ মাহামুদুর রহমান সৈকত (২০)। ওর শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ওর মতো নম্র, ভদ্র, মেধাবী ও সুদর্শন ছাত্র খুব কমই পেয়েছি। ওর হাসিমাখা মুখখানি বারংবার ভেসে উঠছে মানসপটে। গত শুক্রবার গোধূলির রঙে হারিয়ে গেল সৈকত চিরতরে! কি অকাল প্রয়াণ! কি হাহাকার চারিদিকে! কি বেদনার অমানিশা মরমে মরমে!! তবুও আমাদের সৈকত বেঁচে রবে মুমূর্ষু চেতনার সঞ্জীবনী রূপে, বন্ধুবাৎসল্যের প্রতীক হিসেবে ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের উপমা হয়ে ।"

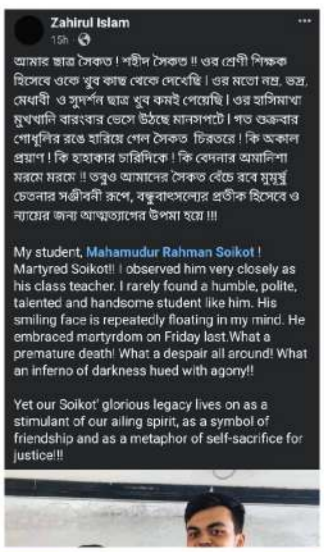

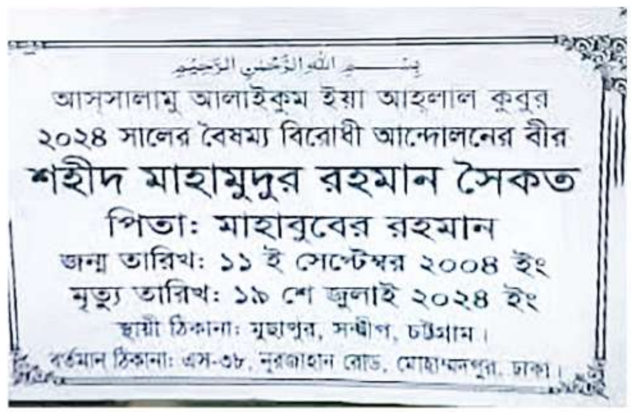

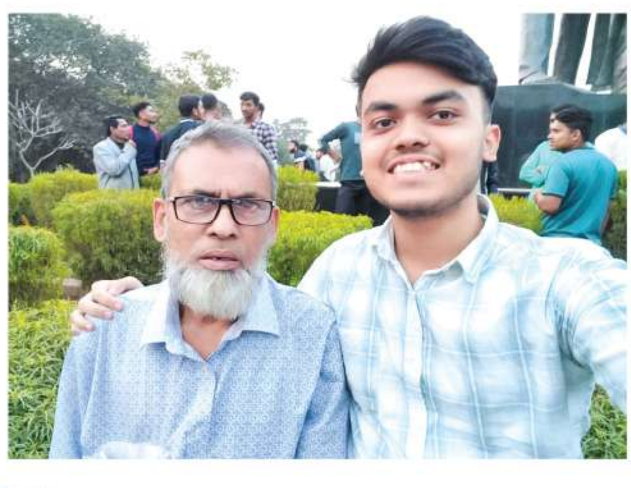

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মাহামুদুর রহমান সৈকত (২০)
পিতার নাম	: মাহাবুবের রহমান (৬৫)
পিতার পেশা	: ব্যবসা
মাসিক আয়	: ২৫০০০ টাকা
মাতার নাম	: আফরোজা রহমান (৪৫)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের জন্ম তারিখ	: ১১/০৯/২০০৪
শহীদের পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ। এইচএসসি পাশ
বোন	: ১. শাহরিনা আফরোজ (২৪), ২. সাবরিনা আফরোজ (২০)
স্থায়ী ঠিকানা	: ০১ নং ওয়ার্ড, মুসাপুর, সন্দীপ, চট্টগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
আক্রমণকারী	: রায়ের বাজার থানা পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই সময় : ৩টা ৩৭ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই বিকাল ৩টা ৪০ মিনিট, নিউরোসাইন্স হাসপাতাল
কবরস্থান	: মোহাম্মদপুর, তাজমহল রোড কবরস্থান

“মরিয়ম, আর কয়দিন অপেক্ষা করো আর আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না”

শহীদ মো: নুরু বেপারী

ক্রমিক : ০১৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৫

শহীদের পরিচয়

নদী মাতৃক জেলা বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম সরালিয়া গ্রামে ০৭ মে ১৯৭১ সালে নুরু বেপারী জন্মগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে উঠার আগেই তিনি চিরতরে তার বাবাকে হারান। তারপর থেকে অসহায় মা ও বড় ভাইয়ের কাছে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। তার মা ছিলেন খুব চৌকশ একজন নারী। ছেলেদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত হবার আশংকায় সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। বড় হয়ে নুরু বেপারী একজন ড্রাইভার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রাজধানী শহর ঢাকায় এসে কাজ শুরু করেন। শাহাদত বরণ করার পূর্বে ভাড়ায় চালিত পিকআপ চালাতেন তিনি। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। মেয়ে বিবাহিতা। একমাত্র ছেলে ইলিয়াস (৩০) এবং স্ত্রীকে নিয়ে মেন্দিবাড়ী, বাবুর বাগ, যাত্রাবাড়ী এলাকায় দীর্ঘ নয় বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন তিনি। নুরুর একমাত্র ছেলে ইলিয়াস ভাড়ায় চালিত অটো রিক্সা চালক।

আন্দোলনের দিনগুলো

২০২৪ সালের জুলাই মাস ছিল দেশের জন্য অত্যন্ত বেদনার মাস। বিশেষ করে রাজধানীবাসীর জন্য এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আতংকের। রাস্তার ফুটপাত থেকে শুরু করে বাসার ছাঁদ, বেলকনি এমনকি বেডরুমেও মানুষ নিরাপদে ছিল না। যেদিকেই মানুষ সেদিকেই স্বৈরাচারী হাসিনার হায়েনার দল গুলি ছুড়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে।

-তাড়াতাড়ি আয়, তোর বাপের শরীরে গুলি লেগেছে'

যেভাবে তিনি শহীদ হন

২০ জুলাই ২০২৪, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পালিত পুলিশ বাহিনী কর্তৃক এক বর্বরতার বলি হন মো: নুরু বেপারী। পেশায় পিকআপ চালক ছিলেন তিনি। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে রায়েরবাগ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা দিয়ে গ্যারেজের দিকে যাচ্ছিলেন। চারিদিকে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ ব্যাপক গোলাগুলি করছিল। আকস্মিক মধ্যাহ্নে ১২.৩০ টায় কয়েকটি গুলি নুরুর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। ফলে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পথচারীদের মধ্যে নুরুর বন্ধু তাহের ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। চোখের সামনে বন্ধুকে পড়ে থাকতে দেখে শহীদ নূরুর ছেলেকে ফোন করে বলেন তাড়াতাড়ি আয়, "তোর বাপের শরীরে গুলি লেগেছে"। একে একে পাঁচটি গুলি নুরুকে লক্ষ্য করে করা হয়। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ হয়ে দুপুর ১টায় তার মৃত্যু হয়। অতঃপর তার ছেলে ঘটনাস্থল থেকে লাশ বাড়ীতে নিয়ে আসে। ঘাতক পুলিশ পরিবার থেকে চিরদিনের জন্য আলাদা করে দেয় নুরু বেপারীকে। পরবর্তীতে প্রতিবেশীদের সাহায্যে লাশ মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার ইচ্ছে ছিল প্রয়াত বাবা-মায়ের পাশে যেন তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু পরিবারে আর্থিক অসঙ্গতি থাকায় তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

মা, আমাদের এখন কি হবে? আমাদের সংসার কিভাবে চলবে!

দৈন্যদশা পরিবার

শহীদ নুরু বেপারী পরিবারের একমাত্র হাল ধরার অবলম্বন ছিলেন। বর্তমানে তাকে হারিয়ে পরিবার দৈন্যদশায় পতিত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে মরিয়ম বেগম (৪৪) এখন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। শহীদ নুর বেপারী উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো আবাদি বা বসতী জমি রেখে যাননি। যে কারণে তার পরিবার গ্রামে ফিরে যাওয়ার অবস্থাও বর্তমানে নেই। শাহাদাতের কিছুদিন আগে স্ত্রীকে জানায় মরিয়ম, আর কয়দিন অপেক্ষা কর, আর আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না। স্ত্রীকে শেষ কথা বলে যেতে পারেননি নুরু। তার আগেই ঘাতক পুলিশ বাহিনী তাকে হত্যা করেছে। তার স্ত্রী একদিকে যেমন হার্টের রোগী অন্যদিকে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। পরিস্থিতি তাকে মানুষের দুয়ারে নিয়েছে। তাইতো বর্তমানে একপ্রকার বাধ্য হয়ে সামান্য ঔষধ কিনতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় শহীদ স্ত্রী মরিয়মকে। শহীদের পুত্র ইলিয়াস তার মা'কে জানায় মা, আমাদের এখন কি হবে? আমাদের সংসার কিভাবে চলবে! কে নেবে আমাদের পরিবারের দায়িত্ব? মরিয়ম জানায় আল্লাহ আছে, আল্লাহ আমাদের পাশে থাকবে।

-তিনি ভীষণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন'

প্রতিবেশীর অভিমত

হাজী মো: হজরত আলীর ভাষ্যমতে "আমার বাড়িতে ৯ বছর ধরে ভাড়া আছে নুরু বেপারীর পরিবার। তিনি ভীষণ শান্তশিষ্ট ছিলেন। অন্যান্য ড্রাইভারদের মতো তিনি ছিলেন না। তার পরিবার না খেয়ে থাকলেও, মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার ঘর ভাঁড়া দিয়েছেন তিনি। তার ভদ্রতা এবং নিষ্ঠতা দেখে আমি তাকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করেছি। তার মৃত্যুতে যেন আমি ভাই হারিয়েছি। আমার নিজের টাকা দিয়ে তার দাফনের ব্যবস্থা করেছি। আমার ভাই পরিচয়ে মাতুয়াইল কবরস্থানে তাকে নিজ হাতে দাফন করেছি। তিনি ভীষণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন। আমার পরিবারকে নিয়ে আমি কখনও বাইরে গেলে নির্দ্বিধায় তার কাছে বাড়ীর চাবি রেখে গিয়েছি। এই ভালো মানুষটির চলে যাওয়া আমার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক।"

আবু ছাইম বলেন- "নিরীহ এই মানুষটিকে কেন গুলি করা হল? কেনই বা চিরদিনের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করল ঘাতক পুলিশ বাহিনী? এর উত্তর কে দেবে। কিংবা অসহায় পরিবারটির দায়িত্বই বা এখন কে নেবে?"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ নুরু বেপারী
Name: Md. Nuru Bapery
পিতা: মৃত মজিদ বেপারী
মাতা: উরফুরী বেগম
Date of Birth: 07 May 1971
ID NO: 0116065842379

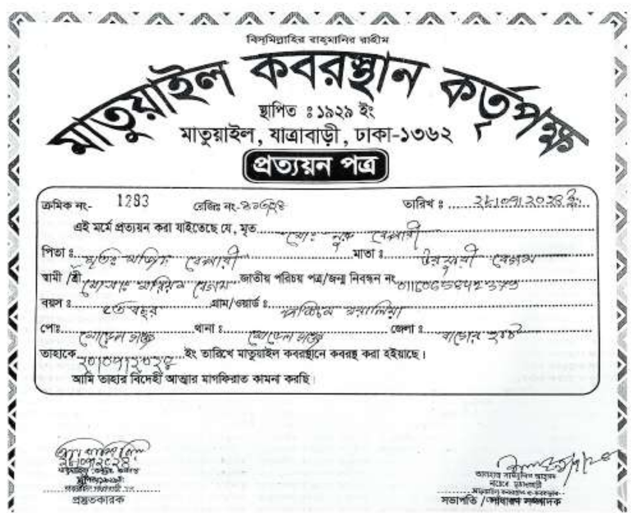

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
মাতুয়াইল কবরস্থান কর্তৃপক্ষ
স্থাপিত ঃ ১৯২৯ ইং
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
প্রত্যয়ন পত্র

ক্রমিক নং- 1283 রেজিঃ নং- তারিখ ঃ
এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত মোঃ নুরু বেপারী
পিতা ঃ মৃত মজিদ বেপারী মাতা ঃ উরফুরী বেগম
স্বামী /স্ত্রী জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং
বয়স ঃ গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ
পোঃ থানা ঃ জেলা ঃ
তাহাকে ইং তারিখে মাতুয়াইল কবরস্থানে কবরস্থ করা হইয়াছে।
আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রস্তুতকারক
সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক

আমার দোষ কি জানেন?

লেখকের সাথে শহীদ নুরু বেপারীর কাল্পনিক আলাপন

আমাকে চিনতে পারছেন? আমিও ছিলাম আপনাদের দলে, আমার নাম ছিল নুরু বেপারী। আমাকে স্বৈরাচারী শাসক খুনি হাসিনার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী রক্তাক্ত করে হত্যা করেছে। আমার স্ত্রীকে বিধবা করেছে। সন্তানদেরকে চিরদিনের জন্য এতিম করেছে! আমার দোষ কি জানেন? আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক ছিলাম। আমিও আওয়াজ তুলেছিলাম,"স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক"। স্ত্রীকে বলেছিলাম, আমি দেশের জন্য ঢাল হয়ে লড়ব। আমিও সেজদায় রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছিলাম। পরিবারের মুখে দু-মুঠো খাবার তুলে দিতে রাস্তায় বের হয়েছিলাম আমি। পুলিশ আমাকে থামতে বলেছিল, আমি বলেছিলাম কী দোষ আমার? প্রাণ নিতে চাও? নাও, আমি বুক পেতে দিলাম। গুলি কর। আমি শহীদ হয়ে যাব। সেদিন আমি জামার বোতাম খুলে দিয়েছিলাম সন্ত্রাসীদের সামনে। বুক টানটান করে

দাড়িয়ে স্বাধীন দেশের মুক্তি কামনায় স্লোগান দিয়েছিলাম- দফা এক দাবী এক, খুনি হাসিনার পদত্যাগ। আমার দেশ আজ মুক্তি পেয়েছে। আমার দেশের ঠিকানা জানেন-

"আমার দেশের ঠিকানা বন্ধু পাবে
ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর গানে
আরো পাবে ভালোবাসা ছড়িয়ে
পাপড়ি মেলেছে ঐ শাপলা শালুক যেখানে"

মহান আল্লাহ আপনাকে জান্নাত নসিব করুন, আপনার ত্যাগ কখনও বাংলাদেশ ভুলবে না। হে বীর যোদ্ধা আপনাকে স্যালুট।

এক নজরে শহীদ নুরু বেপারী

নাম	: মো: নুরু বেপারী
পিতার নাম	: মৃত মজিদ বেপারী
মাতার নাম	: উরফুরী বেগম
পেশা	: পিকআপ চালক (বেসরকারি)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম সরালিয়া, উপজেলা: মোড়েলগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর
মৃত্যুর তারিখ	: ২০/০৭/২০২৪
কিভাবে মারা যায়	: পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ী ঘটনাস্থলে মৃত্যু বরণ করেন
কবরস্থান	: মাতুয়াইল কবরস্থান, ঢাকা
জন্মতারিখ	: ০৭/০৫/১৯৭১
বয়স	: ৫৩ বছর
সন্তানদের পরিচয়	: ১. মো: ইলিয়াস (৩০), পেশা: রিক্সা চালক, সম্পর্ক: ছেলে
	২. মোছা: নুসরাত জাহান সোনিয়া (২৪), বিবাহিতা সম্পর্ক: মেয়ে
প্রস্তাবনা	: ১. বসবাসযোগ্য স্থায়ী পুনর্বাসন প্রয়োজন
	: ২. শহীদের একমাত্র ছেলেকে স্থায়ী কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে
	: ৩. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক অথবা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
তথ্য সংগ্রহের তারিখ	: ১৬-০৮-২০২৪

"জান্নাত বলতে এমন স্থানকে বোঝায়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত ও প্রিয় বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"

শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ

ক্রমিক : ০১৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৬

শহীদের পরিচয়

শহীদের মা বলেন,"আমার ছেলেকে কোনো কাজের জন্য একবারের বেশি দুইবার বলতে হয়নি। মসজিদে মসজিদে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছাতে আমার ছেলে ছিল সদা তৎপর। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের জন্য ছিলো তাহাজ্জুদ গুজার। সদা কর্মচঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল দায়ী'র প্রতিচ্ছবি ছিল শুভ'র চলা ফেরায়।"

শহীদের খালাত ভাই সোয়াদ বলেন,"হে প্রভু! মিনতিটুকু রেখো, মর্যাদা দিও চির জান্নাতে, রিযিক দিও বে-হিসেবে, তাওফীক দিও ভাইয়ার রেখে যাওয়া কাজের আঞ্জাম দেয়ার। শহীদের মায়ের আকুতি দেখে মনে হয়-তার ছেলে দেশের জন্যই শহীদ হয়েছে।"

জন্ম ও পারিবারিক বর্ণনা

শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ ১৯৯৬ সালের ৭ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রীর যোগালি ছিলেন। তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত। মা একটি বেসরকারী টেলিভিশন কোম্পানিতে আয়া পদে চাকরি করেন। তিনি স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে গাজীপুরের টঙ্গিতে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। শহীদের আদি নিবাস বরিশালের প্রত্যন্ত একটি চর এলাকায় ছিল। নদী ভাঙ্গনে সকল জায়গা-জমি বিলীন হয়েছে। তার বাবা-মা যাত্রবাড়ির মাতুয়াইলে থাকেন। তাদের বাসা ভাড়া এবং সংসারের অর্ধেক খরচ তিনি বহন করতেন। তার মৃত্যুতে দুটি পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। স্ত্রী বর্তমানে দিনাজপুর তার মায়ের কাছে অবস্থান করছেন।

নিজেকে পরিবর্তনের মাপকাঠি হিসেবে মসজিদকেই বেঁছে নেন শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ।

ধর্মীয় একনিষ্ঠতা

পরিবারে অভাব অনটন দেখে বড় হয়েছে শুভ। পারিবারিক দীনতায় লেখাপড়া করা হয়নি। পৈতৃক জায়গা জমি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হওয়ার পর বাবা মায়ের সাথে ঢাকার ডেমরা আসেন তিনি। সেখানে স্থানীয় তাবলীগ জামাতের সাথে পরিচয় হয় তার। ধর্মীয় দীক্ষা নিতে ৪০ দিনের জন্য চিল্লায় যায় শহীদ জহরুল ইসলাম শুভ। মসজিদে-মসজিদে দ্বীনের আলাপন থেকে ধর্মীয় জ্ঞান, কোরআন শিক্ষা লাভ করেন। নিয়মিত হাদিসের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা শুনে ধীরে ধীরে ধর্মীয় কাজে আসক্ত হয়ে পড়েন। চিল্লা থেকে এসে পরিবারের মাঝে দ্বীনকে জাগ্রত করতে যা শিখে এসেছেন সেগুলো আলোচনা করেন। একমাত্র বোন ও মায়ের শিয়রে বসে বোরখা পড়তে অনুরোধ করেন। নিজের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করেন তিনি। আজান শোনার সাথে-সাথে অন্তরে এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হয়ে যেত তার। অতঃপর নিয়মিত মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে ধর্মীয় শিক্ষার ঘাটতি কমাতে নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ধর্মীয় একনিষ্ঠতায় বুদ হয়ে নিজেকে পরিবর্তনের মাপকাঠি হিসেবে মসজিদকেই বেঁছে নেন শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ।

বেড়ে ওঠা জীবন

জীবনের উষালগ্ন থেকে শহীদ পরিবারে বুভুক্ষু যেন মিত্র হয়ে উঠেছিল। মিত্রতাকে শত্রু করতে উঠেপড়ে লাগে শুভ। রাজধানীতে এসে রিকশা চালিয়ে পারিবারের হাল ধরেন তার বাবা। আকস্মিক অসুস্থতা হানা দেয় জনাব সিরাজুল ইসলামের। বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেন তিনি। চিকিৎসা চলে ঢাকা মেডিকেলে। পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার পর জানা যায় যে, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। পরিবারে নেমে আসে চরম দুশ্চিন্তা। কদিনেই জমানো টাকা ফুরিয়ে যায়। চিকিৎসার খরচ চালাতে না পেরে বাসায় ফিরে আসেন শহীদের পিতা। অভাবের তাড়নায় না খেয়ে চলে দিনের অগ্রভাগ ও শেষভাগ। কোনো ফিরিস্তির অবকাশ নেই।

-নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি”

শুরু হয় নতুন যুদ্ধ

পরিবারের হাল ধরতে চাকরি খোঁজে শুভ। দোকানে-দোকানে কাজের জন্য অনুরোধ জানায়। কোনো কাজ না পেয়ে বিভিন্ন অফিসের দারস্ত হন তিনি। সেখানেও মেলেনা কোনো কাজ। একপর্যায়ে নিরাশ হয়ে পড়েন। মনে পড়ে সে আয়াতের কথা-নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি-সুরা ইনশিরাহ। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেন রাজমিস্ত্রীর কাজ করবেন। স্থানীয় এক প্রতিবেশী চাচার সাহায্যে ডেমরা থেকে টঙ্গী গাজিপুর আসেন। সেখানে রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী (যোগালি) হিসেবে কাজ শুরু করেন। বাড়তি উপার্জনের আশায় সংসারের হাল ধরতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় কাজ করেন শুভ। উপার্জনের টাকা নিয়মিত বাসায় পাঠালে বাবার চিকিৎসা শুরু হয়। ছেলের টাকা হাতে পেয়ে কয়েক মাসের বাকি থাকা বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করেন নাজমা বেগম। ছুটির দিনও যেন ক্ষান্ত হন না শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পরিবারের মুখে ফেরান অনাবিল হাসি। নিজের একমাত্র বোনকে সুপাত্র পেয়ে বিয়ে দিতে দেরী করেন না শুভ। বিবাহের পুরো আয়োজন সম্পন্ন হয় শহীদের উপার্জন থেকে। পরিবারের সুখ দেখে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সন্তুষ্টি অর্জন করেন শুভ। নিয়মিত তাহাজ্জদ নামাজ আদায় করে মহান রবের দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন তিনি।

বৈবাহিক জীবনে পদার্পণ

বোনের বিয়ে সম্পন্ন হলে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলেন শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ। মায়ের পিড়াপিড়িতে নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিবেশীদের সাহায্যে দিনাজপুর জেলায় মোছা: আম্বিয়া আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। সংসার জীবন শুরু হয় টঙ্গী শহরের দোচালা একটি ভাড়া বাড়িতে। কিছুদিন পর সংসার আলোকিত করে জন্ম নেয় একমাত্র ছেলে আরিয়ান ইসলাম আয়াত (৬)। সংসারের খরচ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। ফলে শুভ'র মা নাজমা বেগম এখন টেলিভিশন কোম্পানিতে আয়া পদে ৯০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এদিকে ক্রমেই ক্যান্সার ব্যাধি বাড়তে থাকে জনাব সিরাজুল ইসলামের। ঔষধ খরচও বেড়ে যায়। কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভ।

আন্দোলনের হাঁকডাক

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস ছিল বর্বরতার মাস। আওয়ামী সন্ত্রাসী ও তাদের পেটুয়া বাহিনী একযোগে সারাদেশে গণহত্যা চালায়। ঘটনার শুরু হয় কোটা আন্দোলন দিয়ে। এরপর তৎকালীন স্বৈরাচার শাসক শেখ হাসিনার উস্কানি মূলক বক্তব্যে সারা দেশের জনতা এক হয়ে বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে পদত্যাগ করে পলায়ন করে খুনি হাসিনা।

শাহাদাতের সবুজ ফুল

শাহাদাতের তামান্না নিয়ে কাজ করে প্রতিটি মুমিন মুসলমান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন না। একটি সাজানো বাগান থেকে প্রস্ফুটিত ফুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি অত্যন্ত যত্নের সাথে ছিঁড়ে নেন বাগানের মালিক। ঠিক

তেমনি আল্লাহ তাআলাও তাঁর অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে প্রিয়তম বান্দাটিকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে তাঁর নিকট তুলে নেন। আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন।" যারাই আল্লাহর পথে শহীদ হন, এর পূর্বে তাদের কর্মতৎপরতা, চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ও উন্নত আমল আখলাকই থাকে অন্যরকম। শহীদ মো: জহিরুল ইসলাম শুভ'র জীবন শাহাদাতের পূর্বে ঠিক তেমনটিই ছিল।

শাহাদতের তৃষিত অন্তর যেন তৃষ্ণা নিবারণ করে নেয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলায় তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসক খুনি শেখ হাসিনাকে আগে থেকেই অপছন্দ করতেন শহীদ মো: জহিরুল ইসলাম শুভ। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। মুহূর্তে এই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ জুড়ে বিজয় মিছিলে করে হাজার-হাজার জনতা। খবর পেয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজকে বিরতি দিয়ে আন্দোলনে শামিল হন শহীদি তামান্নার টগবগে এই যুবক। **"আল্লাহু আকবর ধনীতে মুখরিত করে তোলেন উত্তরার ০৩ নং সেক্টর।"** চারিদিকে তখনও অবিরত গুলি বর্ষণ চলছিল। উত্তরার বিএনএস সেন্টার সহ সারাদেশে একযোগে পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যায় মেতেছিল খুনি হাসিনার পালিত পুলিশ বাহিনী।

সেদিন ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকেল ৪.৩০। সরকার পতনের বিজয় মিছিল চলে পুরো উত্তরা জুড়ে। হঠাৎ ঘাতক পুলিশের ছোড়া একটি গুলি শুভর মাথায় এসে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে যায় তার চোখ। ঝাপসা চোখে ক্ষতস্থান চেপে ধরেন। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দ্রুত ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মহান রবকে ডাকতে থাকেন তার প্রিয় বান্দা। বিকাল ৪.৪৫ এর দিকে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। মুখে উচ্চারিত হতে থাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

শাহাদতের তৃষিত অন্তর যেন তৃষ্ণা নিবারণ করে নেয়। মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে পাড়ি জমান তিনি। লাশ বাড়িতে এসে পোঁছায়। সন্তানের লাশ দেখে অথর্ব হয়ে পড়ে নাজমা বেগম ও সিরাজুল ইসলাম। শহীদের স্ত্রী আম্বিয়া বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার মাথায় পানি ঢালা হয়। প্রিয় বান্দাকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পোঁছাতে জনাজা দেয়া হয়। জানাজা শেষে মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ জহিরুল ইসলাম শুভকে। নিশ্চয় শহীদরা জীবিত। আর তাদের জন্য রয়েছে চির জান্নাত।

জান্নাতের পরিচয়

'জান্নাত বলতে এমন স্থানকে বোঝায়, যা আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা দিগন্ত বিস্তৃত নানা রকম ফুলে-ফলে সুশোভিত সুরম্য অট্টালিকা সংবলিত মনোমুগ্ধকর বাগান; যার পাশ দিয়ে প্রবহমান বিভিন্ন ধরনের নদী-নালা ও ঝরনাধারা। যেখানে চির বসন্ত বিরাজমান। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (এমন নিয়ামত) প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, এমনকি কোনো মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।' (সহিহ বুখারি)"

নিকটাত্মীয়'র অভিমত

শহীদের খালাত ভাই সোয়াদ বলেন-"ভাইয়া সবসময় নামজের কথা বলতেন। বাবা-মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলতেন। সবসময় আমাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করতেন। ভাইয়ার চলে যাওয়া আমার জন্য অনেক বেদনার। আমি আমার ভাইয়া হত্যার বিচার চাই।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পরিচয়পত্র

জহিরুল ইসলাম শুভ

Name

JAHERUL ISLAM SHUVO

সিরাজুল ইসলাম

নাজমা বেগম

Date of Birth 07 Aug 1996

NID No. 194 149 7180

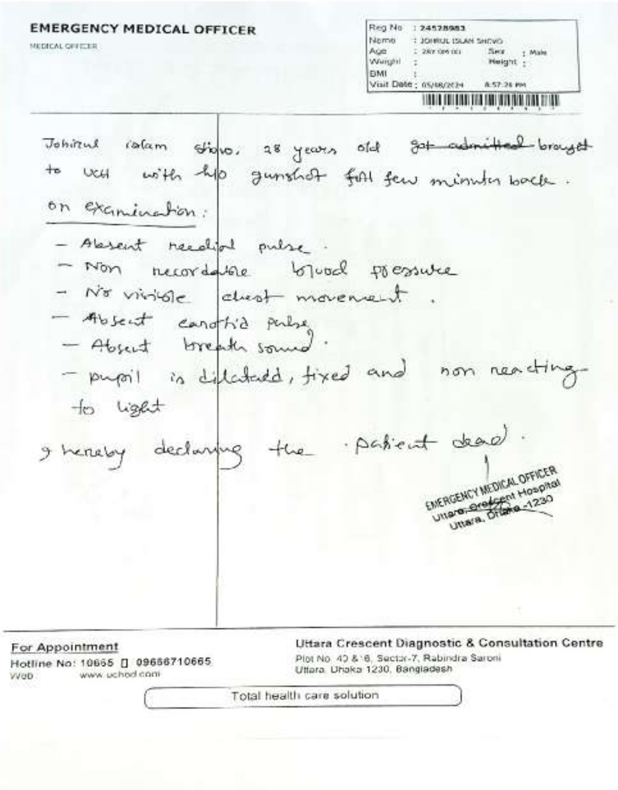

EMERGENCY MEDICAL OFFICER

MEDICAL OFFICER

Reg No : 24528983
Name : JOHIRUL ISLAM SHOVO
Age : 28Y 0M 0D Sex : Male
Weight : Height :
BMI :
Visit Date : 05/08/2024 8:57:26 PM

Johirul islam shovo, 28 years old ~~got admitted~~ brought to UCH with h/o gunshot fall few minutes back.

On examination:

- Absent radial pulse.
- Non recordable blood pressure
- No visible chest movement.
- Absent carotid pulse
- Absent breath sound.
- pupil is dilated, fixed and non reacting to light

I hereby declaring the patient dead.

EMERGENCY MEDICAL OFFICER
Uttara Crescent Hospital
Uttara, Dhaka-1230

For Appointment
Hotline No: 10665 | 09666710665
Web www.uchcd.com

Uttara Crescent Diagnostic & Consultation Centre
Plot No. 40 & 16, Sector-7, Rabindra Saroni
Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh

Total health care solution

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাতুয়াইল কবরস্থান কর্তৃপক্ষ

স্থাপিত : ১৯২৯ ইং

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২

প্রত্যয়ন পত্র

ক্রমিক নং- 1299 রেজিঃ নং- ৪৪৬/২৫ তারিখ : ২০/০৬/২০২৪

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত জহিরুল ইসলাম শুভ

পিতা : সিরাজুল ইসলাম মাতা : নাজমা বেগম

স্বামী/স্ত্রী: মোসাম্মৎ আম্বিয়া খাতুন জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং

বয়স : ২৮ বছর গ্রাম/ওয়ার্ড : মাতুয়াইল উত্তর পাড়া

পোঃ মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী থানা : যাত্রাবাড়ী জেলা : ঢাকা

তাহাকে ০৬/০৮/২০২৪ ইং তারিখে মাতুয়াইল কবরস্থানে কবরস্থ করা হইয়াছে।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রত্যয়নকারক

সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক

এক নজরে জহিরুল ইসলাম শুভ

নাম	: মো: জহিরুল ইসলাম শুভ
পেশা	: রাজমিস্ত্রির যোগালি ছিলেন
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৭ আগস্ট ১৯৯৬, ২৮ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকাল ০৪.৩০
শাহাদাত বরণের স্থান	: উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: মাতুয়াইল কবরস্থান, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাতুয়াইল উত্তর পাড়া জেলা: ঢাকা
পিতা	: সিরাজুল ইসলাম
মাতা	: নাজমা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোনো সম্পদ নেই
ভাইবোনে ও সন্তানের বিবরণ	: একমাত্র বোন মর্জিনা আক্তার বীথি (বিবাহিতা) ও একমাত্র সন্তান আরিয়ান ইসলাম আয়াত (ছেলে)
স্ত্রী	: আম্বিয়া আক্তার
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদ সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে
	: ২. শহীদের বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তার চিকিৎসা বাবদ সহোযগিতা করা যেতে পারে
	: ৩. শহীদ পত্নীকে মাসিক বা এককালীন সহোযগিতা করা যেতে পারে

"আমারে একটু তাঁর কাছে নিয়া চল, আমি জানতে চাই, আমার পোলারে কেন গুলি করছে, কেন আমার পোলারে হত্যা করা হল? আমারে কেউ জবাব দে? আমার হাফেজ পোলা। দুপুরেও আমার ঘরে ভাত খায়ছে। আমার পোলার জীবন ফেরত দে। ঐ হাসিনা আমার পোলারে মারছে, আমার বুক খালি করে দিছে, একদিন হের বুকও খালি হইব।"

শহীদ দীন ইসলাম বেপারী

ক্রমিক : ০১৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৭

শহীদের পরিচয়

হাফেজ দীন ইসলাম বেপারী। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় ২০০২ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত ভদ্র, মিশুক এবং মেধাবী ছিলেন। সন্তানের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জনাব শাহ আলম সন্তানকে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। মেধাবী হওয়ায় দ্রুত মাদ্রাসা শিক্ষায় সফলতা অর্জন করেন তিনি। কৃতিত্ত্বের সাথে পবিত্র কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণ মুখস্ত সম্পন্ন করেন। পরিবারের প্রথম সন্তান হাফেজে কুরআন এজন্য দীন ইসলামকে সকলে বাড়তি আদর করতেন। পৈতৃক বাড়ী চাঁদপুর হলেও গত পঁচিশ বছর স্ব-পরিবারে যাত্রাবাড়ী এলাকায় বসবাস করে আসছেন শহীদ দীন ইসলামের পরিবার। তার বাবা একজন চা-দোকানদার। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার সংলগ্ন মোড়ে তাদের একটি চায়ের দোকান রয়েছে। দোকানটি ভাড়ায় চালিত। শহীদের গ্রামের বাড়িতে আবাদি কোনো জমি নেই। তবে এক রুমের জীর্ণশীর্ণ একটি ঘর রয়েছে। যেখানে হাফেজে কোরআনের দাদী বসবাস করেন। বাড়িটি বাঁশ ও টিনের বেড়া দিয়ে তৈরী।

তবুও জীবন চলছে

জনাব শাহ আলম শারীরিকভাবে অসুস্থ। চা-ব্যবসার পূর্বে মেশিনের সাহায্যে তিনি আখ মাড়ানোর কাজ করতেন। হঠাৎ একদিন মেশিন চলাকালীন শার্টের হাতা হেঁচকা টান লেগে মর্মান্তিক জখম হন তিনি। মেশিনের মধ্যে তার পুরো শরীর আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে যায়। পরবর্তীতে আশেপাশের মানুষ তাকে উদ্ধার করেন। প্রাণে বাঁচলেও চিরদিনের জন্য তিনি পঙ্গু হয়ে যান। ছয় মাস ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি থাকার পর তার শরীরে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়। বর্তমানে তার শরীরের বাম পাশ পঙ্গু হয়ে আছে। পাঁচ কেজির বেশি ওজন তুলতে পারেন না তিনি।

-দুনিয়াতে সবই পাবে কিন্তু ভাইয়ের ভালোবাসা আর পাবে না।

সামিউল ইসলাম শহীদ দীন ইসলামের একমাত্র ছোট ভাই। যাকে তিনি প্রচন্ড ভালোবাসতেন। সবসময় আলাদা করে তাকে আগলে রাখতেন। কখনও ছোট ভাইয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না তিনি। বর্তমানে সামিউল সবুজ বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে কলেজে ভর্তির দ্বারপ্রান্তে আছে।

স্বৈরাচার নিপাত যাক বাংলাদেশ মুক্তি পাক

আন্দোলনের জবানবন্দি

সারাদেশে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন নিশ্চিত করতে একদফা দাবি ওঠে। প্রথমত কোটা সংস্কার দাবিকে কেন্দ্র করেই এই আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে হাসিনা সরকার ছাত্রদের রাজাকার বলে উস্কানি দেয়। ফলে ছাত্র-জনতা উপহাসের শিকার হয়ে আরও বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ঢাকাসহ সারাদেশে শেখ হাসিনার পদত্যাগে একদফা দাবি তোলেন তারা। ০৫ আগস্ট ২০২৪ গণভবন ঘেরাও কর্মসূচী দেয় বৈষম্যবিরোধী সমন্বয়কবৃন্দ। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ্য জনতা রাজপথে নেমে আসে। ছাত্র জনতার দাবী নস্যাৎ করতে সারাদেশে আওয়ামী সন্ত্রাস বাহিনী গুম, নির্যাতন, ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। যার সরাসরি মদতদাতা ছিল তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা। তার নির্দেশে ছাত্রদের উপর ঘাতক পুলিশ বাহিনী অগণিত টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছররা গুলি এবং স্নাইপার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। চারিদিকে অসংখ্য ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ শাহাদাত বরণ করেন। তারপর আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি খুনি হাসিনা। ছাত্র-জনতা গনভবনে পৌঁছানোর পূর্বে সরকার থেকে পদত্যাগ করেনসে। জনতার রোষানলে পড়ে হেলিকপ্টার যোগে সুদূর ভারতে পলায়ন করে।

বিজয় যখন বেদনার

সারাদেশে বিজয় মিছিল আরম্ভ হয়। সে মিছিল দেখতে ছোট ভাই সামিউলকে (১৭) নিয়ে যাত্রাবাড়ীর ফ্লাইওভার সংলগ্নে মিলিত হয় হাফেজ দীন ইসলাম। সরকার পদত্যাগ করার পরও হাসিনার পালিত পুলিশ বাহিনী ব্যাপক গুলি ছুড়তে থাকে। চারিদিকে লাশের স্তুপ পড়ে যায়। পুলিশকে সরাসরি গুলি করতে দেখে দুই ভাই প্রচন্ড ভয় পায়। তারা সেখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করেন। ফ্লাইওভারের খুঁটির পিছনে আশ্রয় নেন তারা। সময়-দুপুর ৩.৩০, সামিউল লুকাতে পারলেও দীন ইসলাম পুলিশের সামনে পড়ে যায়। তাঁকে দেখতে পেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে পুলিশ সদস্যরা। তার বাম হাত এবং ডান পায়ে পুলিশ গুলি চালায়। এলোপাথাড়ি সেই গুলিতে হাফেজ দীন ইসলাম ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। সন্তানের মৃত্যু সংবাদ শুনে চিৎকার করে ওঠেন শিল্পী আক্তার। বারবার বলতে থাকেন,"আমারে একটু তার কাছে নিয়ে চল, আমি জানতে চাই, আমার পোলারে কেন গুলি করছে, কেন আমার পোলারে হত্যা করা হল। আমারে কেউ জবাব দে? আমার হাফেজ পোলা। দুপুরেও আমার ঘরে ভাত খায়ছে। আমার পোলার জীবন ফেরত দে। ঐ হাসিনা আমার পোলারে মারছে, আমার বুক খালি করছে, একদিন হের বুকও খালি হইব।"

অবশেষে হাফেজে কোরআন শহীদ দীন ইসলাম বেপারীর লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নেয়া হয়। ঠেটালিয়া মাঠ প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে জানাজা সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধা দাদী বারবার জনাতে চায়- ও শাহ আলম, আমার দীনরে তুই কোথায় নিয়ে যাবি।"

পৃথিবীতে সবচাইতে ভারী বোঝা হচ্ছে পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ! জগতে সন্তান হারাবার চাইতে বড় কষ্ট আর হতে পারে না। মৃত্যু জগতের সবচাইতে নিশ্চিত ব্যাপার। মৃত্যু আসবেই। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবেই এটা জগতের অবধারিত নিয়ম! সন্তানকে কাঁধে তুলে নেয় পঙ্গু বাবা। দোকানের কেটলি তুলতে যার হাত

কাঁপে, সে আজ খাটিয়া উঁচু করে ধরেছে। সন্তানকে বয়ে নেয়ার সময় অঝোরে কাঁদেন শহীদ পিতা। ছেলের হাসি-মুখ কল্পনা করে আবারও রওনা করেন কবরস্থানের দিকে। কাঁধ থকে খাটিয়া নামিয়ে রাখেন শহীদের কবরের পাশে। পরবর্তীতে গ্রামের বাড়ী চাঁদপুর ঠেটালিয়া কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হয় হাফেজে কোরআন শহীদ দীন ইসলাম বেপারী।

অমায়িক ব্যবহার যার মুখে আছে,
পৃথিবীও ঋণী হয় ঠিক তার কাছে

দিশেহারা পরিবার

শহীদের হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। তার বাবা কাঁদতে কাঁদতে জানায়, "আমি প্যারালাইসিস পঙ্গু মানুষ, কিভাবে এই সংসার চালাব? কিভাবে এই শোক ভুলে যাব? পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন শহীদ দীন ইসলাম বেপারী। তার মৃত্যুতে চায়ের দোকানটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর এই দোকানটিই পরিবারের একমাত্র রুটিরুজির জায়গা।"

শহীদের মামী বলেন-

"আমি দীন ইসলামকে যখন দেখি তার বয়স ছিল দশ বছর। সদা হাসিমুখে থাকত ছেলেটি। আমি উচ্চস্বরে কথা বললে আমাকে নিষেধ করত। বলত- মামি, আপনি আস্তে কথা বলবেন। আল্লাহ আস্তে কথা পছন্দ করেন। ছোটদেরকে খুব আদর করত দীন। ওর কাছে এক টাকা থাকলেও ছোটদেরকে চকলেট কিনে দিত। দ্বীন ইসলাম যে নেই, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।"

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: দীন ইসলাম বেপারী
পেশা	ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০২ মে ২০০২, ২২ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক দুপুর ৩.৪৫ টায়
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার
দাফন করা হয়	: মধ্য ঠেটালিয়া কবরস্থান, এনায়েত নগর, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মধ্য ঠেটালিয়া, ইউনিয়ন: এনায়েত নগর, থানা: মতলব, জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: শাহ আলম বেপারী, পেশা: চা-দোকানদার, বয়স: ৪৪, (পঙ্গু)
মাতা	: শিল্পী আক্তার, পেশা: গৃহিণী বয়স: ৩৯
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: স্বল্প পরিসরে বসতি জমি রয়েছে
ভাইবোনের বিবরণ	: সামিউল ইসলাম, বয়স: ১৭, সবুজ বিদ্যাপীঠ স্কুল এন্ড কলেজ

প্রস্তাবনা

১. শহীদের একমাত্র ছোট ভাই সামিউলের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।

২. তার বাবাকে প্রতিবন্ধী ভাতা দেয়া যেতে পারে।

৩. পরিবারের একমাত্র অবলম্বন চায়ের দোকানটি বড় পরিসরে করে দেয়া যেতে পারে।

শহীদ মো: মমিনুল ইসলাম রিদয়

ক্রমিক : ০১৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৮

শহীদের পরিচয়

পিতা মো: সাইফুল ইসলাম বিপ্লব ভাগ্য অন্বেষণে লক্ষ্মীপুর ছেড়ে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে। একটি স্বচ্ছল সুখী সংসার জীবনযাপন করে কায়ক্লেশে দিন যাচ্ছিল তার। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জনাব সাইফুল ইসলাম ঢাকা শহরে ভ্যান গাড়িতে করে সবজি বিক্রি করতেন।

সাইফুল ও মরিয়ম বেগম দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন শহীদ মমিনুল ইসলাম রিদয়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের ১১ তারিখে লক্ষ্মীপুরেই জন্ম হয় রিদয়ের।

বাবার মাসিক ৩০০০০ টাকার উপার্জনে ২৭ নম্বর রোডের ব্লক ডির ১/১ নং বাসায় ভাড়া থাকতো পরিবারটি। রিদয় বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজে ডিগ্রিতে পড়ালেখা করতেন। দ্রুত পড়ালেখা শেষ করে সংসারের হাল ধরতে চান দিয়ে। দুইবোন আর বাবা মাকে নিয়ে ভালোই কাটছিল হৃদয়ের দিনগুলো। কিন্তু জুলাই মাসে গোটা দেশ অস্থির হয়ে উঠে। বেআইনি, অনির্বাচিত জুলুমবাজ আওয়ামী সরকার তখন ক্ষমতায়। লাঠির জোরে তারা যে কোনো যৌক্তিক কথাকে স্তব্ধ করে দিতে বেশ পটু। দীর্ঘ ১৫ বছরে তারা একটি গুন্ডাতন্ত্র তৈরি করে তুলেছিল। তাদের চাঁদাবাজ, দখলদারী, প্রভাব বিস্তারে যারপরনাই বিরক্ত বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ।

কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। মিরপুরে তখন সকল স্কুল কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের অভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। শহীদ মমিনুল ইসলাম রিদয় ছিলেন মিরপুরের একজন সক্রিয় আন্দোলনকারী। বাবা মায়ের একমাত্র আশার প্রদীপ ছিলো রিদয়। কিন্তু আশার প্রদীপটি হঠাৎ নিভে যায় পুলিশ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ক্যাডার বাহিনীর আক্রমণে। তার আদরের দুই বোন রিয়া ও রিপা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয় বড় ভাইয়ের আদর ও স্নেহ থেকে। মুহূর্তেই যেন লন্ডভন্ড হয়ে যায় একটি সাজানো গোছানো পরিবার।

NATIONAL UNIVERSITY
Gazipur 1704, Bangladesh
Bachelor Degree (Pass)
Registration Card

Registration No: 2 1 1 0 2 8 6 9 4 5 2 Academic Session: 2021

Student's Name	MOMINUL ISLAM HRIDOY
Father's Name	SAIFUL ISLAM BIPLOB
Mother's Name	MORIOM BEGUM MONI
College Code	[illegible]
College Name	GOVT. BANGA BANDHU COLLEGE
Status	Private
Course Name & Code	B. S. S. (PASS) : 02

Student's Full Signature | Seal and Signature of Principal | Signature of Registrar

REGISTRAR
23.08.2022 10:37

National University
Gazipur- 1704

Student's Name	MOMINUL ISLAM HRIDOY
Father's Name	SAIFUL ISLAM BIPLOB
Registration Type	PRIVATE
College Code & Name	GOVT. BANGABANDHU COLLEGE
Course Code & Name	B. S. S.

Signature & Date of Receiver

শহর জুড়ে উত্তাল বিক্ষোভের দিনগুলোতে রিদয়কে দেখা যেত আঙুল উঁচিয়ে বুক চিতিয়ে শ্লোগান দিতে-

কোটা না মেধা
মেধা মেধা!

দালালী না রাজপথ
রাজপথ রাজপথ!

এই রাজপথে সূর্য সন্তান ছিলেন শহীদ রিদয়।

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলাবস্থায় মমিনুল ইসলাম রিদয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তার অবস্থান ছিল মিরপুর ১০ নাম্বার ফায়ার সার্ভিসের পাশে।

সকাল ১১ টা থেকে স্বৈরাচারী পুলিশ বাহিনী সাধারণ ছাত্রদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশ বাহিনীর সাথে যুক্ত হয় যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। মিরপুর মূল সড়ক থেকে ছাত্রদের সরাতে উভয় ঘাতক বাহিনী টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে। ৫ টা ৩০ মিনিটের সময় মমিনুল ইসলাম পিঠে গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। ছাত্ররা ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আল হেলাল ও পরে সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মমিনুল ইসলাম রিদয়কে মৃত ঘোষণা করেন।

মিরপুরে জানাজা শেষে কালশি কবরস্থানে শহীদের লাশ দাফন করা হয়।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: মমিনুল ইসলাম রিদয়
পেশা	: ছাত্র, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ (ডিগ্রী)
জন্ম তারিখ	: ১১ নভেম্বর ১৯৯৯
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকাল ৫.৪৫
শাহাদাত বরণের স্থান	: মিরপুর-১০, ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন
স্থায়ী ঠিকানা	: লক্ষ্মীপুর
পিতা	: মো: সাইফুল ইসলাম বিপ্লব
মাতা	: মোছা: মরিয়ম বেগম
প্রস্তাবনা	: শহীদের পিতাকে মাসিক বা এককালিন আর্থিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মো: মমিনুল ইসলাম রিদয়
Name: MD. MOMINUL ISLAM HRIDOY
পিতা: মো: সাইফুল ইসলাম বিপ্লব
মাতা: মোছা: মরিয়ম বেগম
Date of Birth: 11 Nov 1999
ID NO: 7807404723

“দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা দুরন্ত এক তরুণের পরিচয়”

শহীদ মোঃ নাঈম

ক্রমিক : ০১৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০১৯

শহীদের পরিচয়

মোঃ নাঈম একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। বড় হয়ে উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। হয়তো কল্পনার জগতে ডুবে যেতেন আর ভাবতেন, "আমার সমস্ত চেতনা যদি শব্দে শব্দে তুলে ধরতে পারতাম। "

শহীদ নাঈম বাবা মায়ের আদরের ছোট সন্তান ছিলেন। জন্ম ১৩ জানুয়ারি, ২০০৭। গ্রামের বাড়ী ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলার রানাপাশা গ্রামে। তবে তার জন্ম রাজধানী শহর ঢাকায় এবং বেড়ে ওঠা নারায়নগঞ্জ জেলায়। তার বাবা জনাব কামরুল ইসলাম দুই ছেলেকে নিয়ে অনেক আশা করতেন। যে কারণে চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গার্মেন্টসের কোয়ালিটি ম্যানেজার পদে চাকরি করতেন। যেখানে মাসিক ভাতা ছাড়া আর কোনো বিশেষ ভাতা ছিল না। যে কারণে অবসর নেয়ার পর তিনি একপ্রকার রিক্ত হাতেই ঢাকায় ফিরে আসেন। অতঃপর সন্তানদেরকে নিয়ে যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন।

চাকরী জীবনের মাসিক বেতন থেকে সামান্য কিছু অর্থ জমিয়েছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল যে কোনো ভাবে ঋণ করে হলেও সন্তানদের লেখাপড়া শেষ করাবেন। নতুন শহরে দুই মাস পেরিয়ে গেলেও অর্থাভাবে দোকান ভাড়া নিতে পারেননি তিনি। বাসা ভাড়া এবং সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করতে গিয়ে পুঞ্জীভূত অর্থ যেতে থাকে নিচের দিকে। নাঈমের বড় ভাইয়ের এইচএসসি পাশের পর অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। তবে সম্পূর্ণ ফি এখনও পরিশোধ করা হয়নি। শহীদের মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। চিকিৎসকের পরামর্শে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দেয়া হয়েছে তাকে।

তবে আর্থিক সংকুলান না থাকায় পরবর্তীতে ল্যাবে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার। চাকরি জীবনে নাঈমের বাবার উপার্জিত অর্থ ছিল খুবই সামান্য। যেন নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ও বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে হিমশিম খেতে হতো জনাব কামরুল ইসলামকে। ফলে গ্রামের পৈতৃক জমিতে পিতার রেখে যাওয়া টিনের ঘরই ছিল একমাত্র মাথা গুঁজার আশ্রয়স্থল। ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া তার কিছু আবাদি জমিও রয়েছে। যা প্রভাবশালী চাচাত ভাই দখল করে রেখেছেন। তাই গ্রামে ফিরে যাওয়ার শেষ রাস্তাটাও একপ্রকার বন্ধ।

"চক্ষুর অন্তরালে, ধীরেধীরে এ করুন সুরে"

জুলাই ১৮ ২০২৪। চারিদিকে তখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলে। ছাত্ররা অলিগলি মহাসড়ক অবরোধ করে তাদের দাবি দাওয়া প্রকাশ করে। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি ইন্ধন দেয়। দলীয় ছাত্রদের হাতে লাঠিসোঁটা, রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, ককটেল, দেশীয় অস্ত্র, রাইফেল প্রভৃতি তুলে নিতে বলে। সরাসরি পুলিশ বাহিনীকে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট,ছররা গুলি ও ফায়ারের নির্দেশ দেয়া হয়। যার নেতৃত্বে ছিল তৎকালীন ঘাতক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল। এসব বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় ছাত্ররা। দুর্বার সে আন্দলনে যোগ দেয় ২৪ এর শহীদ মো: নাঈম।

বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন "স্পেশাল ওয়াটার সাপোর্ট ইউনিট এন্ড রিমেডি ইউনিট।" দু-দলে ভাগ হয়ে যান তারা। যার কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হয় মুক্তিকামী ছাত্র শহীদ নাঈম। আন্দোলনকে সামনের দিকে নিতে তার নেতৃত্বে যাত্রাবাড়ীতে আরও ছোট ছোট ইউনিট গঠিত হয়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় তারা। এ যেন নতুন দিনের যুদ্ধ। আবারও দেশে ১৯৭১ সাল সংগঠিত হওয়ার ডাক দেয় দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা। সকলে দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুলে শপথ করেন। আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে। ঢাকাসহ সারা দেশের রাজপথ অবরোধ করে রাখে ছাত্র-জনতা।

যাত্রাবাড়ী সেক্টর কমান্ডার শহীদ নাঈমের চোখে ঘুম নেই। প্রতিদিন আন্দোলন থেকে ফিরে পতাকাটি জানালার গ্রিলে বেঁধে রাখেন। ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসেন। কিন্তু খেতে পারেন না। রাজপথের মুক্তিকামী জনতার কথা মনে পড়ে তার। মনে পড়ে ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপের কথা। স্বৈরাচারী সরকারের দোসররা মাত্র ছয় বছর বয়সী শিশুকেও রেহায় দেয়নি। পরের দিনের প্রস্তুতি নিতে নিজের রুমে এসে প্ল্যাকার্ড ডিজাইন করেন নাঈম। নির্ঘুম রাত কেটে যায় ভঁয়ে ভঁয়ে। কি হবে কাল?

পরদিন শুক্রবার, ১৯ জুলাই, ২০২৪। বাবা এবং ভাইকে নিয়ে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যান নাঈম। বাড়িতে ফিরে পারিবারের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন। অতঃপর শহীদের বাবা জানান-তার শরীরে জ্বর অনুভূত হয়েছে। বাসার দরজা বন্ধ করে তিনি বিশ্রামে যান। চারিদিকের হট্টগোলের আওয়াজ জানালা দিয়ে ভেসে আসে। বহু লোকের মিলিত চিৎকারে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে জনাব কামরুল ইসলামের। সেদিন ছুটির দিন থাকায় কলেজ বা প্রাইভেট টিউশন সবই বন্ধ ছিল। যার কারনে আন্দোলনে শামিল হওয়ার অজুহাত খুঁজতে থাকেন এই বীর সৈনিক। বারবার জানালা দিয়ে রাজপথের দিকে চেয়ে অসহায়চিত্তে নিজের উপর রাগ করছিলেন।

বাবার দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন বাবা ঘুমিয়েছে। সাথে সাথে পতাকা রেখে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। কারণপতাকা গ্রিলে না দেখলে তার বাবা বুঝে যাবেন যে ছেলে আন্দোলনে গিয়েছে।

যে আলোর দ্বীপ নিয়ে বের হয়েছিল নাঈম, সে কি পেরেছিল দেশটাকে আলোকিত করতে?

কিছুক্ষণ পর বাসার দরজা বন্ধ দেখে শহীদ জননীর সন্দেহ হয়। ছেলেকে খুঁজে আনতে অনুরোধ জানায় তার স্বামীর কাছে। নাঈমের বাবা বলেন, আমি অসুস্থ। তুমিও আমার সাথে চল। অতঃপর দুজন মিলে নাইমকে খুঁজতে বের হয়। রাত আটটা পার হলে তাঁরা ভাবেন হয়তো যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। তবে থানার ডিউটি অফিসার জানায়,আমাদের থানা পরিপূর্ণ। নতুন একজনকেও রাখার মতো জায়গা থানায় নেই। যে কারনে আজ কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যাত্রাবাড়ীর প্রতিটি অলিগলি খুঁজে ব্যর্থ হয় নাঈমের বাবা-মা। একে একে পার করেন রাত নয়টা থেকে দুইটা। তারপর সন্তানকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। আদরের সন্তানকে ছাড়া বিনিদ্র রজনী কাটে বাবা-মায়ের।

সন্তানের লাশ যে বাবা কাঁধে নেন তিনিই বোঝেন হারানোর বেদনা

শোকের সাগরে নিমজ্জিত পরিবার

পরদিন শনিবার, ২০ জুলাই ২০২৪। সারাদেশে কারফিউ জারী করে হাসিনা সরকার। সন্তানকে খুঁজতে বাধ্য হয়ে ছদ্মবেশে লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় আবারও বের হন জনাব কামরুল ইসলাম। ঢাকা

মেডিকেলের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিটি মর্গে সন্তানকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান তিনি। সর্বশেষ হিমঘরে মেলে আদরের সন্তানের লাশ। সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। পরবর্তীতে শহীদের লাশ হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষে রাত ১১ টার দিকে গ্রামের বাড়ী রানাপাশা, নলছিটি, ঝালকাঠি পৌঁছে। এরপর ২১ জুলাই রবিবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে নিজস্ব পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ মো: নাঈমকে।

তাকে হারিয়ে যেন পাগলপ্রায় দশা পরিবারটির। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন চরমভাবে ভেঙে পড়েছে। যে শহরে স্বপ্ন গড়তে এসেছিলেন নাঈমের বাবা, সে শহর ঠিক থাকলেও শুধু নেই স্বপ্নবাজ এক তরুণ। যে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে জনাব কামরুল ইসলাম যেন আজ জীবন্ত লাশ।

প্রতিবেশীর অনুভূতি

মো: রাকিব বলেন, "মাঝে মাঝে খেয়াল করতাম প্রায়ই একটা ছেলে মাথা নিচু করে কলেজে যায়। রাস্তার অনেককেই সালাম দেয়। ছোটদের দেখলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে। মসজিদে যাওয়া আসা করে। এত ভদ্র ছেলে আমাদের পাড়ায় এর আগে তেমন একটা চোখে পড়েনি। যতই দেখতাম মুগ্ধ হতাম আমরা। সালাম ছাড়া তার সাথে তেমন কোনো কথা হয়নি আমার। ছেলেটির নাম যে নাঈম ওর মৃত্যুর পরে জানতে পেরেছি। এখনও কানে তার সালাম ভেসে আসে।"

খুনি হাসিনা বলে-

'এদেশে কুকুর, বিড়াল, বন্য প্রানী পিটিয়ে মারলেও আইনের আওতায় আসতে হবে।'

হয়ত মনে মনে ভেবেছিল মানুষ মারাটা নিছকই ছেলেখেলা। এই নরখেকো রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার বিচার হবেই। যার বিচার মুক্তিকামী এই স্বাধীন দেশের নাগরিকরাই করবেন।

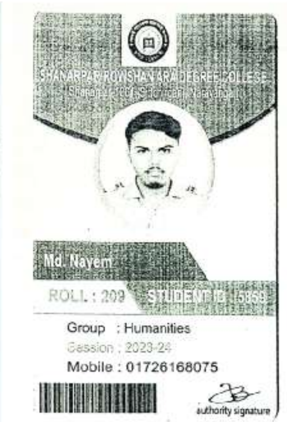

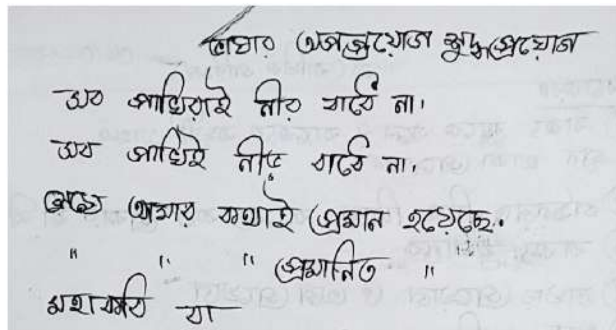

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: নাঈম
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৩ জানুয়ারি ২০০৭, ১৭ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকেল ৪.১৫
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানা সংলগ্ন
দাফন করা হয়	: নিজস্ব পারিবারিক কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রানাপাশা, থানা: নলছিটি, জেলা: ঝালকাঠি
পিতা	: মো: কামরুল ইসলাম
মাতা	: মাহমুদা পারভিন
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বসতি জমি রয়েছে। আবাদি জমি দখল নিয়েছে প্রভাবশালী চাচা
ভাইবোনের বিবরণ	: মো: নোমান, সম্পর্ক: ভাই, বয়স: ২২, পেশা: ছাত্র

প্রস্তাবনা

শহীদের বড় ভাইকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে।

বাবা ব্যবসা করতে চায়। তবে পুঁজি স্বল্পতায় ভুগছেন। এককালীন সাহায্য পেলে ব্যবসা করবেন।

শহীদ নাঈমের মায়ের চিকিৎসা ভাতা দেয়া যেতে পারে।

শহীদ মো: আব্দুল্লাহ কবির

ক্রমিক : ০২০

আইডি : ঢাকা সিটি ০২০

জন্ম ও ব্যক্তিজীবন

চব্বিশের শহীদ মো: আব্দুল্লাহ কবিরের জন্ম ১৯৭৮ সালের ১১ নভেম্বর, চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ শহরে। চাঁদপুরের মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম হয়। পিতা আলহাজ্ব মো: মোছলেহ উদ্দিন ও মাতা সুরাইয়া বেগমের কোল আলোকিত করে ৪৬ বছর আগে যে ছেলে এসেছিলো, সেই ছেলে একদিন দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেবেন, তা কি জানতেন মোছলেহ উদ্দিন-সুরাইয়া দম্পতি ?

শহীদ আব্দুল্লাহ কবিররা দুই ভাই। হয়তো আর দশটা মধ্যবিত্ত পোড় খাওয়া মানুষের মতোই জীবন ছিলো শহীদ কবিরের। জীবিকা অর্জনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন ব্যবসা। গার্মেন্টস থেকে লট ধরে মালামাল কিনে পরে এগুলো বঙ্গবাজার মার্কেটে দোকানে-দোকানে পাইকারি দরে বিক্রি করতেন। ঢাকার মিরপুরের পাইকপাড়া এলাকার শহীদ কবির পেতেছিলেন সুখের সংসার। আনাফ নামের আট বছরের একটি ছেলেও আছে তাদের সংসারে। ছোট্ট আনাফ স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। সুখের সংসারে, যাপিত জীবনে একটু যেন ছন্দপতন। জানা যায়-তার এই পাইকারি পোশাকের ব্যবসায় ব্যর্থতা ছোবল দিয়েছে। বাধ্য হয়ে ঋণ নেন তিনি। এখনও সাত লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা শহীদ পরিবারের ওপর। ব্যবসার লসের জন্য নিজেদের একমাত্র আবাস, মিরপুরের ফ্ল্যাটটাও বিক্রি করে দিতে হয়। স্ত্রী সন্তান নিয়ে জনাব কবির শেষ পর্যন্ত একটি ভাড়া বাসায় ওঠেন। চাঁদপুরে আব্দুল্লাহ কবিরের পৈতৃক কিছু জায়গা জমি আছে। পরিবার হিসেবে তারা যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত।

"এখন আর কেউ ফোন দিয়ে জিজ্ঞেসা করেনা- আমি কোথায়!"

মানবতা এবং একটি নির্মমতার গল্প

৪ আগস্ট ২০২৪। উত্তাল দেশ। কখন কী হয়ে যায়! কাকে কখন কোথায় মেরে ফেলে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, এমন একটা ভয়ানক পরিস্থিতি। এত এত রক্তের ওপর দিয়ে খুনী হাসিনা ক্ষমতা আঁকড়ে বসে আছে। পরদিন পাঁচ তারিখ রোড মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি। গণভবন ঘেরাও করা হবে। চারদিকে ভয়ানক অশুভ পরিবেশ। বাতাসে লাশের গন্ধ। সংলাপের কথা বলে ৪ তারিখেও গুলি চালানো হলো। খুন করা হলো ছাত্র-জনতাকে। এই ৪ তারিখেই শহীদ আব্দুল্লাহ কবির গিয়েছিলেন ব্যাংকে। ঐ সময়ে মানুষের মনে আগুন জ্বলছে। বাইরে যেতেও ভীতি কাজ করত মানুষের মনে। তবু সংগ্রামী ছাত্র-জনতা রাজপথ দখলে রেখেছিল। আব্দুল্লাহ কবির সাহস করে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনেই পথে বের হয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন তিনি তো যাচ্ছেন কাজে! তাকে নিশ্চয়ই ফ্যাসিস্ট হাসিনার মদদপুষ্ট পোষা বাহিনী কিছু বলবে না। ব্যাংকের কাজ শেষে রিক্সায় করে মিরপুর-১০ আইডিয়াল কলেজ সংলগ্ন এলাকা হয়ে যাচ্ছিলেন বাড়ির দিকে। পথে হঠাৎ দুইজন ছাত্রকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে যা করার কথা জনাব কবির তাই করেছিলেন।

তিনি রিক্সা থেকে নেমে গিয়েছিলেন ছাত্রদের সাহায্য করতে। এদের হাসপাতালে নেয়া গেলে বাঁচানো যাবে হয়তো এমনটা ভেবেই রিক্সায় করে তাদেরকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু হায়! আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আর আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নামের নরপশুরা তখন মৃত্যু পথযাত্রীকে হাসপাতালে নিতেও বাঁধা দেয়! মানুষ হয়ে মানুষকে রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে একজন মানুষ কি চুপ থাকতে পারে? না দেখে চলে যেতে পারে? শহীদ আব্দুল্লাহ কবিরও পারেননি। আর এটাই ছিলো তার অপরাধ। গুলিবিদ্ধ দুজনকে হাসপাতালে নিতে গেলে আওয়ামী লীগের অমানুষরা শুধু বাঁধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ওরা কবিরের ওপর গুলিও চালায়। সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলো তৎকালীন আওয়ামী লীগের কামাল আহমেদ মজুমদার, মঈনুল খান নিখিল, সাচ্চু, এস এম জাহিদ, ইলিয়াস আলী মোল্লা ও মোবাশ্বের। গুলি লাগার পর কবির হয়তো হতভম্ব হয়েছিলেন কারণ তিনি নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারেননি দুইজন গুলিবিদ্ধ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কারণে তাকে গুলি খেতে হবে! হয়তো কল্পনা করছিলেন পুত্র আনাফের মুখটা। প্রিয় স্ত্রী অথবা তার মমতাময়ী মায়ের কথা। খবর পেয়ে কবিরের ছোট ভাই রাজু (৩৮) ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

রাজু কী তার ভাইয়ের গুলিবিদ্ধ দেহ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন? ছোট্ট আনাফ কী তার বাবার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেরেছিল? কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে দেয়া মৃত্যু সনদে সময় বিকাল চারটার কথা উল্লেখ আছে। হয়তো তখন বাসায় ফিরে তার ভাত খাওয়ার কথা ছিলো। তার ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন স্ত্রী। অথচ কবির বাড়িতে ফিরলেন লাশ হয়ে। মৃত্যু সনদে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে করা গুলির আঘাত। মৃত্যু সনদের শেষে লেখা হয়েছে, বুলেটের আঘাতে কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেইলিয়রের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

চাঁদপুরের মতলবে গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন শহীদ আব্দুল্লাহ কবির। মতলবে ফেরার কথা তার আগেই ছিলো। ব্যবসার লস, ঋণের বোঝা, ভাড়া বাসায় থাকা সব মিলিয়ে এই ডিসেম্বরে পরিবার নিয়ে গ্রামে ফেরার কথা ছিলো। পরিবার গ্রামে ফিরল ঠিকই কিন্তু শহীদ আব্দুল্লাহ কবিরের লাশের বোঝা কাঁধে নিয়ে। অথচ কবিরের ফেরার কথা ছিলো তার ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা মায়ের কাছে। ছোট্ট আনাফের গ্রামে ফেরার কথা ছিলো বাবার আঙুল ধরে। ফ্যাসিস্ট হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসন আর ক্ষমতার লোভ কত মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলো।

কত মানুষ তার প্রিয়জনকে হারালো। কত রক্তের বিনিময়ে কেনা আমাদের ২৪-এর এ স্বাধীনতা!

শহীদের ভাই রাজু বলেন, "আমার ভাইয়া চুপচাপ স্বভাবের ছিলেন। তবে যে কোনো সামাজিক কাজে তার অংশগ্রহণ ছিল সবার আগে। যে কেউ বিপদে পড়লে তার বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। আমাকে বাবার মতো শাসন করে আগলে রাখতেন। আমি ভাইয়া হত্যার বিচার চাই। এখন আর কেউ ফোন দিয়ে জিজ্ঞেসা করেনা- আমি কোথায়!"

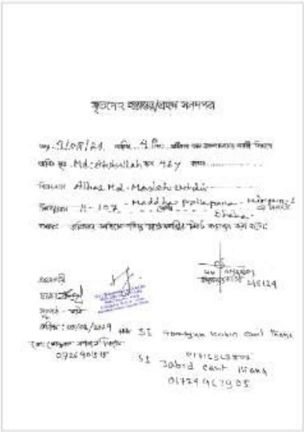

মৃতদেহ হস্তান্তর/গ্রহণ সনদপত্র

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: আব্দুল্লাহ কবির
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১১ নভেম্বর ১৯৭৮, ৪৬ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক দুপুর ৩টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: মিরপুর-১০ আইডিয়াল কলেজ সংলগ্ন
দাফন করা হয়	: চাঁদপুর পারিবারিক কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মতলব দক্ষিণ, মতলব, জেলা: চাঁদপুর
পিতা	: আলহাজ্ব মো: মোছলেহ উদ্দিন
মাতা	: সুরাইয়া বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বসতি ও আবাদি জমি রয়েছে
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: ১. মো: আনাফ, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৮
	: ২. গাউছুল্লাহ রাজু, সম্পর্ক: ছোট ভাই, বয়স: ৩৮ পেশা: ব্যবসায়ী
	: ৩. রত্না, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ৫২, বিবাহিতা
	: ৪. হিরা, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ৪৫, বিবাহিতা
	: ৫. মুক্তা, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ৪৭, বিবাহিতা
	: ৬. রুমা, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ৩৯, বিবাহিতা
স্ত্রী	: আফসানা আক্তার, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪০

প্রস্তাবনা

শহীদের সাত লক্ষ টাকা ঋণ রয়েছে। পরিশোধে সহায়তা করা যেতে পারে।
শহীদের সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।
শহীদ পত্নীকে মাসিক অথবা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

শহীদ মো: নাদিম

ক্রমিক : ০২১

আইডি : ঢাকা সিটি ০২১

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: নাদিম। তার পিতা মরহুম শেখ সামসুল হক এবং মাতা মরহুমা নাসিমা হক। ঢাকা জেলায় শাহ আলী থানার মিরপুর-১ এর ৬ নং এভিনিউ রোডে ঈদগাহ মাঠের পাশেই তার অস্থায়ী ঠিকানা। তিনি মিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ ১২-০৮-১৯৮৬। তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি তার ছিল গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসা। তার নিজস্ব পরিচালনায় একটি কোচিং সেন্টারও ছিল। তার দুই সন্তান; বড় ছেলে আনাসের বয়স ৩ বছর এবং ছোট ছেলে আহনাফের বয়স দেড় বছর। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে রেখে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পুলিশের গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

জন্ম তার মিরপুরে হলেও তিনি বসবাস করতেন তার শ্বশুরবাড়ির এলাকা রামপুরায়। রামপুরা থানার পাশেই ছিল তার গ্যাস সিলিন্ডারের দোকান। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা পরিবার এখন খুবই অসহায়। তার আয় ছিল খুবই সীমিত। মাসিক প্রায় ১৫০০০ টাকা আয়ে কোনরকমভাবে তার সংসার চলছিলো।

দেশের জন্য জীবন দিলেন নাদিম

শহীদ মো: নাদিম সাহসী এক যোদ্ধা যিনি জুলাই বিপ্লবে স্বৈরশাসক হটাতে প্রাণ দিয়েছেন। জুলাই ২০২৪ ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনে অংশ নিয়ে রাজপথে লড়েছে লড়াকু সৈনিকেরা। ১৯ জুলাই দুপুরে রামপুরার বনশ্রী এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন নাদিম। ছাত্র জনতার আন্দোলনে কাঁপতে থাকে রাজপথ। চলছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। ভীত হয়ে পড়ে হাসিনা সরকার। হাসিনার পুলিশ বাহিনী গুলি করে নিরীহ ছাত্র-জনতার মিছিলে। বনশ্রী এলাকায় পুলিশের গুলিতে সেদিন আহত হয় মিছিলের অনেকেই। নাদিম তাদের মধ্যে একজন। তার পেটে গুলি লাগে। তিনি আহত হন বনশ্রী রামপুরা থানার সামনে। তাকে গুলি করে রামপুরা থানার পুলিশ বাহিনী। সেদিন ছিল জুম'আর দিন। নামাজ শেষে জনতার ঢল নামে রাজপথে। নামাজের পরপরই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। ঐদিন অর্থাৎ ১৯ জুলাই এডভান্স হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তথ্যমতে, হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি ইন্তেকাল করেন। জানাজা শেষে শহীদ নাদিমকে মিরপুরে তার বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

শহীদের স্ত্রীর বক্তব্য

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ হওয়া মো: নাদিমের স্ত্রীর মতে নাদিম একজন দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন। সংসারের পরিপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন সচেতন। কারও সাথে ঝগড়া করতেন না। হাসিমুখ ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। সাবলেট নিয়ে ভাড়া বাসায় ছিল ছোট সংসার। সন্তানদের জন্য ছিলেন আদর্শ বাবা। প্রতিবেশীদের সাথে ছিল সুসম্পর্ক।

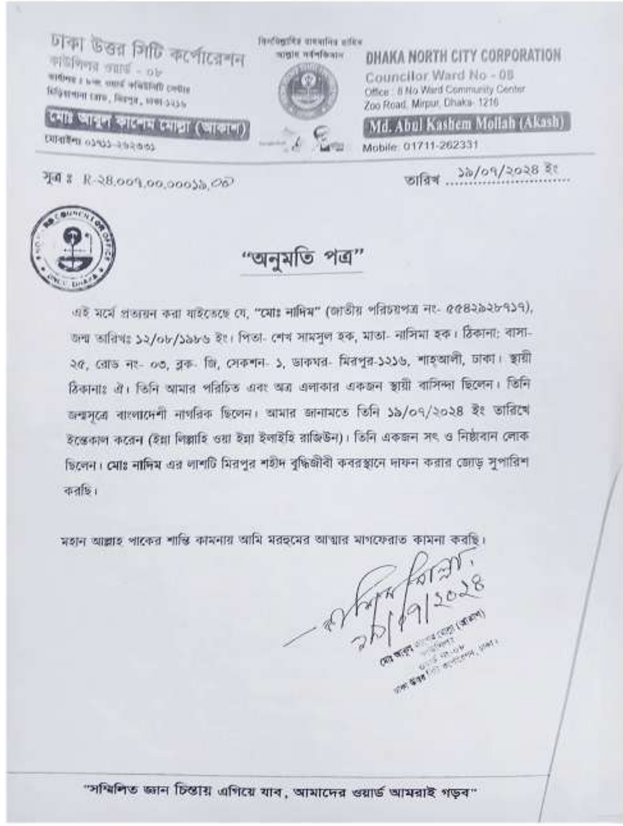

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
কাউন্সিলর ওয়ার্ড - ০৮
মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা (আকাশ)
মোবাইল ০১৭১১-২৬২৩৩১

DHAKA NORTH CITY CORPORATION
Councilor Ward No - 08
Office : 8 No Ward Community Center
Zoo Road, Mirpur, Dhaka- 1216
Md. Abul Kashem Mollah (Akash)
Mobile: 01711-262331

সূত্র : R-২৪.০০৭.০০.০০০১৯.০৩ তারিখ ১৯/০৭/২০২৪ ইং

"অনুমতি পত্র"

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, "মোঃ নাদিম" (জাতীয় পরিচয়পত্র নং- ৫৫৪২৯২৮৭১৭), জন্ম তারিখঃ ১২/০৮/১৯৮৬ ইং। পিতা- শেখ সামসুল হক, মাতা- নাসিমা হক। ঠিকানা: বাসা- ২৫, রোড নং- ০৩, ব্লক- জি, সেকশন- ১, ডাকঘর- মিরপুর-১২১৬, শাহ্আলী, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ ঐ। তিনি আমার পরিচিত এবং অত্র এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক ছিলেন। আমার জানামতে তিনি ১৯/০৭/২০২৪ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। **মোঃ নাদিম** এর লাশটি মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করার জোড় সুপারিশ করছি।

মহান আল্লাহ পাকের শান্তি কামনায় আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

১৯/৭/২০২৪

"সম্মিলিত জ্ঞান চিন্তায় এগিয়ে যাব, আমাদের ওয়ার্ড আমরাই গড়ব"

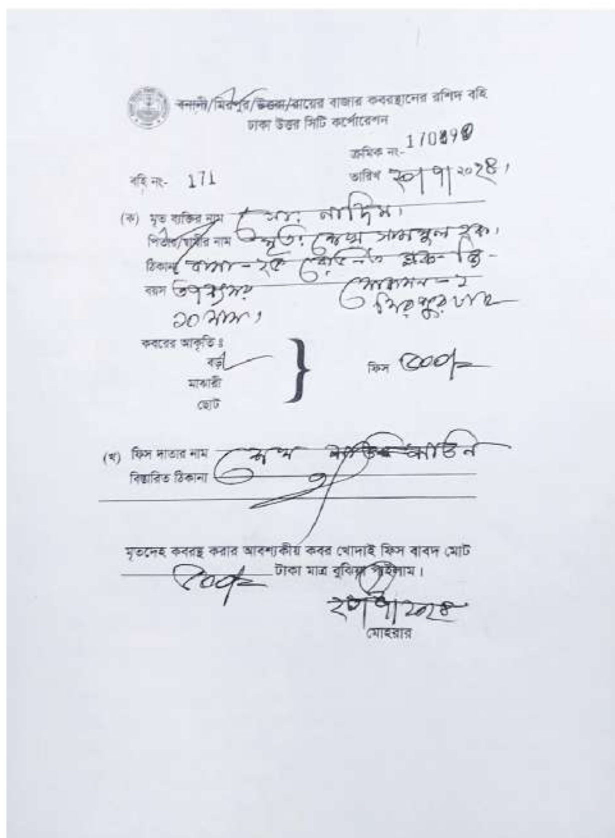

বনানী/মিরপুর/উত্তরা/রায়ের বাজার কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং-

বহি নং- 171 তারিখ ২০/৭/২০২৪

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম মোঃ নাদিম।
পিতার/স্বামীর নাম পিতা: শেখ সামসুল হক।
ঠিকানা বাসা-২৫ রোড-৩ ব্লক- জি- সেকশন-১ মিরপুর
বয়স

কবরের আকৃতি ঃ
বড়
মাঝারী
ছোট

ফিস ৫০০/-

(খ) ফিস দাতার নাম
বিস্তারিত ঠিকানা

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট ৫০০/- টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

২০/৭/২০২৪
মোহরার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ নাদিম
Name: Md. Nadim
পিতা: শেখ সামসুল হক
মাতা: নাসিমা হক
Date of Birth: 12 Aug 1986
ID NO: 5542928717

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: নাদিম
পেশা	: শিক্ষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ১২-০৮-১৯৮৬
জন্মস্থান	: মিরপুর
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই বাদ জুমা
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই বাদ জুমা, এডভান্স হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: মিরপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: মিরপুর-১, ৬-এভিনিউ রোড, ঈদগাহ মাঠ
বর্তমান ঠিকানা	: রামপুরা থানার পাশে, রামপুরা, ঢাকা
পিতা	: মরহুম শেখ সামসুল হক
মাতা	: মরহুমা নাসিমা হক

সম্ভাব্য প্রস্তাবনা

শহীদ মো: নাদিম রেখে গিয়েছেন স্ত্রী ও অবুঝ দুই শিশুপুত্র। তার অসহায় পরিবারের পাশে অবশ্যই সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত। এককালীন একটি বড় বাজেট তার পরিবারের জন্য বরাদ্দ করা।

শহরে একটি থাকার জায়গা বরাদ্দ দেওয়া।

প্রতি মাসে নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দ করা।

মাসিক বরাদ্দের পাশাপাশি রেশনের ব্যবস্থা করা।

সন্তানদের লেখাপড়া ব্যয় বহন করা। শহীদ সন্তান হিসেবে গ্রাজুয়েট হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ মওকুফ করা।

চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা ভাতার পাশাপাশি হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা।

‘সন্তানকে খুঁজতে গিয়ে ঘরে ফেরা হলো না আর’

শহীদ মো: মাসুদ

ক্রমিক : ০২২

আইডি : ঢাকা সিটি ০২২

জন্ম ও ব্যক্তিজীবন

আব্দুল গফুর ও ছাহেরা বেগমের সংসার শুরু হয় রাজধানীর মেরাজনগরে। একে একে জন্ম নেয় হারুন (৫৬), হুমায়ন (৫১) ও শরিফুল্লাহ (৪৭)। সংসার জুড়ে চলে উৎসবের আমেজ। পিতামাতার চোখের সামনে সন্তানেরা বড় হতে থাকে। দায়িত্ব বেড়ে যায় ছাহেরা বেগমের। সন্তানদের লালন পালনে দিন-রাত পরিশ্রম করেও ক্ষান্ত হন না গফুর সাহেব। কিছুদিন পর তাদের ঘর আলোকিত করে ১৯৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেয় শহীদ মো: মাসুদ। ব্যবসায়ী বাবার চোখেমুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে দুরন্তপনায় মাতে শহীদের ভাইয়েরা। সে আনন্দ অচিরেই অশ্রুতে রূপ নেয়। মাত্র নয় বছর বয়সে বাবাকে হারায় মাসুদ।

পরিবারে নেমে আসে যাতনা

জীবন বহমান। সকল হারানো কিংবা শোক-তাপের উর্ধ্বেও জীবন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এটাই চিরন্তন সত্য। স্মৃতি শুধুই স্মৃতি। কিছু স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু স্মৃতিকে যেমন ভুলে থাকা যায় না, তেমনি অস্বীকারও করা যায় না। মানুষকে আল্লাহ অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন। সেই অসাধারণ সুন্দর নিয়ামতের একটি হলো সন্তানের জন্য তার বাবা-মা। বাবা সন্তানের মাথার ওপর স্নেহচ্ছায়া রাখেন বটবৃক্ষের মতো। বাবার তুলনা বাবাই। যার কল্যাণে এই পৃথিবীর রূপ, রং ও আলোর দর্শন পরিবর্তন হয়। বাবা শাশ্বত, চির আপন, চিরন্তন। বাবাকেই আদর্শ মনে করে সন্তানেরা। বাবা সন্তানকে শেখান কীভাবে মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। তার মৃত্যুর পর সন্তানেরা বাস্তবতা বুঝতে শেখে। জীবনের নিষ্ঠুরতা থেকে পরিত্রাণ খোঁজে।

অবশেষে মেলে পরিত্রাণ

বাবাকে হারিয়ে মাসুদ ও তার পরিবারের চার দিক আঁধারে নিমজ্জিত হয়, অনিশ্চিত জীবনে পদার্পণ করে সন্তানেরা। সংসারের হাল ধরতে শহীদের তিন ভাই নানা কাজে যুক্ত হন। কেউ কারখানায়, কেউ বা মুদি দোকানে, কেউ বা আবার চাকরিতে যুক্ত হন। সংসার স্বাভাবিক হতে থাকে ছাহেরা বেগমের। একে-একে সবাইকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক পর্যায়ে কুমিল্লা শহরের জায়গা-জমি বিক্রি করেন শহীদ জননী। তার চৌকস চিন্তা ধারায় অবশেষে আর্থিক অনটন থেকে পরিত্রাণ পায় শহীদ পরিবার।

শহীদ মাসুদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সকলের ঐকমত্য
ভাইদের অনস্বীকার্য অবদানে মাসুদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বড় ভাই প্রবাসী, মেজ ভাই বাস চালক, সেজ ভাই একটি মেশিনারিজ কোম্পানিতে চাকরি করেন।

সেজ ভাই শরীফের ভাষ্যমতে- "মাসুদ ছিল একটু ডানপিটে ধরনের। আমরা তাকে কয়েকবার প্রবাসে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে থাকতে না পেরে পরবর্তীতে দেশে চলে আসে মাসুদ।" মেরাজনগর, যাত্রাবাড়ী এলাকার পৈতৃক ভিটায় শহীদের আদি বসতি। পরবর্তীতে ভাগাভাগি হলে সন্তানদেরকে সমান ভাগে জমি বন্টন করে দেন মহীয়সী নারী ছাহেরা বেগম। ভাইদের প্রচেষ্টায় নিজ জমিতে এককক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন মাসুদ। তবে এক চতুর্তাংশ তার নিজ খরচে করা। বাড়ির প্লাস্টার, ছাদ ঢালাই, অসম্পূর্ণ রয়েছে। উপরে পুরাতন টিনের ছাউনি। একটু বৃষ্টি হাল তার স্ত্রী হেনা বেগম (৩৯) দুশ্চিন্তায় পড়েন। টিনের ছিদ্র দিয়ে পানি ভিতরে প্রবেশ করে। শহীদ মাসুদ পেশায় একজন মালামাল সরবরাহকারী ছিলেন। তিনি ইট, বালি, সিমেন্ট ও রড বিভিন্ন অফিস, বাসা-বাড়ীতে সরবরাহ করতেন। তবে তার নিজস্ব কোনো দোকান বা পুঁজি ছিল না। অন্যের দোকানের মালামাল তৃতীয় পক্ষ হয়ে বিক্রি এবং সরবরাহ করাই ছিল শহীদের একমাত্র পেশা। তিনি ছোট থেকে বাবার আদর, শাসন ও নিয়মমাফিক জীবন পরিচালনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যে কারণে তার মধ্যে দ্বায়-দায়িত্বের পরিপক্কতা একটু কমই ছিল। মাসুদের তিনটি সন্তান রয়েছে। মাহফুজ (১১), মারুফ (৯) ও মাশরাফি (৬)।

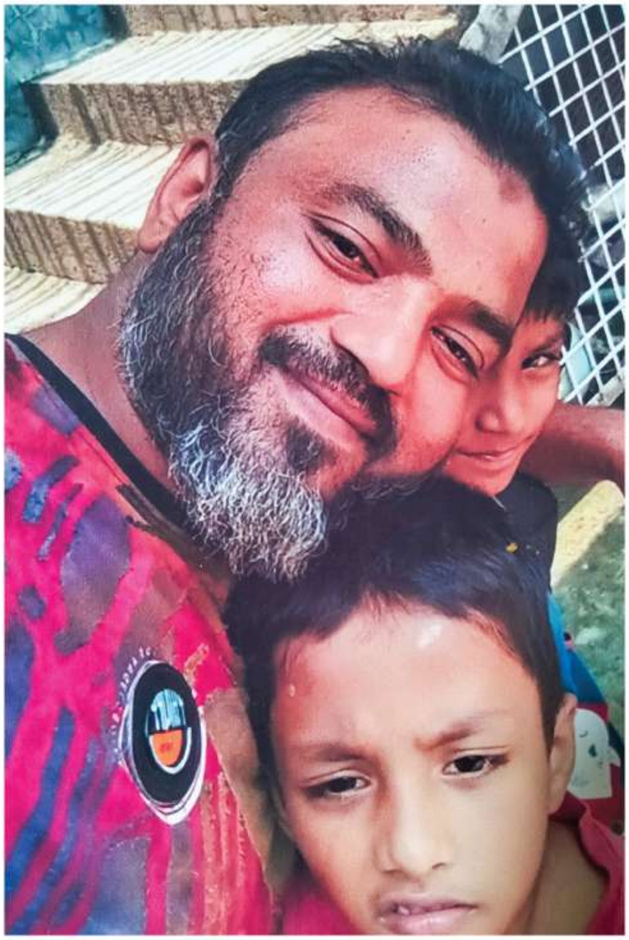

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের গণ জোয়ার

ঘটনার সূত্রপাত জুলাই মাসে। সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের গণজোয়ার ওঠে। চারিদিকে ছাত্রদের মিছিল অবরোধে সারাদেশ যেন একত্রিত হয়। ছোট বড় সকলের মুখে উচ্চারিত হয় "স্বৈরাচার হটাও, দেশ বাঁচাও"। জোর প্রয়াগ করে ক্ষমতায় থাকতে চায় স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। পুলিশ, আওয়ামী যুবলীগ, ছাত্রলীগ মোতায়েন করে সারাদেশে গণহত্যা চালায় খুনি হাসিনা। শহর থেকে গঞ্জের প্রতিটা অলি-গলিতে নির্বিচার গুলি চালায় তারা। রক্তাক্ত নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। সাধারণ জনতাকেও ছাড় দেয়নি হাসিনার পালিত বাহিনী।

যেভাবে তিনি শহীদ হন

শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০২৪। চারিদিকে ব্যাপক গুলাগুলি চলে। সাধারণ জনগণ দোকানপাট বন্ধ করে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ঠিক তেমনি মাসুদও নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সন্তানেরা বারবার বাইরে খেলতে যাওয়ার বায়না ধরে। তাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঘরবন্দি রাখার চেষ্টা করেন হেনা বেগম। একপর্যায়ে মেজ ছেলে মারুফ (৯) বিকাল হওয়ায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সাহস করে সন্তানকে খুঁজতে যায় মাসুদ। একটু পর মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আসরের আজান উচ্চারিত হয়। শহীদ ভাবেন নামাজ আদায়ের পর মারুফকে আবার খুঁজবেন। এই ভেবে রাস্তা পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন তিনি।

'আপনার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন।'

ঘটনার শুরু

মসজিদের পাশের গলিতে যুবলীগের স্থানীয় সন্ত্রাসীরা রামদা এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে তখন টহল দিচ্ছিল। তারা বড় বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে পথচারীর দিকে গুলি তাক করে রাখে। এমতাবস্থায় রাস্তা পার হয়ে গলিতে প্রবেশ করেন মাসুদ। হঠাৎ একটি গুলি তার কপালে এসে বিদ্ধ হয়। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সেজ ভাই শরীফের কাছে স্থানীয়দের ফোন আসে। 'আপনার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন।' তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়েন শহীদের সহোদর। ছোট ভাইয়ের রক্তাক্ত শরীরকে নিজের হাতের উপর নিয়ে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে সিটি স্ক্যান করেন চিকিৎসকেরা। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মাসুদের শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে। নিস্তেজ হয়ে যায় তার দেহ। রাত একটার দিকে পরিবারকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান শহীদ মো: মাসুদ। মেডিকেল সনদে উল্লেখ করা হয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। লাশ মেরাজনগর নিজ বাড়িতে পৌঁছায়। স্বামীর রক্তাক্ত জখম নিথর দেহ দেখে মুহূর্তে প্রাণনাশের উপক্রম হয় হেনা বেগমের। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে পরিবার। অতঃপর শহীদ মাসুদের জানাজা সম্পন্ন হলে চিরদিনের জন্য তার লাশ মাতুয়াইল কবরস্থানে শায়িত করা হয়।

"অনিশ্চয়তার বেড়াজালে বাঁধা পড়েছে বাকী জীবনের পটভূমি।"

অভিভাবকহীন পরিবার

মাসুদের হঠাৎ মৃত্যুতে তার স্ত্রী যেন দুঃখের সাগরে পড়েছেন। ছোট-ছোট এতিম তিন সন্তানকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা যেন গগনসম। সন্তানদের লেখাপড়া ও সংসার চালানোর মতো পুঁজি শহীদ মাসুদ রেখে যাননি। হেনা বেগমের পারিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। কীভাবে সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যৎ গড়বেন জিজ্ঞাসা করলে- অঝরে কেঁদে ওঠেন তিনি। অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু যেন কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। মাসুদ সন্তানকে খুঁজতে গিয়েছিলেন, আজ সন্তানেরা তাকে খুঁজে বেড়ায়। কোথায় খুঁজে পাবে তাদের প্রিয় বাবাকে, বলতে পারেন? শোকাহত পরিবারটি বর্তমানে নীড়হারা উদবাস্তুর মতো বিচরণ করছে! অনিশ্চয়তার বেড়াজালে বাঁধা পড়েছে বাকী জীবনের পটভূমি।

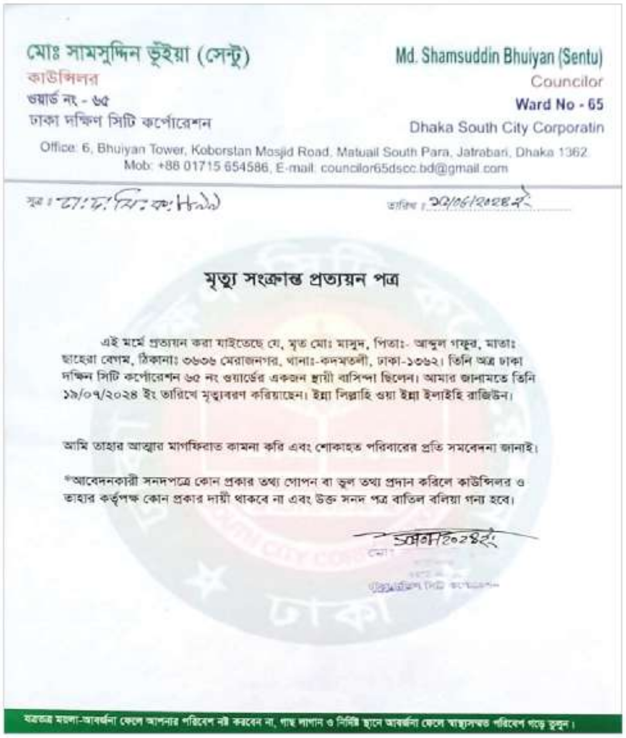

মোঃ সামসুদ্দিন ভূইয়া (সেন্টু)
কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং - ৬৫
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

Md. Shamsuddin Bhuiyan (Sentu)
Councilor
Ward No - 65
Dhaka South City Corporatin

Office: 6, Bhuiyan Tower, Koborstan Mosjid Road, Matuail South Para, Jatrabari, Dhaka 1362
Mob: +88 01715 654586, E-mail: councilor65dscc.bd@gmail.com

সূত্র: ঢা:দ:সি:ক:/৬৫/৯৯ তারিখ: ২৫/০৮/২০২৪ ইং

মৃত্যু সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত মোঃ মাসুদ, পিতাঃ- আব্দুল গফুর, মাতাঃ তাহেরা বেগম, ঠিকানাঃ ৩৬৩৬ মেরাজনগর, থানাঃ-কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২। তিনি অত্র ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৬৫ নং ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আমার জানামতে তিনি ১৯/০৭/২০২৪ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমি তাহার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

*আবেদনকারী সনদপত্রে কোন প্রকার তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য প্রদান করিলে কাউন্সিলর ও তাহার কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার দায়ী থাকবে না এবং উক্ত সনদ পত্র বাতিল বলিয়া গন্য হবে।

যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে আপনার পরিবেশ নষ্ট করবেন না, গাছ লাগান ও নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তুলুন।

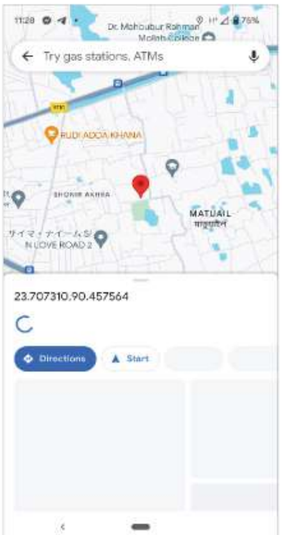

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : মো: মাসুদ
পেশা : ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স : ০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, ৪২ বছর
আহত হওয়ার তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক বিকাল ৫টা
শহীদ হওয়ার তারিখ : ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, রাত ১টা
শাহাদাত বরণের স্থান : মেরাজনগর, ব্লক-বি, মসজিদ সংলগ্ন
দাফন করা হয় : মাতুয়াইল কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মেরাজনগর, এলাকা: যাত্রাবাড়ী জেলা: ঢাকা
পিতা : মো: আব্দুল গফুর
মাতা : ছাহেরা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা : বসতি জমি রয়েছে (অসম্পূর্ণ বাড়ি)

সন্তানের বিবরণ:
১. মো: মাহফুজ, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ১১, প্রতিষ্ঠান: প্যারাডাইস কিন্ডার গার্ডেন, শ্রেণি: ৪র্থ
২. মো: মারুফ, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৯, প্রতিষ্ঠান: প্যারাডাইস কিন্ডার গার্ডেন, শ্রেণি: ৩য়
৩. মো: মাশরাফি, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৬, প্রতিষ্ঠান: মারিফুল কুরআন ইন্টা. হিফজ মাদরাসা, শ্রেণি: প্লে

ভাইবোনের বিবরণ:
১. হারুন, সম্পর্ক: বড় ভাই, বয়স: ৫৬, পেশা: প্রবাসী
৩. হুমায়ন, সম্পর্ক: মেজ ভাই, বয়স: ৫১, পেশা: বাস চালক
২. শরীফুল্লাহ, সম্পর্ক: সেজ ভাই, বয়স: ৪৭, পেশা: চাকরি (গারটেক্স মেশিনারিজ)
স্ত্রী : হেনা বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৩৭

প্রস্তাবনা : ১. শহীদের তিন সন্তান লালন পালনের জন্য মাসিক বা এককালীন ভাতা দেয়া যেতে পারে
: ২. অসম্পূর্ণ বাড়ী সম্পূর্ণ করে দেয়া যেতে পারে
: ৩. শহীদের স্ত্রীকে যেকোনো ধরনের ভাতা দেয়া যেতে পারে

তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৬-০৮-২০২৪

"একদিন বড় বস্তায় আব্বুকে কবর থেকে তুলে আনব ।" -ইরফান (৪)

শহীদ মো: ইমন

ক্রমিক : ০২৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৩

শহীদের পরিচয়

অল্প বয়সে বাবাকে হারান শহীদ মো: ইমন (২৫)। তার বাবা জনাব ইসমত আলী দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছেন। শহীদের পিতা পেশায় দিনমজুর ছিলেন। জীবিত থাকাকালীন তার পরিবার চিকিৎসার জন্য পৈতৃক ভিটা-মাটি বিক্রি করেছেন। এরপরও তাদের পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারস্থ হয় পরিবারটি। একপর্যায়ে তারা ঋণ করেন। তবুও ইসমত আলীকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন সন্তান, সোহাগ (৩৫), সজিব (৩২), ও ইমনকে রেখে চির বিদায় নিয়েছেন। অতঃপর বড় দুই ছেলে রিক্সা চালিয়ে সংসারের হাল ধরেন। পরবর্তীতে সংসার জীবন শুরু করলে তারা আলাদা হয়ে যান। সংসারের বাড়তি খরচ চালাতে না পেরে হিমশিম খায় পরিবার দুটি। এমনকি বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা করতেও তারা অপারগতা প্রকাশ করেন।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে তার পরিবার

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন ইমন। যাত্রাবাড়ী গরিবে নেওয়াজ রাবার কারখানায় পাঁচ হাজার টাকা বেতনে চাকরি নিয়ে শিশু বয়সেই সংসারের হাল ধরেন। এর মধ্যে আবার জনকের রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করতে পরিবারের উপর আত্মীয়-স্বজনের চাপ আসতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে কারখানার ডিউটি শেষে বিকালে অটো রিক্সা চালিয়ে বাড়তি উপার্জন শুরু করতে হয় তাকে। ক্রমান্বয়ে ঋণের বোঝা কমতে থাকে। আবারও হাসি ফিরে পায় শহীদ পরিবার। কিছুদিন পর ইমন বিয়ে করেন। ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় ইরফান। সংসারে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করে। ধীরেধীরে শহীদের উপার্জন বৃদ্ধি পায়। ঝুপড়ি ঘর ছেড়ে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে নিয়ে মাতুয়াইল কবরস্থান রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠেন। আবারও সন্তানসম্ভবা হন মুলছুমা আক্তার। খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন শহীদ ইমন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমনী সুসংবাদ পেয়ে শহীদ জননী আপ্লুত হয়ে পড়েন।

"সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক আনতে কারখানায় যাচ্ছি।"

আন্দোলন ও শাহাদাত

শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০২৪। নিজ বাসা থেকে বের হন ইমন। উদ্দেশ্য গরিবে নেওয়াজ রাবার কারখানা। বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে যান,"সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক আনতে কারখানায় যাচ্ছি।" অতঃপর যাত্রাবাড়ী রায়েরবাগ ফুট ওভার ব্রীজ পার হয়ে রাবার কারখানায় পৌঁছান তিনি। সেখান থেকে সাপ্তাহিক বেতন সংগ্রহ করেন। যাওয়ার সময় খেয়াল করেন চারিদিক লোকে লোকারণ্য। জানতে পারেন সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছে। যার কারণে সাধারণ ছাত্ররা দাবি আদায়ে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। তাই সাবধানে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চালাচল করতে থাকেন তিনি। চারিদিকে ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে খুনি হাসিনার ঘাতক নরপিশাচ পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী গুলি ছুড়তে থাকে।

পুলিশ নাকি জনগণের মিত্র। অথচ সেদিন নিজের বিবেক, দেশ, ও পোশাকের সম্মানের সাথে গাদ্দারি করে তারা। সারা দেশে এক নাগাড়ে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, ছররা গুলি চালায় স্বৈরাচারী হাসিনার পালিত গুন্ডা সদৃশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা করে ছাত্র-জনতাকে হয়রানি শুরু করে তারা। একপর্যায়ে হাসিনার মদদ পেয়ে হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালায় ঘাতক র‍্যাব। টহলের নামে বিজিবি বাহিনী সাধারণ মানুষদেরকে হত্যা করে। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র ও রাইফেল নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এ যেন মানুষ নামের রক্তখেকো হায়েনার দল। ভয়ভীতি দেখিয়ে ছাত্রদেরকে ছত্রভঙ্গ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি খুনি হাসিনা ও তার দলবল।

বারবার তার হাত ধরে ইমন বলতে থাকে 'আমাকে বাঁচান ভাই।'

সেদিন পুলিশের গুলিতে রায়ের বাগ ফুট ওভার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকা যেন মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে। ভয়ে গা শিউরে ওঠে ইমনের। সন্ধ্যা সাতটা, জোর পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। হঠাৎ হাসিনার লেলিয়ে দেয়া পুলিশ সদস্যের একটি বুলেট শহীদের বুকে এসে আঘাত করে। মুহূর্তেই রক্তে ভেসে যায় তার শরীর। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ইমন। প্রচণ্ড আওয়াজ করে বলতে থাকে 'আমাকে বাঁচান, ভাই'। ছাত্ররা ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে ইমনের বাল্য বন্ধু সজিব (২৫)। দুজনে একই কারখানায় কাজ করেন। ভাই সমতুল্য বন্ধুকে দ্রুত সিএনজিতে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান তিনি। বারবার তার হাত ধরে ইমন বলতে থাকে 'আমাকে বাঁচা ভাই।' দ্রুত তাকে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। অক্সিজেন দেয়ার পরও ছটফট করতে থাকে ইমন। কিছুক্ষণ পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঘাতকের গুলিতে মাত্র ২৫ বছর বয়সে ঝরে যায় এক সম্ভাবনাময় তরুণের জীবন। তার মৃত্যুতে মাতৃগর্ভে থাকা অনাগত সন্তান ও চার বছরের ইরফান চিরদিনের জন্য এতিম হয়ে যায়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে বিধবা হয় মুলছুমা আক্তার। লাশ নিয়েও বাধে আপত্তি। পুলিশ ইমনের লাশ দিতে অস্বীকার করে। স্বামীর লাশ নিতে অনেক অনুনয়-বিনয় ও হাত জোড় করে মুলছুমা আক্তার। থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে-পায়ে ধরে শহীদ জননী। একপর্যায়ে পুলিশ শহীদের লাশ ফেরত দেয়। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও মায়ের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। অবশেষে মাতুয়াইল দোতালা মসজিদ প্রান্তরে ইমনের জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজা শেষে মাতুয়াইল কবরস্থানে শহীদ ইমনের লাশ চিরদিনের জন্য শায়িত করা হয়।

"আমার ছেলের একটা ভবিষ্যৎ আছে। তার জন্য কিছু একটা করতে হবে।"

বন্ধুর অনুভূতি:

শহীদের বাল্যবন্ধু সজিব বলেন- "আমার বন্ধু ইমন খুব ন্যায়পরায়ণ ছিল। কাজকর্মে ছিল খুবই সুশৃংখল। মহাজন তাকে খুব পছন্দ করত। কখনও একা থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না ইমন। তাকে কখনও সময় অপচয় করতে দেখিনি আমি। ছুটির দিনে বা ডিউটি শেষে রোজ অটো রিক্সা নিয়ে বের হত। বারবার বলত, 'আমার ছেলের একটা ভবিষ্যৎ আছে। তার জন্য কিছু একটা করতে হবে।' খুব ভাল মানুষ ছিল ইমন। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি। তাকে হারিয়ে আমার বুকটা এখন শুন্য। আল্লাহ তায়ালা আমার বন্ধুকে জান্নাত দান করুন। (আমিন)"

বসবাস করার মতো নিজস্ব এক খন্ড জমিও নেই শহীদ স্ত্রীর

কর্তার বিদায়ে করুণ পরিণতি

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন শহীদ ইমন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে চরম অর্থনৈতিক মন্দা। অবস্থা শোচনীয় দেখে বাধ্য হয়ে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী স্বল্প বেতনে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে চাকরি নিয়েছেন। ইমনের বড় দুই ভাই রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ইচ্ছে থাকলেও তাদের পক্ষে সংসারের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। শহীদ ইমন পরিবারকে স্বপ্ন দেখালেন ঠিকই, কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন করতে পারলেন না। মুহূর্তে তার তাজা প্রাণ কেড়ে নিল রক্ত চোষা পুলিশ বাহিনী। সন্তানের মৃত্যুতে নাতী ও পুত্রবধূকে নিয়ে যেন ঘোর বিপাকে পড়েছেন জোছনা বেগম। আবারও তার সংসারে নেমে এসেছে দৈন্যদশা। সদ্য এতিম হওয়া সন্তানদের ভবিষ্যত কিভাবে সুগম করবে তা জানেন না মুলছুমা আক্তার। বাড়িতে বৃদ্ধ মায়ের ঔষধ কেনার মতো টাকাও অবশিষ্ট নেই। তার ওপর বাড়তি ঋণের বোঝা। বাড়ি ভাড়ার চাপ। যেন স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার উপায়টুকু নেই। বসবাস করার মতো নিজস্ব এক খন্ড জমিও নেই শহীদ স্ত্রীর। যান্ত্রিক এই শহরে বর্তমানে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাস করছে ইমনের পরিবার।

ইরফান বারবার আব্বুর জন্য চিৎকার করে কাঁদে। বাবাকে কবর ভেঙ্গে উঠাতে চায় সে। মায়ের কাছে বায়না করে, বাবার মুখে চুমু খাবে এবং মাকে জানায়-**'একদিন বড় বস্তায় বাবাকে কবর থেকে তুলে আনবে সে।'**

কী মর্মান্তিক! কী হৃদয় বিদারক!

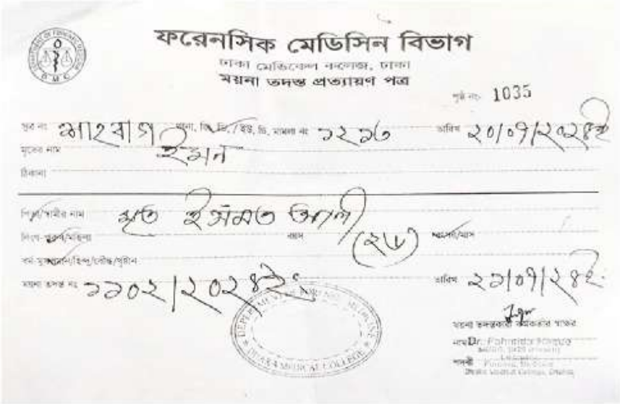
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
পৃষ্ঠা নং 1035
মৃতের নাম ইমন
ঠিকানা
তারিখ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: ইমন
পেশা	: রাবার কারখানার শ্রমিক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২ মে ১৯৯৯, ২৫ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: রায়ের বাগ, ফুট ওভার ব্রীজ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
দাফন করা হয়	: মাতুয়াইল কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: স্থায়ী নিবাস নেই
পিতা	: মরহুম মো: ইসমত আলী
মাতা	: মোছা জোছনা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: জায়গা জমি নেই
স্ত্রী	: মুলছুমা আক্তার, পেশা: গার্মেন্টস কর্মী, বয়স: ২৩ বছর

ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ

১. মো: ইরফান, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৪

২. সোহাগ, সম্পর্ক: বড় ভাই, বয়স: ৩৫, পেশা: রিক্সা চালক

৩. সজিব, সম্পর্ক: মেজ ভাই, বয়স: ৩২, পেশা: রিক্সা চালক

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।

২. শহীদ স্ত্রীর নিজস্ব কোনো ঘর নেই। তিনি এতিম সন্তানদের জন্য স্থায়ী একটি নিবাস চেয়েছেন।

৩. শহীদ সন্তানের লালন পালনে মাসিক ও এককালীন আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১৬-০৮-২০২৪

‘মা, আমি আছিতো, তোমার কোনো ভয় নেই।’

শহীদ মোঃ মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ০২৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৪

যেখানে রঙিন স্বপ্ন বড়োই বেমানান

বাল্যকাল থেকে লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী ছিল মোঃ মেহেদী হাসান। তাকে নিয়ে জনাব মেহের আলির আকাশ চুম্বী স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সন্তানকে একটি ভালো মানের স্কুলেও ভর্তি করিয়ে ছিলেন। তবে আর্থিক সংগতি না থাকায় তার স্বপ্ন যেন অংকুরেই ঝরে যায়। কয়েকমাস সন্তানের স্কুল ফিস বকেয়া পড়ে। নিরুপায় হয়ে ছুটে বেড়ান পারভিন বেগম। একপর্যায়ে আর্থিক দৈন্যতায় স্কুল ছাড়তে হয় শহীদ মেহেদীর। মাত্র তৃতীয় শ্রেণিতে এসে থেমে যায় তার স্কুল জীবন। সোনালী স্বপ্ন যেন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় মেহের আলীর। অতঃপর নয় বছর বয়সে একটি মেরামত কারখানায় কাজ শুরু করেন মেহেদী। যে হাতে এতদিন কলম ছিল সে হাতে আজ হাতুড়ী। গাড়ীর চাকা মেরামত করার শক্তি না থাকলেও থেমে যায়নি সে। পরিবারের মুখে দু-মুঠো খাবার তুলে দিতে যেন চির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ কুতুবখালি, বড় মাদরাসা সংলগ্ন এলাকায় পরিবারের সাথে বসবাস ছিল মেহেদীর। তার বাবা একজন অস্থায়ী পরিচ্ছন্ন কর্মী। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় নামমাত্র ৯০০০ টাকা বেতনে ময়লার গাড়ী চালান তিনি।

সুখ-দুঃখের যোগফল

ধীরে ধীরে বড় হন মেহেদী। পরিবারের দায়িত্বও বুঝে নিতে শুরু করেণ। মা-বাবা, দুই ভাই রমজান ও ইয়াসিন, একমাত্র বোন শ্রাবণী, নানা এবং দাদীকে নিয়ে বেশ বড় একটি পরিবার তাদের। সারাদিন পুরাতন গাড়ির মেরামত কারখানায় কাজ করে বাসায় আসেন শহীদ মেহেদী। সামান্য সময় হাতে থাকলেও তা নষ্ট হতে দেন না। বাবার ময়লার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মনে মনে ভাবেন, সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারলে প্যারালাইসিস নানার জন্য ঔষধ কিনতে পারবেন। এই ভঙ্গুর পরিবারের হাল ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন মেহেদী। তিন বছর আগেও মেহেদীর মা গৃহ কর্মীর কাজ করতেন। ডায়াবেটিস, বাত ব্যথায় জর্জরিত হয়ে কাজ ছাড়তে হয়েছে তাকে।

জীবন যেন কাটছে বেশ

মেহেদীর বাবা সারাক্ষণ হতাশায় ডুবে থাকেন। একদিকে সামান্য উপার্জন অন্যদিকে পরিবারে বাড়তি সদস্য সংখ্যা। যার ফলে সন্তানদের মুখে তিনবেলা খাবার জোগান দিতে পারেন না তিনি। অভাবের তাড়নায় অনেক আগে পৈতৃক ভিটে মাটি বিক্রি করেছেন। বর্তমানে স্ব-পরিবারে ২২৬ দক্ষিণ কুতুবখালী বাইতুল আমান রোডে বসবাস করছেন তিনি। তবে যেখানে তারা আছেন সেখানে কোনো সুস্থ মানুষ বসবাস করতে পারে না। সারাক্ষণ দেয়ালের নোনা-চুন খসে পড়তে থাকে। মেঝে থেকে ময়লা পানি নির্গত হয় অবিরত। চারিদিকের দুর্গন্ধে যেন প্রাণ নাশ হওয়ার উপক্রম। তারপরও জীবন তাদের থেমে নেই। মেহেদীর বয়োবৃদ্ধ দাদী রোজ আড়তের পড়ে থাকা সবজী কুড়াতে যান। যা দিয়ে সংসারের দশা না কাটলেও জীবন যেন কাটছে বেশ!

অনন্তকালের যাত্রা

শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০২৪,দেশে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবী ওঠে। সারাদেশে ছাত্র জনতার ঢল নামে। মুখে মুখে আন্দোলিত হয় স্বৈরাচারের পতনধ্বনি। পরিবারের বাঁধা মাড়িয়ে পরপর দুইদিন আন্দোলনে যোগ দেন মেহেদী। অতঃপর তার বাবা বিষয়টি জানতে পারলে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেন।

'যে আমাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে তার লাশ আমরা দেব না।'

তারপরও মেহেদী নাছোড়বান্দা। বারবার মাকে জানান-ছাত্র ভাইদেরকে পানি খাওয়াতে যাব। তার মা রাজী হন নাই। বাধ্য হয়ে ঘরবন্দী করে রাখার চেষ্টা করেন তার বাবা। তারপরও থামিয়ে রাখা যায়না শহীদ মেহেদীকে। তিনি এই আন্দোলনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা অন্যায়ের

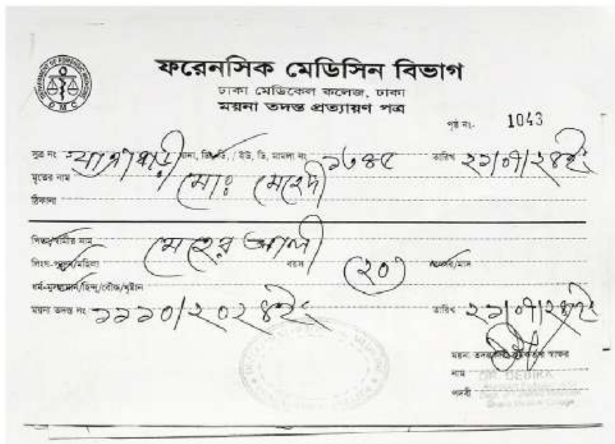

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যয়ণ পত্র

পৃষ্ঠা নং- 1043

মৃতের নাম: মোঃ মেহেদী

পিতা/স্বামীর নাম: মেহের আলী

বয়স: ২০

বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার এই অনুভূতি সার্বজনীন। অবশেষে ছাত্র-জনতাকে পানি খাওয়াতে বের হন মেহেদী। ধীরে ধীরে কুতুবখালী পকেট গেটের দিকে অগ্রসর হন। চারিদিকে পুলিশ ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতারা ব্যাপক গুলি ছুড়তে থাকে। বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা। সময় 'আনুমানিক সাতটা।' আচমকা ঘাতকের কয়েকটি গুলি মেহেদীর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। একটি গুলি বুকের বাম পাশ এবং দুইটি গুলি পেট ভেদ করে বের হয়ে যায়। মুহূর্তেই নিথর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শহীদের বন্ধুদ্বয় নয়ন ও হৃদয় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। জরুরী বিভাগে পৌঁছাতে পৌছাতে ঘড়ির কাটা আটটা-পাঁচ। সেখানকার

কর্তব্যরত চিকিৎসক শহীদের নিথর দেহে দ্রুত হৃৎস্পন্দন ও অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করে জানায়-"আপনাদের রোগী আর বেঁচে নেই।" তবে লাশ বাসায় আনতে বাঁধে আপত্তি। পুলিশের রোষানলে পড়েন তারা। পুলিশ জানায়-"যে আমাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে তার লাশ আমরা দেব না"। অনেক অনুনয় বিনয় করে অবশেষে শহীদের লাশ বাড়িতে আনতে সক্ষম হয়। জানাজা শেষে পরবর্তীতে শহীদ মেহেদীকে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়। শোকের মাতমে ভাসে পুরো পরিবার। আর বিয়োগান্ত এ-অধ্যায়ের শুরুতো সেখান থেকেই!

শহীদের পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র

সামান্য সে পাথেয়'র আশায়

বেদনাকাতর অনুভূতি

মেহেদীর শাহাদাতে ফলে তার বাবা নিরুপায় হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত মেজ ছেলে রমজানের স্কুল জীবন থামিয়ে দেন। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে আদরের সন্তানকে কারখানায় পাঠান তিনি। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে যেন সব হারিয়েছে পরিবারটি। শহীদ মেহেদীর কথা মনে পড়তেই দুচোখ ভিজে ওঠে মেহের আলীর। মেরুদণ্ডের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে আবারও ময়লার ভ্যান নিয়ে বেড়িয়ে পড়েন সামান্য উপার্জনের আশায়। আর্থিক টানাপোড়েনের হিসেব আর কিভাবে কষবে শহীদের দুঃখিনী মা! যেন সর্বদা তার কানে একটি কণ্ঠ ভেসে আসে- 'মা, আমি আছিতো, তোমার কোনো ভয় নেই।' হয়তো এই বাক্যটি চিরদিন পরিবারের কাছে স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রইবে।

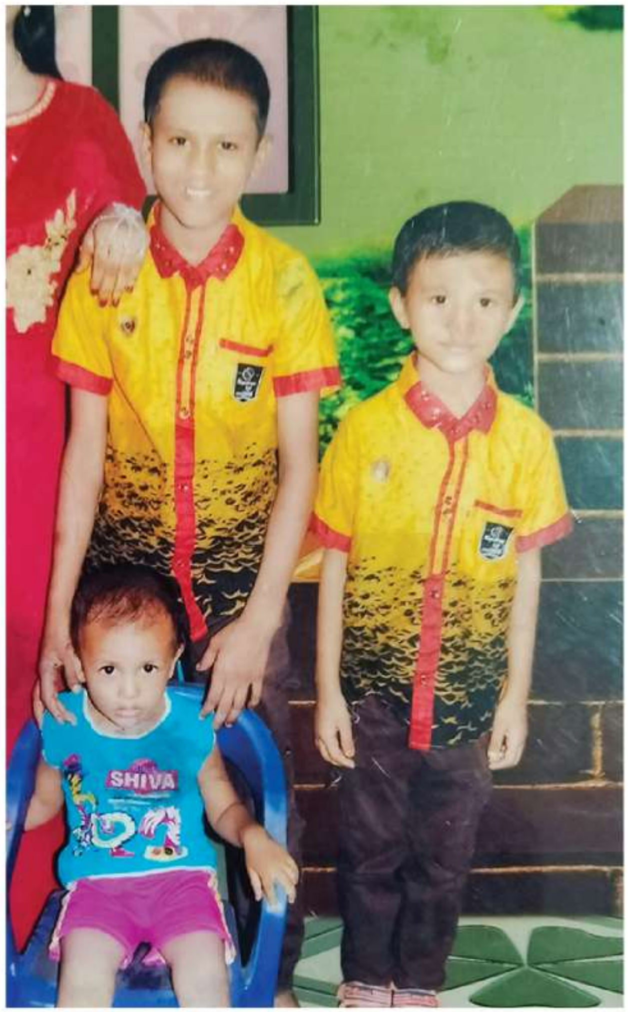

শহীদের মামা বলেন- "মেহেদীর সাথে যখন দেখা হত, সবসময় আমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলত। নামাজের সময় হলে মসজিদে যেতে বিলম্ব করত না। কারখানার সবাই মেহেদীকে অনেক পছন্দ করত। আফসোস! আমার ভালোবাসার ভাগ্নের জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যেত না মেহেদী। একবার জোর করে আমার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। এতটা লাজুক ছিল আমার ভাগ্নে, যে মামীর দিকে তাকিয়েও কথা বলেনি।"

শহীদের বন্ধু বলেন- "আমরা অবসরে একসাথে আড্ডা দিতাম। চলাফেরা করতাম। কিন্তু কখনও অন্যায় কাজে মেহেদী আমাদেরকে সাপোর্ট করত না। ও খুব শান্ত স্বভাবের এবং ভালো ছেলে ছিল। আমি সবসময় আমার বন্ধুকে মিস করব।"

ছোট ভাইয়ের স্কুল আইডি

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: মেহেদী হাসান
পেশা	: গাড়ির চাকা মেরামত কারখানার শ্রমিক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৪ জুলাই ২০০৭, ১৭ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: কুতুবখালী পকেট গেট, যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: জুরাইন কবরস্থান
কবরের লোকেশন	: 23°42'19.7"N 90°26'21.2"E
স্থায়ী ঠিকানা	: স্থায়ী নিবাস নেই
পিতা	: মেহের আলী
মাতা	: মোসা: পারভীন বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: জায়গা জমি নেই
ভাইবোনের বিবরণ	: ১. রমজান, সম্পর্ক: ভাই, বয়স: ১৩ পেশা: শ্রমিক : ২. ইয়াসিন, সম্পর্ক: ভাই, বয়স: ০৯, পেশা: ছাত্র প্রতিষ্ঠান: জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া মাদ্রাসা : ৩. শ্রাবণী আক্তার, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ২২ বছর
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদ পরিবারে স্থায়ী নিবাস নেই। পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন । : ২. শহীদের পিতার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে । : ৩. শহীদের ছোট ভাইকে লেখা পড়ার খরচ জোগানে সহযোগীতা করা যেতে পারে ।
তথ্য সংগ্রহের তারিখ	**: ১৬-০৮-২০২৪**

"ছেলের জন্মদিনে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া হলো না সোহেলের"

শহীদ মো: সোহেল

ক্রমিক : ০২৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৫

শহীদের পরিচয়

সুরুজ মিয়া ও হোসনে আরা বেগম সংসার শুরু করেন ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দুর্গাপুর গ্রামে। সেখানেই জন্ম হয় অকুতোভয় বীর মুক্তিকামী সন্তান মো: সোহেলের। পরিচয়পত্র অনুযায়ী এই মহান ব্যক্তির জন্ম ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে। সহোদরদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। ছোট ভাই জুয়েলকে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক ত্যাগ শিকার করেছেন তিনি। দুই বোন আমেনা ও কুলসুমের বিয়ে আয়োজন করেছেন। দায়িত্বের অবকাঠামো থেকে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নিষ্ঠাবান ও সৎ গুণের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। নৈতিকতায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অনন্য! তবে শৈশব থেকে পরিবারের অর্থাভাবে বড় হয়েছেন শহীদ সোহেল। যে কারণে লেখাপড়ায় পটু হলেও থামতে হয়েছে মাধ্যমিকেই।

সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে বর্তানোর পর পেশা হিসেবে বিকল মুঠোফোনকে মেরামত করার দীক্ষা অর্জন করেন তিনি। শুরু হয় উদ্যমী এক তরুণের নতুন জীবন নির্বাহ । সততা এবং কর্মদক্ষতা দিয়ে দ্রুত সুখ্যাতি লাভ করেন। শহীদের পিতা সুরুজ মিয়া পেশায় দিনমজুর ছিলেন। নতুন জীবনের আশায় স্ব-পরিবারে ময়মনসিংহ ছেড়ে রাজধানীর কদমতলী এলাকায় আগমন করেন। অতঃপর শুরু হয় সোহেলের বিরামহীন জীবন। শনির আখড়া আরএস শপিংমল সেন্টারের ৪র্থ তলায় ৪১ নম্বর দোকানটি ভাড়া নেন। ইলেকট্রিক ডিভাইস এবং মোবাইল সার্ভিসিং সেবা শুরু করেন।

শহীদের জীবন ছিল খুবই সাধারণ। যে কোনো মানুষের সাথে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যেত তার। অত্যন্ত আন্তরিক ও মিশুক হওয়ার কারণে কাস্টমারদের সাথে দ্রুত সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে সোহেলের। তার কাজের সুনামের কারণে দোকানে যেন ভিড় লেগেই থাকত। ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিজ হাতে মোবাইল টেকনিশিয়ান বানিয়েছিলেন তাকে। সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের বৈবাহিক জীবন বিলম্বে শুরু করেন মো: সোহেল। ২০১৮ সালে আয়েশা আক্তার কুহেলির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। কিছুদিন পর তাদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় একমাত্র পুত্র হযরত বিল্লাল আনাস। সন্তানের আগমনে প্রস্ফুটিত হয় যাবতীয় সুখ। পরিবার জুড়ে উৎসব বিরাজ করে। এ যেন মহা খুশীর ধুম!

পিশাচ দেখেছেন? দেখেননি?
দেখেছেন বোধহয়, লক্ষ করেননি।

হঠাৎ দেশে আন্দোলন

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এক মাসের মাথায় তারা ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটায়। তৎকালীন সরকার প্রধান খুনি হাসিনার নেতৃত্বে ব্যাপক সহিংসতা চালায় ঘাতক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। অগণিত ছাত্র-জনতার মৃত্যু এবং প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী হাসিনা সোমবার ৫ আগস্ট ২০২৪ পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

প্রথমত ছাত্রদের বিক্ষোভ শুরু হয় সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি নিয়ে, কিন্তু সরকার সহিংসতা দিয়ে ছাত্রদের দমন করার চেষ্টা করলে সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যোগ দেয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, 'কোটা বৈষম্য মেধাভিত্তিক নিয়োগের জন্য ক্ষতিকর। কোটাকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে হবে।' দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে আবস্থান কর্মসূচী ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠন।

যার প্রেক্ষিতে ১৪ জুলাই ২০২৪ এক সংবাদ সম্মেলনে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী হাসিনা মন্তব্য করে, **"মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তাদের এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে?"** প্রধানমন্ত্রীর এই বিরূপ বক্তব্যের পর, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং শেখ হাসিনার ওই মন্তব্যকে তারা তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে করে। শিক্ষার্থীরা গভীর রাতে মিছিল করে স্লোগান দিতে থাকে, **"তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!"** এবং **"চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার।"** একপর্যায়ে **বাংলা ব্লকেড, কমপ্লিট শাটডাউন** বা **সর্বাত্মক অবরোধ, অসহযোগ কর্মসূচি** পালনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে হাসিনা সরকারের পদত্যাগে এক দফা দাবি ঘোষিত হয়। খুনি হাসিনার নির্দেশে দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার একটি মেট্রোরেল স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং গণপরিবহন কর্তৃপক্ষের ভবন ভাঙচুর করা হয়। ঘাতক পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে ।

মো. সোহেল (মোবাইল মেকানিক)
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
ঢাকার শনির আখড়ায় ২০ জুলাই
গুলিতে নিহত

পিশাচ দেখেছেন? দেখেননি? দেখেছেন বোধহয়, লক্ষ করেননি। একজন জলজ্যান্ত মানুষকে কতগুলো মানুষরূপী দানব পিটিয়ে, গুলি করে মেরে ফেলছে, পৈশাচিক উল্লাস করছে। এমন দৃশ্য দেখেছেন? দেখেননি? সামান্য মতের অমিলের কারণে, ভিন্নমতাবলম্বী হলে, অভিযুক্ত মানুষটিকে সুযোগ পেলেই 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের পিশাচগুলো পিটিয়ে মেরে ফেলা যেন নিজেদের অধিকার মনে করত ।

তেমনি গত ২০ জুলাই, শনিবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে নরপিশাচ ও ঘাতক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ধাওয়া-পালটা ধাওয়া, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, ছররা গুলি, হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ, গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা দায়ের করে আন্দোলনকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়। এদিন উত্তাল ছিল রাজধানী ঢাকা।

'কতটা হিংস্র ওরা, মানুষ মানুষকে কিভাবে মারতে পারে।'

আন্দোলনে যোগদানের বহিঃপ্রকাশ

২৪ এর শহীদ মো: সোহেল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য দ্রুত দোকান বন্ধ করে। রক্তাক্ত প্রান্তর দেখে ভয়ে জড়সড় হয় তার ভাই জুয়েল। ছোট ভাইকে বাড়ি পাঠিয়ে শ্বশুর বাড়ি যান তিনি। স্ত্রীকে জানান-"আন্দোলনে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।" আয়েশা আক্তার নিষেধ করেন। হালকা ধমক দিয়ে বলে- "তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি আর আনাস কি নিয়ে বাঁচব?" তবুও যেন মন মানে না সোহেলের। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বিক্ষোভ দেখতে বাসার ছাদে ওঠেন তিনি। চারিদিকে লাশের স্তুপ দেখে স্ত্রী কে বলে- "কতটা হিংস্র ওরা, মানুষ মানুষকে কিভাবে মারতে পারে।"

'আপনার স্বামী আর নেই, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে
অনন্তের পথে পাড়ি জমিয়েছেন।'

শাহাদতের মাহেন্দ্রক্ষণ

২০ জুলাই, ২০২৪ বিকাল সাড়ে পাঁচটা। বাসার সামনে সংঘর্ষ হচ্ছে শুনে নিচে নেমে আসেন সোহেল ও বাড়ির মালিক। মুদি দোকানের কাছে গিয়ে পরিস্থিতি দেখার চেষ্টা করেন। হঠাৎ বর্ণমালা স্কুলের উপর থেকে ঘাতক পুলিশের একটি গুলি সোহেলের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। বাড়ির মালিক সোহেলের স্ত্রীকে ডাক দিয়ে জানান- "তোমার স্বামীর বুকে গুলি লেগেছে"। শহীদ পত্নী দৌড়ে এসে স্থানীয় প্রতিবেশীদের সাহায্যে সোহেলকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন।

দ্রুত কাজলা অনাবিল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঘড়িতে তখন সাতটা ত্রিশ। ঢামেক অভিমুখী হন শহীদ স্ত্রী। কাজলা থেকে হাসপাতালের পথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নিরবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বীর সেনানী দেশ প্রেমিক মো: সোহেল। স্বামীকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরেন আয়েশা আক্তার

কুহেলি। তবুও হাসপাতালের দিকে ছুটে যান তিনি। অতঃপর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পালস পরিমাপ করে জানায়- "আপনার স্বামী আর নেই, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে অনন্তের পথে পাড়ি জমিয়েছেন।" এ কথা শোনার সাথে সাথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন আয়েশা আক্তার। যেন অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

অচেতন পুত্রবধূ ও শহীদ পুত্রকে বাসায় নিয়ে আসেন জনাব সুরুজ মিয়া। হোসনে আরা বেগম ছেলের শোকে বিলাপ করতে থাকেন। বারবার অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম হন তিনি। বাবার গলা জরিয়ে ধরে আনাস। ছোট্ট হাতের পরশে রক্ত মুছতে চেষ্টা করে সে। বুঝতে পারে না যে তার বাবা চিরদিনের জন্য ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছে। সন্তানের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায় শহীদ পিতা। সেখানেই গোসল দেওয়া হয় তাকে। মসজিদ প্রাঙ্গণে শতশত মানুষের উপস্থিতিতে জানাজা সম্পন্ন হয়। নিজ হাতে শহীদ পুত্রকে ময়মনসিংহের ত্রিশালস্থ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন সুরুজ মিয়া। মাটি দেয়ার সময় উচ্চারণ করেন-"বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি"। অর্থাৎ, আল্লাহর নামের সহিত এবং আল্লাহর রাস্তায় এবং রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিয়মের উপর সন্তানকে দাফন করছি।

কি মর্মান্তিক অনুভূতি! এ যেন বিষাদে মোড়ানো জীবন। ঘাতকের একটি বুলেট সকল স্বপ্নকে বিলীন করে দিল। মুহূর্তে বিধবা, এতিম, সন্তানহারা হয়ে গেল শহীদ সোহেলের প্রিয়জনেরা।

যন্ত্রনাময় অনুভূতি

'ভাইয়ার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বহু কাস্টমার বাসায় এসে কান্নাকাটি করেন।'

শহীদ পিতা বলেন,"সোহেল গুলিবিদ্ধ হওয়ার দেড় ঘণ্টা আগে এক বস্তা চাল, আম ও কাঁঠাল কিনে বাসায় দিয়ে যায়।" যাওয়ার সময় বলে যায়-"আব্বা চতুর্দিকে ঝামেলা হচ্ছে, বাইরে বের হয়েন না। আমাকে সতর্ক করে আমার ছেলে চলে গেল। আমি সন্তান হত্যার বিচার চাই"। শহীদের শ্বশুর মোঃ কাশেম বলেন- "আমাদের জামাই-শশুরের সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। একে অপরকে খুব ভালো বুঝতাম। আমার পরিবারের জন্য অনেক কিছু করেছে সোহেল। এক কথায় সে আমার জামাই নয়, আমার ছেলে ছিল।" শহীদের সহোদর জুয়েল বলেন, "ভাইয়ার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বহু কাস্টমার বাসায় এসে কান্নাকাটি করেন।"

বিয়োগান্ত ঘটনা

শহীদ পুত্র হযরত বিল্লাল আনাসের জন্মদিন ছিল ২৯ জুলাই। শহীদ সোহেল তার স্ত্রীকে বলেছিলেন,"ছেলের জন্মদিনে আমরা একসাথে ঘুরতে যাব।" একমাত্র সন্তানের দুরন্তপনা দেখে আদর করে টাইগার ডাকতেন তার বাবা। একমাত্র ছেলের বিশেষ এই দিনটি উদযাপনের কতই না পরিকল্পনা ছিল সোহেলের।

দীনতা এল ফিরে

সোহেলের বাবা জনাব সুরুজ হাওলাদার (৬২) চোখের সমস্যায় ভুগছেন। মা হোসনে আরা বেগমের (৫৫) দুচোখে ছানি পড়েছে। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাচল করতে পারেন না। শহীদের পারিবারিক অবস্থা ভালো না থাকায়, তার স্ত্রী আয়েশা আক্তার কুহেলি (২৭) বর্তমানে বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। শহীদের ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। ঋণ পরিশোধ করতে তার স্ত্রী দোকানটি বিক্রি করেছেন। তবুও ঋণ সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করতে পারেননি। পরিবারের আর্থিক অবনতি দেখে ঋণ মউকুফ করেছেন দেনা দাতারা।

"চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রী বেশে বাঙালিকে সর্বদা চলার প্রেরণা জোগান ২৪ এর শহীদগণ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
মোঃ সোহেল
Name
Date of Birth 15 Dec 1979
NID No 100 436 8237

'আমি পুনরায় আকাশখানিরে চেয়ে দেখি নক্ষত্রপুঞ্জের মৌনমেলা,

মনে হয় এঁকেবেঁকে উঠে যাবে আমাদের ছিন্নভিন্ন পরাস্ত জীবন,

অবশেষে বহুদূরে দিগন্তের দিকচিহ্ন মুছে দিয়ে

ডাক দেবে আমরাই জয়ী।'

মা-বাবাকে সতর্ক করে নিজেই লাশ সোহেল

সাইফুল আলম তুহিন, ত্রিশাল

মো. সোহেল মিয়া

ঢাকার শনির আখড়ায় আরএস টাওয়ার মার্কেটে সোহেল টেলিকম নামে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের একটি দোকান চালাতেন মো. সোহেল মিয়া (৩৫)। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকতেন যাত্রাবাড়ী কদমতলী থানার ধনিয়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায়। আর সোহেলের মা-বাবা থাকতেন এর এক-দেড় কিলোমিটার দূরে মিরাজনগরে।

২০ জুলাই চাল ও আম-কাঁঠাল কিনে মা-বাবার বাসায় দিতে যান সোহেল। আসার সময় তাঁদের গোলাগুলির মধ্যে বাইরে বের না হওয়ার জন্য সতর্ক করে আসেন। এর দেড় ঘণ্টা পর নিজ বাসার নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান সোহেলই।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার সময় গোলাগুলির মধ্যে পড়ে নিহত হন সোহেল। পরে ২২ জুলাই সকালে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের অলহরী দুর্গাপুর গ্রামের বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়।

পরিবারের উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে হারিয়ে বিপাকে পড়েছে সোহেলের পরিবার। বৃদ্ধ মা-বাবার পাশাপাশি স্ত্রী-সন্তান ও ভাইবোনদের দেখভাল করতেন সোহেল।

গত শুক্রবার অলহরী দুর্গাপুর গ্রামে সোহেলদের বাড়িতে গিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মা-বাবাকে সতর্ক করে নিজেই লাশ সোহেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখা যায়, ছেলেকে হারিয়ে সোহেলের মা হাসনা আরা বেগম তখনো থেমে থেমে আহাজারি করছিলেন। বিলাপ করতে করতে তিনি বলেন, 'ছেলের দেয়া আম, কাঁঠাল খাওনের আগেই ছেলের গুলি খাওয়ার খবর পাই। আমার সোহেলের তো কোনো অপরাধ ছিল না। তাইলে ক্যান তারে মারল? তার ছুডু বাচ্চাডারে কেডা দেখব, তার ভবিষ্যৎ কী? আমাদের সাজানো সংসারডা তছনছ অইয়া গেল।'

সোহেলের বাবা সুরুজ হাওলাদার ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'আন্দোলনের কারণে ঝামেলায় মার্কেট বন্ধ। সবাই ভয়েভয়ে। আমরা স্বামী-স্ত্রী ছেলের বাসা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে মিরাজনগরে বাসা নিয়ে থাকি। বাসাভাড়াসহ আমাদের যাবতীয় খরচ সোহেলই বহন করে। ও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘণ্টা দেড়েক আগে ২৫ কেজির এক বস্তা চাল, আম ও কাঁঠাল কিনে বাসায় দিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় বলছে "আব্বা চতুর্দিকে গেঞ্জাম; বাইরে বের অইয়েন না, বাসায়ই থাইকেন। কিছু লাগলে আমারে কইয়েন।" তখন তার মা আবার কইল, বাবা সোহেল, আম আনছ, দুধ আছে ঘরে; বিকালে আইয়া পইরো। আম দিয়া দুধ দিয়া খাইবা। অথচ আমাকে সতর্ক করে যাওয়ার ঘণ্টা দেড়েক পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে তারই গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পাই। তার দেয়া আম, কাঁঠাল এখন ঘরে পচতেছে।'

সুরুজ হাওলাদার জানান, তাঁদের বাসা থেকে নিজ বাসায় ফিরে খাওয়াদাওয়া করে বাড়িওয়ালা ও ছোট ভাইসহ নিচে নেমেছিলেন সোহেল। একটু এগিয়ে দেখে গন্ডগোল হচ্ছে। তখন বাড়িওয়ালা আবার বাসায় ফিরে যান। সোহেল একটু পরে বাসায় ফেরার কথা বলে গলির মাথায় মুদিদোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সময়ই গুলি লেগে তাঁর পেট ভেদ করে দোকানে থাকা ফ্রিজে লেগেছে। পরে আশপাশের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সোহেলের হযরত বিল্লাল নামে সাড়ে তিন বছরের এক ছেলে রয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে সোহেলের স্ত্রী আয়েশা এখন পাগলপ্রায়।

স্বজনেরা জানান, অনেক আগে গ্রাম থেকে ঢাকামুখী হন সোহেলের বাবা সুরুজ হাওলাদার। ভাড়া বাসায় থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সন্তানদের বড় করেছেন তিনি। ভাসমান কাঁচামালের দোকান থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাজ করতেন। এখন বয়সের ভারে আর কিছু করতে পারেন না। বড় ছেলে সোহেলই তাঁদের যাবতীয় খরচ বহন করতেন। ছোট ছেলে জুয়েল বড় ভাইয়ের দোকানে থেকে সহযোগিতা ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ শিখছিলেন।

MD SHOHEL
MD SURUJ HAWLADAR

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যয়ন পত্র
1036
শাহবাগ ২২২৫ ২০।০৭।২৪ইং
সোহেল
মো: সুরুজ হাওলাদার (৬৫)
২১০৫/২০২৪ইং
২১।০৭।২৪ইং

মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাইবার ফরম

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: সোহেল
পেশা	: মোবাইল টেকনিশিয়ান ও ব্যবসা
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৯ , ৪৫ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭.৩০টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: দনিয়া পোষ্ট অফিসের কাছে, যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: পারিবারিক কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: দুর্গাপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
পিতা	: মো: সুরুজ মিয়া (৬২)
মাতা	: মোসা: হোসনে আরা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: সামান্য পরিমাণে বসতি জমি রয়েছে
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: ১. মো: হযরত বিল্লাল আনাস, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৪ বছর
	: ২. কুলসুম, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ২৫, (বিবাহিতা)
	: ৩. জুয়েল, সম্পর্ক: ছোট ভাই, বয়স: ২২, পেশা: পিকআপ চালক
	: ৪. আমেনা, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ২০, (বিবাহিতা)
স্ত্রী	: আয়েশা আক্তার কুহেলি, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ২৭, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচ এস সি (পাশ)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের একমাত্র ছেলে ও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতিপালন খরচ জোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের বাবাকে মুদি দোকান করে দেয়া যেতে পারে

৩. শহীদ পত্নীকে কোনো ব্যবসা বা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে উপকার হবে।

তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২১-০৮-২০২৪

শহীদ মো: আসিব মিয়া

ক্রমিক : ০২৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৬

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: আসিব মিয়া। পিতা জনাব আমজাদ হোসেন, মাতা ফজিলা খাতুন। আসিফ জন্মগ্রহণ করেন ১০ জুন ২০০৬ সালে শেরপুর জেলার কেরেংগা পাড়া গ্রামে। ইউনিয়ন: ৫নং রাম চন্দ্রপুর, থানা: নলিতাবাড়ি। আসিফের বর্তমান ঠিকানা ১৫/১ লাইন, বাসা-৬, মিরপুর ১১, থানা: পল্লবী, জেলা: ঢাকা। আসিব তার বাবার প্রথম সন্তান। তার আছে আরও ৩ বোন ১ ভাই। তিনি গার্মেন্টসের ঝুটের ব্যবসা করতেন। মা শেরপুরে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার কমপ্লিট শাট ডাউন চলাকালে ৫:৩০ টায় মিরপুর-১০ এ মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। রাত ৯:৪০ এ নিউরো সাইন্স হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ২০ জুলাই জানাজা শেষে গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়।

আসিবের শাহাদাত যাত্রা

জুলাই ২০২৪ চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন। তাদের কর্মসূচী ছিল ১৯ জুলাইয়ে কমপ্লিট শাট ডাউন । আসিব মিয়া একজন গার্মেন্টস কর্মী। শরীরে রক্ত প্রবাহে তার ছাত্রত্বের স্রোত। তিনি নেমে এলেন রাজপথে। ছাত্র জনতার সাথে দাঁড়িয়ে যান স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। আসিবরা ছিলেন মিরপুর-১০ ফায়ার সার্ভিসের পাশে। সকাল ১১ টা পর্যন্ত ছিল শান্তিপূর্ণ অবস্থান। ১১ টা থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। ১১ টার পরেই মারমুখী হয় পুলিশ। নিক্ষেপ করে শান্ত নিরীহ মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল। স্বৈরশাসকের হুকুমে পুলিশ গুলি ছোড়ে। পুলিশের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামী যুবলীগ।

মিরপুর মূল সড়ক থেকে ছাত্র জনতাকে হঠাতে পুলিশ ও যুবলীগের গুন্ডারা দিনভর টিয়ারশেল, গুলি ছোড়ে। বিকেল ৫.৩০ মিনিটে পুলিশ ও যুবলীগের ছোঁড়া গুলিতে আহত হন আসিফ মিয়া। গুলি লাগে আসিবের মাথার ডান পাশে। মারাত্মক আহত অবস্থায় ছাত্ররা তাকে দ্রুত ভর্তি করে আলোক হাসপাতালে। আসিব বাবাকে ফোন দিয়ে বলেন, " বাবা আমি এক্সিডেন্ট করেছি।" তার পিতা দ্রুত হাসপাতালে যান। আলোক হাসপাতাল থেকে তাকে রিক্সায় করে নিয়ে যান সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে তাকে মাথায় ব্যান্ডেজ করে নিয়ে যান নিউরো সাইন্স হাসপাতালে। নিউরো সাইন্স হাসপাতালের ডাক্তাররা উন্নত চিকিৎসার পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনো চেষ্টা আর কোনো চিকিৎসাই কাজে লাগেনি। আসিব মিয়া আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান দুনিয়া ছেড়ে। রাত প্রায় ৯:৩০ মিনিটে তিনি নিউরো সাইন্স হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। রেখে যান, তার বাবা মা, ৩ বোন ও ছোট এক ভাই। ১৯ জুলাই তিনি রেখে যান রক্তস্নাত এক বাংলাদেশ। পরদিন ২০ জুলাই জানাযা শেষে তাকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। তিনি শুয়ে আছেন নিজের জেলা শেরপুরে। শহীদের কবর কেরেংগা পাড়া ফুলপুর নিজ গ্রামে।

আসিবের বাবার বক্তব্য

এই বয়সেই আসিব সংসারের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তিত ছিলো। তার বাবা ঋণগ্রস্থ ছিলেন তাই আসিফ মাদ্রাসার লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। বাবার সাথে নেমে পড়েন কাজে। বাবার মতে তার ছেলে খুব ভালো ছিল। পড়া লেখাতেও মনযোগী ছিল। সংসারের অভাব উপলব্ধি করে সে কাজে লেগেছিলো। বাবার ৩ লক্ষ টাকার ঋন রয়েছে। ঋণ মুক্তির জন্যই ছেলে কাজ করত। পিতা-পুত্র মিলে মাসে আয় করত ৩০ হাজার টাকা। তিনি কখনও পিতার অবাধ্য হননি। কারও সাথে ঝগড়া-মারামারি করতেন না। ছোট থেকেই ছিলেন বুদ্ধিমান। দেশ নিয়েও তার ভাবনা ছিল।

'বাবা, তোমার মনের আশা পূরণ করতে পারলাম না, মাফ করে দিও'

Published : 27 Jul 2024, 10:44 AM
Updated : 27 Jul 2024, 12:59 PM

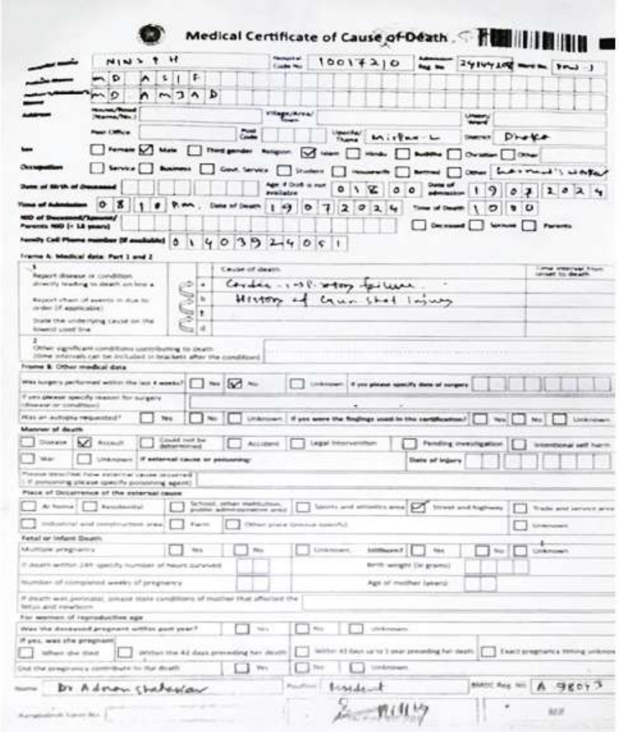

Medical Certificate of Cause of Death

MD ASIF

MD AMJAD

Mirpur-11 Dhaka

Cause of death

a Cardiac respiratory failure

b History of Gun shot injury

Dr Adnan Shahriar

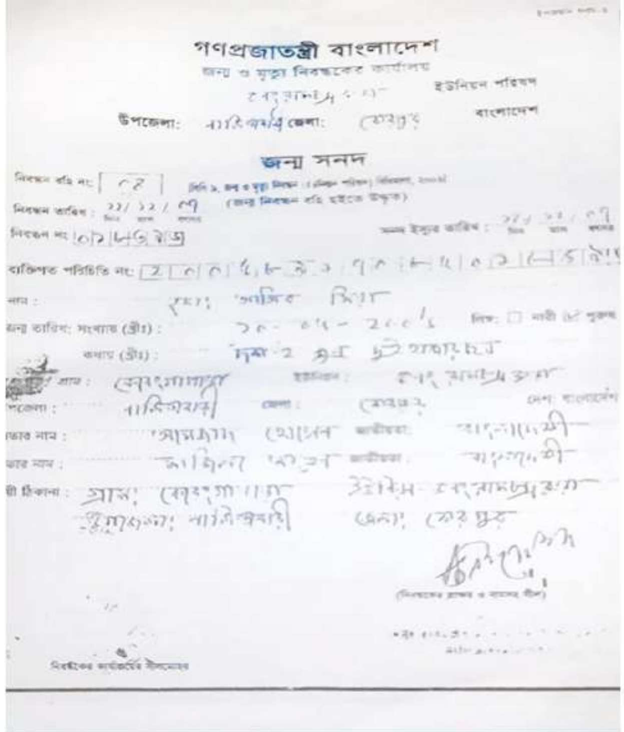

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: আসিব মিয়া
জন্ম	: ১০-০৬-২০০৬
শাহাদাত বরণ	: ১৯-০৭-২০২৪, রাত ৯.৪০টা
পিতা	: জনাব আমজাদ হোসেন
মাতা	: ফজিলা খাতুন
অন্যান্য সদস্য	: ৩ বোন, ১ ভাই
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-কেরেংগা পাড়া, ইউনিয়ন-৫নং রামচন্দ্র পুরণ কুরা, থানা-নলিতাবাড়ি, জেলা-শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ১৫/১ লাইন, বাসা-৬, মিরপুর-১১, থানা-পল্লবী, ঢাকা
বাবার পেশা	: ঝুটের ব্যবসা; আয়-২০ হাজার টাকা। উৎস ঝুটের ব্যবসা
মা	: গৃহিণী
আন্দোলনের চিত্র	: অবস্থান-১৯ জুলাই, মিরপুর-১০, গুলিবিদ্ধ হন মাথায়। আনুমানিক বিকাল-৫.৩০ প্রথম ভর্তি-আলোক হাসপাতালে, তারপর সোহরাওয়ার্দী সেখান থেকে নিউরোসায়েন্স
মৃত্যু	: ১৯ জুলাই রাত ৯:৩০ নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল
জানাজা	: ২০ জুলাই ২০২৪ দাফন-ঐদিনই, কবর-কেরেংগা পাড়া, ফুলপুর নিজগ্রাম

সম্ভাব্য প্রস্তাবনা

১. এককালীন অনুদান দিয়ে তাদের পাশে থাকা দরকার।
২. বাড়িঘর সংস্কার ও এক খণ্ড জমি দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৩. ভাই বোনদের শিক্ষাভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৪. প্রতি মাসে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ অনুদান যেতে পারে।
৫. তার পরিবারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।

-মেধাকে দমন করতে
মাথায় গুলি করেছে হত্যাকারীরা-

শহীদ মো: মাহাদী হাসান প্রান্ত

ক্রমিক : ০২৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৭

শহীদের পরিচয়

যার আগমনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল স্বজনরা, তিনি হলেন প্রান্ত। তার পুরো নাম শহীদ মো: মাহাদী হাসান প্রান্ত। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্ম তারিখ ১০ মে ২০০৬ সাল। শহীদ মাহাদী ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার কদমতলী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ মাহাদী পরিবারের ছোট ছেলে। তার পিতার নাম জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন। মাহাদীর বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবা কাপড়ের ব্যবসা করেন। শহীদ মাহাদী ছিলেন সরকারী তোলারাম কলেজের মেধাবী ছাত্র। তিনি বিজনেস স্টাডিজ বিভাগের এইচ এস সি ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের মেধাবী ও কর্মঠ শিক্ষার্থী। তিনি দাবা খেলায় ছিলেন প্রচণ্ড পারদর্শী ও অত্যন্ত মেধাবী এই মাহাদী শুধু পড়াশোনাই করতেন এমন নয়, তিনি এই ছোট্ট বয়সেই সংসারের হাল ধরতে চাইতেন। পিতা মাতার ছায়া হয়ে ছিলেন শহীদ মাহাদী।

শহীদ মাহাদী ছোটবেলা থেকেই ছিলেন খুবই মানবিক। তিনি পিতার থেকে হাত খরচ নিয়ে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন, কাউকে খাবার কিনে দিতেন। ছাত্র হলেও পকেটে ৫ টাকা থাকলেও তিনি তা দান করতেন আনন্দচিত্তে। তার ছিল অনেক বড় স্বপ্ন; ছিল সমাজকে নিয়ে ভাবনা। তিনি সবসময় পিতার কাজে সহায়তা করতেন।

শহীদ মাহাদীর শাহাদাতের ঘটনা

২০২৪ সালে কোটা সংস্কারের উদ্দেশ্যে দেশব্যাপি চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-জনতার শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে যায়। ১৬ জুলাই হতে ৫ আগস্ট ঝরেছে অসংখ্য প্রাণ। দেশে ১৪৪ ধারা জারি করে ইন্টারনেট বিচ্ছিন করে দেয় সরকার। এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় দেশ। মাহাদী এই আন্দোলনে মাজলুমের পক্ষে অবস্থান নেন ও আন্দোলন করেন। তিনি ১৯ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমাবেশে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর মতে শহীদ মাহাদী সেখানে সকলের সাথে স্লোগান দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটু দূরে অবস্থানরত পুলিশ সমাবেশের দিকে গুলিবর্ষন শুরু করে। সবাই এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। শিক্ষার্থীরা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। হঠাৎ ঘাতকের একটি গুলি প্রান্তর মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রান্ত'র বড় ভাইয়ের বন্ধু তপু প্রান্তকে উদ্ধার করতে যেয়ে দেখতে পান এটি তার বন্ধুর ভাই। প্রচন্ড গোলাগুলির ভেতরও তপু কিছু সহযোদ্ধার সাহায্যে প্রান্তকে উদ্ধার করেন এবং সাথে সাথে বড় ভাই মিরাজ হোসেনকে ফোন দিয়ে ঘটনা জানান এবং পাশ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। পরিবারের সবাই হাসপাতালে গিয়ে প্রান্তকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

মিরাজ হোসেন (শহীদের বড় ভাই): "আমার ভাই মানুষ হিসেবে খুব সাহায্যকারী ছিল। ৫ টাকা থাকলেও কাউকে না কাউকে দান করত। দাবা খেলতে খুব পছন্দ করত আমার ভাই। আব্বুর কাছে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা নিয়ে মানুষকে খাবার কিনে দিত । বয়স অনুযায়ী অনেক বড় চিন্তা ভাবনা করত শহীদ প্রান্ত। বাবাকে সবসময় সাহায্য করতে পছন্দ করত। আমরা একসাথে খেলাধুলা করতাম, নামাজে যেতাম। সবই আজ স্মৃতি। আমার ভাইকে আমি কোনোভাবেই ভুলতে পারছি না।"

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মাহাদী হাসান প্রান্তর বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। শহীদের বড় ভাই আছে, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি HSC এর পর আর পড়ালেখা করতে পারেননি। তিনি এখন ২৫ বছরের যুবক। তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে পরিবারের অভাব কিছুটা ঘুচবে। শহীদ পরিবার ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। বাসার মাসিক ভাড়া ১০ হাজার টাকা। তাদের নিজ জেলা মুন্সিগঞ্জ জেলায় শহীদের সামান্য পরিমাণ জমি আছে, তবে তা চাচাদের দখলে। মাতা গৃহিণী। পিতার মাসিক আয় প্রায় ২০ হাজার টাকা।

তার পিতা জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন (৫৬) নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত। অল্প মুনাফা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। তিনি অনেকদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছেন।

শহীদ পরিবারের তথ্য

শহীদের মাতা: শহীদ মাহাদীর ভাগ্যবতী মাতা জনাব শাহীনুর বেগম, বয়স ৩৫, পেশায় গৃহিণী।

শহীদের বড় ভাই: শহীদ মাহাদীর বড় ভাই জনাব মো: মেরাজ হোসেন। তিনি HSC পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এরপর আর পড়াশোনা সম্ভব হয়নি। শহীদের পিতা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে তাকে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়েছে।

খবর ৩

রোহান আর মাহাদীর স্বপ্ন থেমে গেল গুলিতে

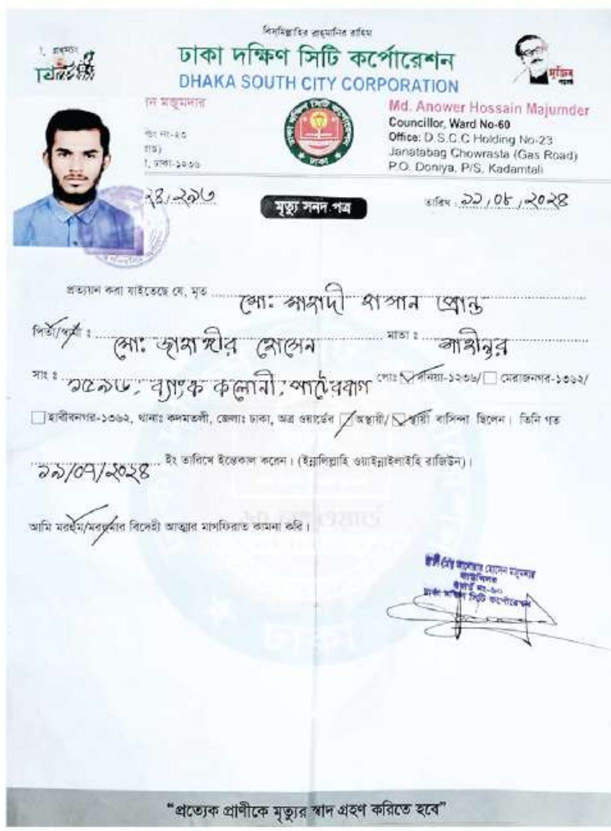

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

DHAKA SOUTH CITY CORPORATION

Md. Anower Hossain Majumder
Councillor, Ward No-60
Office: D.S.C.C Holding No-23
Janatabag Chowrasta (Gas Road)
P.O. Doniya, P/S. Kadamtali

মৃত্যু সনদ পত্র

তারিখ: ২২/০৮/২০২৪

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মৃত মো: মাহাদী হাসান প্রান্ত

পিতা/স্বামী: মো: জাহাঙ্গীর হোসেন মাতা: শাহীনুর

সাং: ১৫৯৬, ব্যাংক কলোনী, শনিরআখড়া পোঃ দনিয়া-১২৩৬/ মেরাজনগর-১৩৬২/ হাবীবনগর-১৩৬২, থানাঃ কদমতলী, জেলাঃ ঢাকা, অত্র ওয়ার্ডের অস্থায়ী/স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গত ১৯/০৭/২০২৪ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

আমি মরহুম/মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হবে"

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: মাহাদী হাসান প্রান্ত
জন্ম তারিখ	: ১০-০৫-২০০৬
জন্মস্থান	: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
পেশা	: ছাত্র
কলেজের নাম	: সরকারি তোলারাম কলেজ
নিজ জেলা	: মুন্সিগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বেপারিপাড়া, কুমারভোগ, ইউনিয়ন: লোহাগঞ্জ, থানা: লৌহগঞ্জ, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা:	: ১৭/১, ব্যাংক কলোনী, এলাকা: দক্ষিন দনিয়া; থানা: কেরাণীগঞ্জ; জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: জাহাঙ্গীর হোসেন
পিতার পেশা ও বয়স	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বয়স: ৫৬ বছর
মায়ের নাম	: শাহিনুর বেগম
মায়ের পেশা	: গৃহিনী, বয়স: ৩৫ বছর
মাসিক আয়	: ২০০০০/-
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৮
বর্তমান ঘর বাড়ির অবস্থা	: ভাড়া ঘর
ঘটনার স্থান	: রায়েরবাগ স্ট্যান্ড সংলগ্ন
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-০৭-২৪, বিকাল ৫টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯-০৭-২৪, বিকাল ৫টা, রায়েরবাগ স্ট্যান্ড সংলগ্ন
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ এলাকার মসজিদে তার জানাজার নামাজ হয় এবং এলাকার কবরস্থানেই তাকে দাফন করা হয়

“ যে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার নয় ”

শহীদ মো: আহমাদ আব্দুল্লাহ

ক্রমিক : ০২৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৮

শহীদের পরিচয়

মেধাবী ছাত্র আহমদ আব্দুল্লাহ ১৩ অক্টোবর ২০১০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার দারুল উলুম পাথরঘাটা মাদ্রাসায় কিতাব বিভাগে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলেন। তার পৈত্রিক নিবাস রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে। বর্তমানে শহীদ পরিবার যাত্রাবাড়ী থানার গোবিন্দপুর এলাকার হক টাওয়ারে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। তার পিতা মনিরুজ্জামান পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বছরের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী তার ব্যবসার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কখনও কসমেটিকসের ব্যবসা করেন তো আবার কখনও বা ফলের ব্যবসা। তার মা আমেনা বেগম দীর্ঘদিন ধরে স্পাইনাল সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়াও তার ছোট ভাই আজিজুল হক আনাসের হার্নিয়া ধরা পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ মতে চলতি বছরে অর্থাৎ ২০২৪ সালের মধ্যেই তার অপারেশন করাতে হবে।

আলেম হওয়ার স্বপ্ন আর পূরণ হলো না,

মাদ্রাসার একাডেমিক কাজ শেষ করে বাসায় ফেরা ছিল শহীদ আহমদ আব্দুল্লাহর নিয়মমাফিক রুটিন। কখনও বাবা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতেন আবার কখনও একাই বাসায় ফিরতেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮ জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার বাসায় ফেরার পথে যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল দেখতে পান। অন্যান্য ছাত্র-জনতার মতো প্রবল আগ্রহ অনুপ্রেরণা এবং আবেগ নিয়ে তিনি মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তখনও তিনি জানতেন না যে আর কিছুক্ষণ পরেই তার ওপর চলবে স্বৈরাচারী হায়না সরকারের ঘাতক পুলিশের পাশবিক নির্যাতন।

দিনব্যাপী ছাত্র জনতা এবং সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় পুলিশ সন্ধ্যার পরে পূর্ণ শক্তি নিয়ে সাজোয়া যান থেকে উপর্যুপরি সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলি ছুড়তে ছুড়তে সামনে অগ্রসর হয়। ছাত্রজনতা একে একে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। রাত ৯ টার দিকে হায়েনা পুলিশ বাহিনীর রাইফেলের দুটিগুলি ও শটগানের তিনটি গুলি আব্দুল্লাহর গায়ে লাগে। তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তিনি রাস্তায় পড়ে যান। আহত আব্দুল্লাহ নিজের শরীর বাঁচানোর চেষ্টা করেন কিন্তু হায়েনা পুলিশ বাহিনীর পাশবিক নির্যাতন এতটাই নির্মম ছিল যে তার ওপর দিয়ে তারা সাঁজোয়া যান চালিয়ে দেয়। এতে তার বাম হাত পিষ্ঠ হয়ে হাড় থেকে মাংস আলাদা হয়ে যায়।

তাজা রক্তে পিচ ঢালা রাস্তা রঞ্জিত হয়ে যায়। আহত অবস্থায় তাকে রাস্তার পাশেই অনাবিল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা এতটাই মর্মান্তিক ছিল যে তাকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

যে স্মৃতি অম্লান-

তার বাবা মনিরুজ্জামান যখন তার স্মৃতি বর্ণনা করছিলেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, "আমার বড় ছেলে আব্দুল্লাহ অনেক মেধাবী এবং শান্তশিষ্ট ছিল। খুবই নম্র-ভদ্র এবং চঞ্চল ছিল। যেকোনো কাজ খুব দ্রুত করতে পারত। তাকে নিয়ে আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন ছিল। একদিন বড় হয়ে আমার ছেলে দ্বীন এর খেদমত করবে, আমার সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। আমি এই পাশবিক হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।"

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: আহমাদ আব্দুল্লাহ, পেশা: ছাত্র
পিতা	: মনিরুজ্জামান, পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
মাতা	: আমেনা বেগম, পেশা : গৃহিনী
ভাই	: আজিজুল হক আনাস (৮), পেশা: ছাত্র, মাদরাসাতুল আবরার, ১ম শ্রেণি
বোন	: মারিয়াম (২০), গৃহিণী
জন্মতারিখ ও বয়স	: ১০ অক্টোবর ২০১০, ১৪ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪ , রাত : ৯:৩০, স্থান: কাজলা, যাত্রাবাড়ী
শহীদের কবরের স্থান	: মাতুয়াইল কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রসুলপুর, ইউনিয়ন: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর

"ঢাকাসহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে"

শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান জয়

ক্রমিক : ০২৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০২৯

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশ আজ ফ্যাসিবাদ মুক্ত। এই মুক্তি আনতে শহীদ হয়েছে কত শত মানুষ। শহীদ মোঃ মাহমুদুল হাসান জয় সে মিছিলেরই একজন। তার বাবা মিজানুর রহমান নাহিদ পেশায় একজন সিএনজি চালক। মা হাসি বেগম পেশায় একজন গার্মেন্টস কর্মী। মাহমুদুল হাসানের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়। তিনি ২০০৯ সালের ২১ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জুলিয়ার চর থানার ফরিদপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ৯ বছর তখন তার বাবা-মায়ের বৈবাহিক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি লালিত পালিত হন নানীর কাছে। লেখাপড়া করেন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। নানীর কাছে লালিত পালিত মাহমুদুল ছিলেন মামার তত্ত্বাবধানে। মায়ের দুঃখ লাঘবের জন্য তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। যোগ দেন একটি সেনেটারি দোকানে। মাসের শেষে বেতনের পুরো টাকা তিনি তুলে দিতেন মা ও নানীর হাতে। মাহমুদুল হাসান ছাত্র জীবনে ছিলেন মেধাবী।

ঢাকাসহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে: ৫ আগস্ট ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার কর্মসূচী লং মার্চ টু ঢাকা; যার উদ্দেশ্য ছিল গণভবন ঘেরাও করা। ঢাকার দিকে সারাদেশ থেকে আসতে থাকে জনতা। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ার চর থেকেও আসে জনস্রোত। ছাত্র জনতা মিছিলসহ যাত্রাবাড়ী পৌঁছে। দুপুরের দিকে হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী নিরীহ ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করে। মাহমুদুল মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়; পরে হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ঘটনার বিবরন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। **"লং মার্চ টু ঢাকা"** কর্মসূচী প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল ৬ আগস্ট। কিন্তু স্বৈরশাসক ফ্যাসিস্ট শাসক হাসিনা ৪ আগস্ট সারাদেশে শতাধিক মানুষ খুন করলে আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে তাদের কর্মসূচী একদিন এগিয়ে এনে ৫ আগস্ট নির্ধারণ করে। কিশোরগঞ্জ জেলার ভুলিয়ারচর থেকে আসে লং মার্চ মুখী মিছিল। আর এই মিছিলেই বন্ধুদের সাথে ঢাকায় আসেন মাহমুদুল হাসান জয়। তাদের মিছিল যাত্রাবাড়ি কাজলায় অবস্থান নেয়। পরিকল্পনা ছিল তারা সেখান থেকে গণভবন ঘেরাও করতে যাবে। কিন্তু যাত্রাবাড়ির পুলিশ তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। দুপুর ১ টার সময় ঘাতক পুলিশ বাহিনী ছাত্র-জনতার মিছিল উদ্দেশ্য করে আক্রমণ করে। মুহূর্মুহু গুলি ছুঁড়তে থাকে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় মাহমুদুল। গুলিতে তার মাথার মগজ বের হয়ে যায়।

যাত্রাবাড়িতে আসার আগেও আন্দোলনে প্রায়ই যেতেন মাহমুদুল। তার সঙ্গী ছিল মোরসালিন আহমেদ আলিফ। জয়ের শাহাদাতের দিনও আলিফ সাথে ছিলেন। গুলিবিদ্ধ মাহমুদকে আলিফ নিয়ে যান নিকটস্থ মদিনা হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চিকিৎসকদের পরামর্শে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলে; সেখানে তার রক্তের প্রয়োজন পড়লে তাকে দেওয়া হয় এক ব্যাগ রক্ত। কিন্তু রক্ত দেয়ার সাথে সাথে তা জয়ের নাক, মুখ ও কান দিয়ে বের হয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অবশেষে বেলা ৩ টায় হাসপাতালেই মাহমুদুল হাসানের মৃত্যু হয়। রেখে যান একমাত্র বোন মাহমুদা আক্তার চম্পা, মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু বান্ধব। তাকে শুকুশি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

স্বজনদের অনুভূতি

শহীদের নানী সাকেরা বেগম অশ্রুসিক্ত নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "একমাত্র নাতী হিসেবে জয়কে খুবই ভালোবাসতাম। তার বাবা মা আলাদা হওয়ায় সে খুব দুঃখী মানুষ ছিল। লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারেনি। কিন্তু ভালো মানুষ ছিল।" **তার খুব কাছের বন্ধু বলেন,** "মাহমুদুল খুব ভালো ছাত্র ছিল। ভালো ছাত্র হওয়ায় সবাই তাকে ভালোবাসতো ও সকলের প্রিয় ছিল। লেখাপড়া না করলেও রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে সে সচেতন ছিল।"

শহীদের বন্ধুর অনুভূতি: শহীদ জয়ের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল বন্ধু আলিফ। ৫ আগস্ট বন্ধু আলিফের সাথেই ঢাকায় আসেন মাহমুদ। তিনি বলেন,"আমার বন্ধু মাহমুদ খুব ভালো মানুষ ছিল। মেধাবী ছিল। দারিদ্রতার কারণে পড়ালেখা করতে পারেনি। বাপ মা আলাদা হওয়ায় ঠিকমতো সার্পোটও পায়নি। সে খুব মিশুক ছিল। সে খুব খেলাধুলা পছন্দ করতো। আমরা একসাথে জুলাই আন্দোলন করেছি। আহত হওয়ার পর আমি তাকে হাসপাতালে নিয়েছি। আমার বন্ধুকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের বিচার চাই।"

পারিবারিক অবস্থা

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে। মা গার্মেন্টস কর্মী। বাবা সি এন জি চালক। মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। শহীদ জয় স্যানেটারি দোকানে কাজ করতেন। তিনি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ
নাম: মোঃ মাহমুদুল হাসান জয়
জন্ম স্থান: গ্রাম: চরপাড়া, ইউনিয়ন: ফরিদপুর
থানা: কুলিয়ারচর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।
পিতার নাম: মোঃ মিজানুর রহমান নাহিদ — জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোসাঃ হাসি বেগম — জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চরপাড়া, ডাকঘর: ফরিদপুর
থানা: কুলিয়ারচর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: মাহমুদুল হাসান জয়
জন্ম	: ২১-১১-২০০৯
পিতা	: মো: মিজানুর রহমান নাহিদ
মাতা	: হাসি বেগম
পেশা	: স্যানেটারি দোকানে কাজ করতেন
শিক্ষা	: ৮ম শ্রেণি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরপাড়া, ইউনিয়ন: ফরিদপুর, থানা: কুলিয়ার চর, জেলা: কিশোরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ৬০৮/১ ওয়ার্ড ৬৬, ডগাইর পূর্বপাড়া, ডেমরা, ঢাকা
শাহাদাত	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দিবাগত রাত ৩ টা
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১ টা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের যাত্রাবাড়ী থানার ঘাতক পুলিশ বাহিনী
গুলিবিদ্ধ হন	: মাথায়
কবরস্থান	: শুকুশি কবরস্থান
পরিবারের সদস্য	: ১ বোন, মা, বাবা

প্রস্তাবনা

: ১. শহীদের মা ও নানীকে এককালীন বা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

: ২. বোনের লেখাপড়া সহ যাবতীয় খরচ বহন করা যেতে পারে।

: ৩. তার স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের এলাকার স্কুলটির নাম তার নামে নামকরণ করা যেতে পারে।

"গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে ভেবেছিল তাকে বোধহয় গুলি করবে না"

শহীদ মো: ইয়ামিন চৌধুরী

ক্রমিক : ০৩০

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩০

শহীদ পরিচিতি

কিশোরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান শহীদ মো: ইয়ামিন চৌধুরী। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন থানার কাঞ্চনপুর গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ ইয়ামিন ২০০৭ সালের ১৩ আগস্ট নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়ামিন রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। সেই সুবাদে তিনি কারখানার পাশে উত্তর বাড্ডা হাসান উদ্দিন সড়কে থাকতেন। শহীদ ইয়ামিনের পিতা জনাব রতন চৌধুরী ও তার মাতা জনাব জেসমিন পেশায় পোশাক কারখানার শ্রমিক। তার পরিবার একরুমের একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। বাবা-মা ও ভাইয়ের সাথে সেখানেই তিনি বেড়ে উঠেছেন।

ঘটনার বর্ণনা-শহীদ ইয়ামিন একজন গার্মেন্টস কর্মী

২০২৪ এর ১৯ জুলাই বিকাল ৪ টার দিকে বাসায় ফিরছিলেন। ঐ সময় রাজপথ ছিল উতপ্ত। স্বৈরাচার ও মানবতা বিরোধী সরকারের পুলিশ বাহিনী ও যুবলীগের সন্ত্রাসী তাণ্ডবের কারণে ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। তিনি ভেবেছিলেন শ্রমিক হিসেবে তাকে আক্রমণ করা হবে না কিংবা তার সাথে অন্যায় কোনো আচরণও করা হবে না। তবে ঘটনাটা ছিল ভিন্ন খুবই নিষ্ঠুর বর্বরতার শিকার হন তিনি। তার পিতা বলেন, "ইয়ামিন বাসায় ফেরার পথে উত্তর বাড্ডা সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে এলে সন্ত্রাসী হায়নাদের একটি গুলি তার নাভির নিচে বামদিকে বিদ্ধ হয়, আর অন্য গুলিটি ডান হাতে লাগে। পথচারীরা তাকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (DMC) ভর্তি করান। সেখানে তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭ জুলাই ভোর ৫ টায় মারা যান।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা:

শহীদের পিতা বেকার। সহোদর ও তার জননী পেশায় শ্রমজীবী। সংসারের হাল ধরতে ইয়ামিনের মা একটি কারখানায় কাজ করেন। পরিবারের কোনো বসতি বা জমি নেই। দেশমাতার মহাবীর শহীদ ইয়ামিনের উপার্জিত ১৫ হাজার টাকাই ছিলো পরিবারের ভরনপোষনের অন্যতম অবলম্বন। তার মৃত্যুতে শহীদ পরিবারটি দীনতায় নিমজ্জিত হচ্ছে। পরিবারটি জানে না কিভাবে এই কষ্ট তাদের লাঘব হবে।

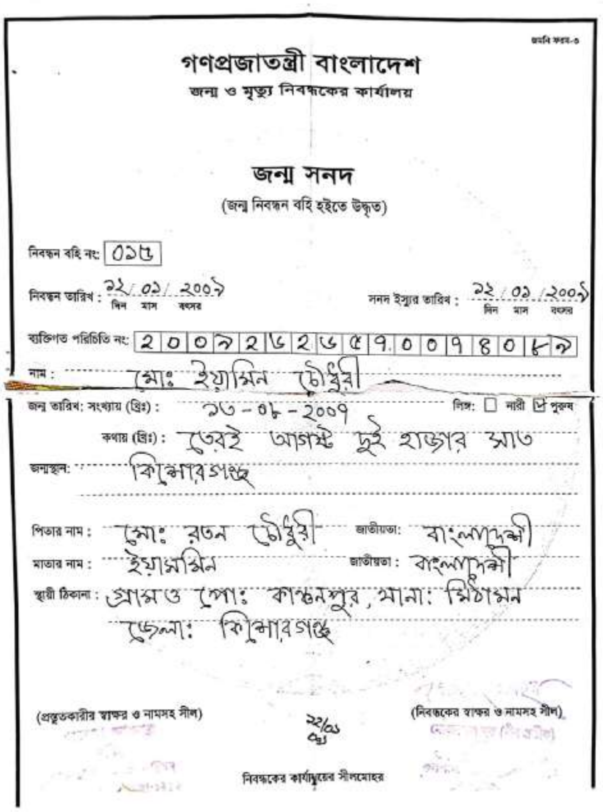

জন্ম ফরম-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ০১৮

নিবন্ধন তারিখ : ২২/০১/২০০৯ (দিন মাস বৎসর)

সনদ ইস্যুর তারিখ : ২২/০১/২০০৯ (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২০০৯২৬২৬৫৭০০৭৪০৮৯

নাম : মোঃ ইয়ামিন চৌধুরী

জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ) : ১৩-০৮-২০০৭

লিঙ্গ: ☐ নারী ☑ পুরুষ

কথায় (খ্রিঃ) : তেরই আগষ্ট দুই হাজার সাত

জন্মস্থান: কিশোরগঞ্জ

পিতার নাম : মোঃ রতন চৌধুরী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম : ইয়াসমিন জাতীয়তা : বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোঃ কাঞ্চনপুর, থানা: মিঠামন
জেলা: কিশোরগঞ্জ

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) ২২/০১/০৯ (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

পরিচয়পত্রটি তার পকেটে ছিল রক্তে ভেজা

ছেলের ছবি বুকে চেপে কেঁদেই চলছেন মা

স্বজনদের কর্তৃক সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১ পরিবারকে মাসিক বা এককালিন সহযোগিতা করা যেতে পারে।
প্রস্তাবনা-২: বাবার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে।

শহীদের পরিবার :

* শহীদের পিতা: জনাব রতন চৌধুরী, পেশা: বেকার; বয়স: ৫৪। পিতা শহীদের সাথেই থাকতেন।
* শহীদের মাতা: জেসমিন, মায়ের পেশা: পোশাক কারখানার শ্রমিক। তিনি অন্যত্র থাকেন।
* শহীদের ভাই: ইয়াসিন চৌধুরী (২১)। চাকরিজীবী।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: ইয়ামিন চৌধুরী
জন্ম তারিখ	: ১৩/৮/২০০৭
জন্মস্থান	: কিশোরগঞ্জ
পেশা/ পদবী	: কারখানার শ্রমিক
নিজ জেলা	: কিশোরগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কাঞ্চনপুর, ইউনিয়ন: কাঞ্চনপুর: থানা: মিঠামইন, জেলা: কিশোরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: ১৯ ,এলাকা: হাসান উদ্দিন রোড ,থানা: বাড্ডা, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: রতন চৌধুরী
পিতার পেশা ও বয়স	: বেকার, ৫৪ বছর
মায়ের নাম	: জেসমিন
মায়ের পেশা ও বয়স	: গার্মেন্টস কর্মী, ৪৮ বছর, মাসিক আয়: আনুমানিক ১৫ হাজার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩
ঘটনার স্থান	: উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: বিকাল ৪টা, ১৯ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ২৭ জুলাই ২০২৪, ভোর ৫ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম কাঞ্চনপুর
জানাজা ও কবরস্থান	: পোস্টমর্টেম শেষে, নিজ গ্রামেই জানাযা শেষে কাঞ্চনপুরে কবর দেওয়া হয়

"নামাজে দাঁড়িয়েছে মা,
ইব্রাহীমের আন্দোলনে যেতে
আর বাঁধা রইলো না।"

শহীদ মো: ইব্রাহিম খলিল

ক্রমিক : ০৩১

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩১

জন্ম ও শৈশব

শহীদ মো: ইব্রাহিম খলিল ২০১২ সালের মে মাসের ১ তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ডেমরা থানার মাতুয়াইল এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হানিফ মিয়া ও মাতার নাম ছখিনা বিবি। শৈশবটা খুব বেশি সুখকর ছিল না তার। ইব্রাহিমের যখন মাত্র ছয় মাস বয়স, সে সময় তার ৬ বছর বয়সী বড় ভাই ও মাকে ফেলে বাবা চলে যান অন্যত্র। পরবর্তীতে আর কখনও তিনি পরিবারের খোঁজখবর নেননি। ইব্রাহিমের জীবনের গল্প তখন থেকেই অপ্রাপ্তি, দুঃখ-কষ্ট ও লড়াই সংগ্রামে থরেথরে সাঁজানো। তাই একেবারে ছোট থেকেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত সে। এ অভাব পূরণ করতে শহীদের মা ছখিনা বিবি যারপরনাই চেষ্টা করে গিয়েছেন।

সুখ কি তবে অধরাই ছখিনা বিবিদের জীবনে?

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামে জন্ম ছখিনা বিবির। দরিদ্র কৃষক পিতা, মা আর পাঁচ সহোদর ভাইবোনের বড় সংসার। সিদ্ধান্ত নিলেন দরিদ্র পরিবারটিকে সহযোগিতা করার। খালাতো বোন আসমার সাথে চলে আসলেন রাজধানী ঢাকায়। শুরু হলো কিশোরী ছখিনার গৃহ পরিচারিকার কাজ। ধানমন্ডির একটি বাসায় একটানা পাঁচ বছর কাজ করে গেলেন। একপর্যায়ে পরিচয় হানিফ মিয়ার সাথে, বাধলেন জুটি। বিয়ে পরবর্তী অনেকটা সময় নিঃসন্তান থাকলেও একটা সময় জন্ম নিলেন শহীদের বড় ভাই ইয়াকুব আলী। আর তার ঠিক সাড়ে ৫ বছর পর জন্ম হলো ইব্রাহিমের। সহীদের জন্মের ছয় মাস পর তিন সদস্যের এই পরিবারকে মাঝ দরিয়ায় ফেলে নিরুদ্দেশ পাষাণ পিতা। ছোট্ট দুই সন্তানকে নিয়ে ছখিনা বিবির শুরু হলো আরেক জীবন যুদ্ধ! খেয়ে না খেয়ে বড় করতে লাগলেন নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় দুই সন্তানকে। ব্যক্তিগত জীবনে ছখিনা বিবি বেশ ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন একজন মানুষ। তাই নিজের দুই সন্তানের মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "জীবনে বহুত কষ্ট করছি। আমি জানি এ কষ্ট থাইকা একমাত্র আল্লাহ আমারে উদ্ধার করতে পারবো। তাই আমার দুই পোলারে মাদ্রাসায় দিছিলাম, যাতে এর উসিলা কইরা হলেও আল্লাহ আমার সব দুঃখ-কষ্ট শেষ করেন।"

কি চমৎকার অভিব্যক্তি! কি দৃঢ় বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতি! শহীদ ইব্রাহিম ও তার বড় ভাই ইয়াকুব আলী দুজনেই মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। ইয়াকুব আলী হিফজ শেষ করার পর আরও পড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে পরবর্তীতে পারিবারিক টানাপোড়নে আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ছোট ভাই ইব্রাহিমের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তিনি। এরই অংশ হিসেবে গুলিস্তানের একটি কাপড়ের দোকানে কাজ শুরু করেন তিনি। এদিকে শহীদ ইব্রাহিম ডেমরার জামিয়া মাদানিয়া বাইতুস সুজুদ মাদ্রাসায় কুরআনের হিফয্ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে কুরআনের প্রায় ৬ পারার হিফজ সম্পন্ন হয়েছিল তার।

এ সংসারের বটবৃক্ষ মা ছখিনা বিবি

বিয়ের প্রায় ১৯ বছর পর সদ্য ভূমিষ্ঠ ইব্রাহিম ও ছয় বছরের ছোট্ট ইয়াকুব আলীকে ফেলে যখন তাদের পাষাণ পিতা নিরুদ্দেশ, তখন এই দুই সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা ছখিনা বিবি। উপায়ান্তর না করতে পেরে আবার শুরু করতে হয় জীবনের বিরাট অংশে করে আসা সেই গৃহপরিচারিকার কাজ। এভাবেই শত অভাব অনটনের মধ্যেও বড় করতে লাগলেন নিজের দুই স্বপ্ন, দুই সন্তানকে। ঢাকায় অবস্থানের ২৫ বছরের প্রায় পুরোটাই অন্যের বাসা বাড়িতে কাজ করতে হয়েছে ছখিনা বিবিকে। সর্বশেষ, তিনটি বাড়িতে কাজের পাশাপাশি একটি মেসে রান্নার কাজ করতেন তিনি। সেখান থেকে আয় হওয়া অল্প কিছু টাকার মধ্যে ৬০০০ টাকা দিতে হতো বাসা ভাড়া বাবদ। জীবন সংগ্রাম চলছিল এভাবেই। তবে মায়ের বিভিন্ন রোগ আর কষ্টের কথা চিন্তা করে জীবনের একপর্যায়ে এসে পড়াশোনা ছাড়তে হয় ইয়াকুব আলীকে। পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ ও ছোট ভাই ইব্রাহিমের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য গত ২০২২ সাল থেকে গুলিস্তানের একটি কাপড়ের দোকানে খাবার আর অসামান্য কিছু হাত খরচের চুক্তিতে কাজ করে চলছেন তিনি।

জেগে উঠলো ছাত্র জনতা, সঙ্গী শহীদ ইব্রাহিম

প্রায় দেড় যুগের আওয়ামী দুঃশাসনের পুরোটাই বিভীষিকাময়। শান্তি ছিল কই? বিরোধী মতের মানুষগুলোকে হত্যা, গুম তো পুরনো ব্যাপার। চারিদিকে মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি, বাজারে অব্যবস্থাপনা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে তখন সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস। ছোট্ট এই জীবনে যার পুরোটাই পরখ করেছে ইব্রাহিম। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জনগণ এবার শামিল হয় ছাত্রদের যৌক্তিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে। চলতি বছরের ৫ জুন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (নবম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পুরোনো পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় আদালত। নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন, শুরু থেকেই নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর হায়নার মতো ঝাপিয়ে পড়ে সরকারের পালিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সন্ত্রাসীরা আর পুলিশ। জুলাইয়ের ১৬ তারিখে শহীদ হলেন রংপুরের আবু সাঈদ, চট্টগ্রামের ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, ওয়াসিম আকরামসহ আরো বেশ কয়েকজন। এবার আন্দোলন তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হলো। দেশের অপরপ্রান্তে থাকা নিরস্ত্র ভাইকে হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনে অংশ নেন কিশোর ইব্রাহিম।

কিশোর ইব্রাহীমের শহীদ হওয়ার গল্প

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, সেদিন সকাল থেকেই সাইনবোর্ড এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। জুম্মার সালাত আদায় করে একবার বাসায় যায় ইব্রাহিম। দরজার আড়াল থেকে দেখে মা ভিতরে নামাজ আদায় করছেন। তাকে আর ঠেকায় কে? চলে যান আন্দোলনে অংশ নিতে। ১৬ তারিখ পরবর্তী সারা দেশের সকল ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সেদিন তীব্র আন্দোলন চলছিল সাইনবোর্ড এলাকায়। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে মারমুখী পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট আর গুলির বিপরীতে ছাত্র-জনতা পালিয়ে না গিয়ে আরো সজ্ঘবদ্ধ হয়। প্রতিবাদ জারি রাখে। পুলিশের সাথে যোগ দেয় বিজিবি। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে দমাতে থেমে থাকেনি সীমান্তরক্ষী বিজিবি। বিজিবির নিয়োগ দেখে বিস্মিত হলেও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে বেশ অতর্কিতভাবেই ছাত্র জনতার ওপর যৌথ আক্রমণ

শুরু করে পুলিশ, বিজিবি।

তখন বিকাল আনুমানিক ৪টা, একটি বুলেট এসে লাগে ইব্রাহিমের ডান কানের নিচে, লুটিয়ে পড়েন তিনি। মুখের ডান পাশ থেকে ছিটে আসা রক্তের ফিনকি আর অসংখ্য ছররা বুলেটের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় ১৩ বছর বয়সী ইব্রাহিমের মুখ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ততক্ষণে দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন ছোট্ট ইব্রাহিম। আসর নামাজের ঠিক পর পর ইব্রাহিম এর কাছে থাকা ফোন থেকে খবর দেয়া হয় বাড়িতে। শুরু হয় তার মা আর একমাত্র ভাইয়ের শোকের মাতম। মুহূর্তেই পাল্টে গেল হাজী বাদশা মিয়া রোডের পুরো মহল্লার চিত্র। নিস্তব্ধ হয়ে যায় সবাই। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ যায় পরিবারের সাথে শহীদ ইব্রাহিমের লাশ আনতে।

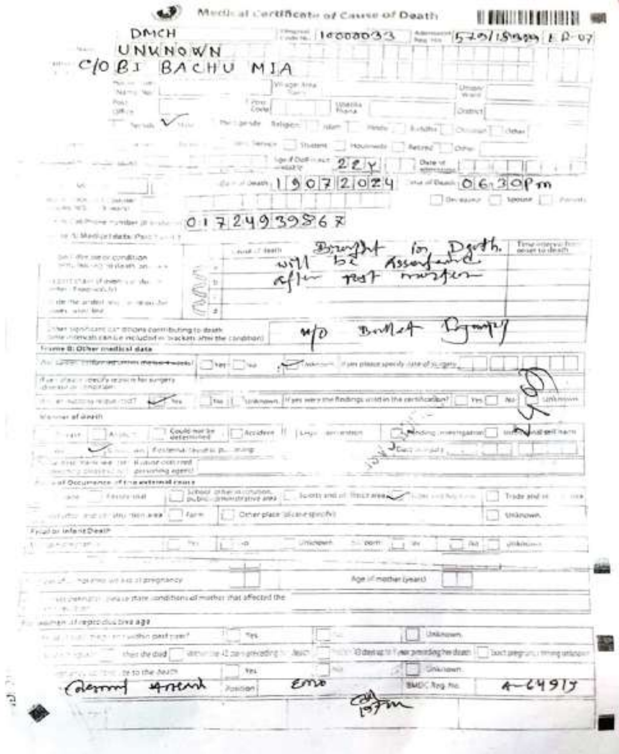

Medical Certificate of Cause of Death

DMCH

UNKNOWN

C/O BI BACHU MIA

19072024

06:30pm

01724939986

Brought in Death. Will be ascertained after post mortem

B/O Bullet Injury

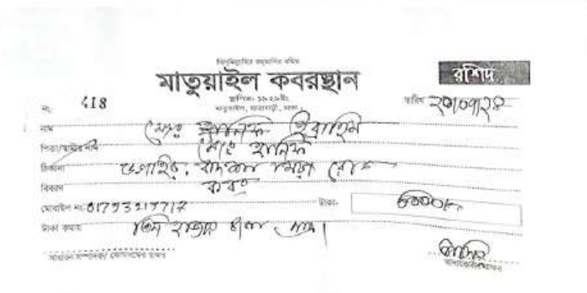

মাতুয়াইল কবরস্থান

রশিদ

418

শহীদ ইব্রাহিম সম্পর্কে সহপাঠী ও এলাকাবাসীর অনুভূতি

শহীদ ইব্রাহিমের সহপাঠীরা বলে,"ইব্রাহিম ছিল খুব ভালো মনের একজন। সে সব সময় সবার উপকার করত। একই সাথে সে প্রচন্ড মেধাবী ও ধার্মিক ছিল।"

তার নিকট প্রতিবেশী ও বাড়িওয়ালা শামীম মিঞা বলেন,"সকলের খুবই প্রিয় ছিল ইব্রাহিম। সে ছোট থেকেই খুব শান্ত স্বভাবের। তাকে নিয়ে পরিবারের পাশাপাশি আমাদেরও স্বপ্ন ছিল যে, একদিন সে বড় আলেম হবে। দেশ ও দশের জন্য কাজ করবে। হাল ধরবে এই অসহায় পরিবারের।"

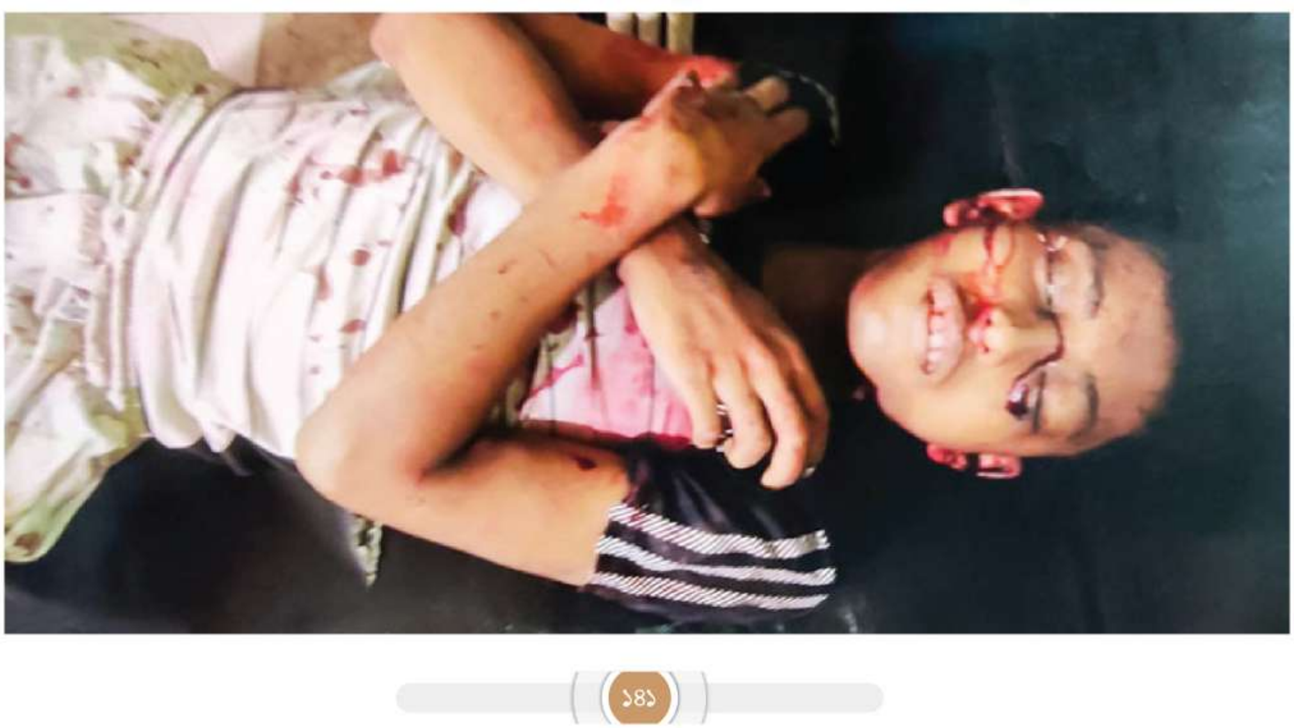

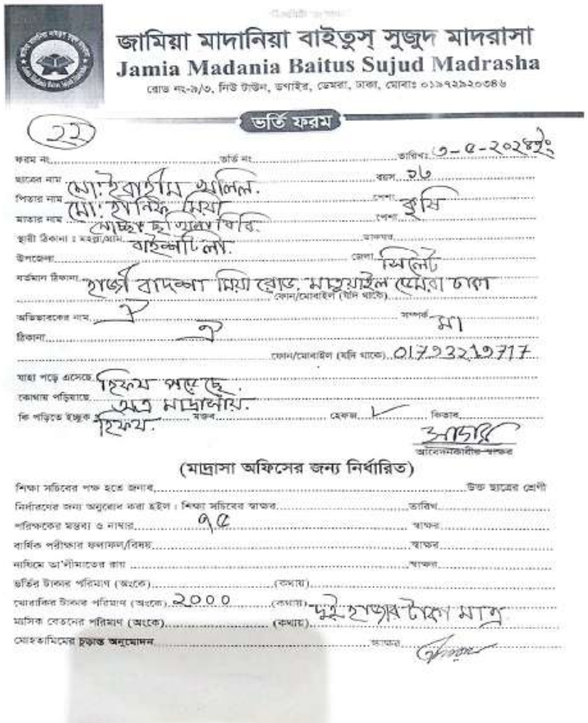
জামিয়া মাদানিয়া বাইতুস্ সুজুদ মাদরাসা
Jamia Madania Baitus Sujud Madrasha

ভর্তি ফরম

(মাদ্রাসা অফিসের জন্য নির্ধারিত)

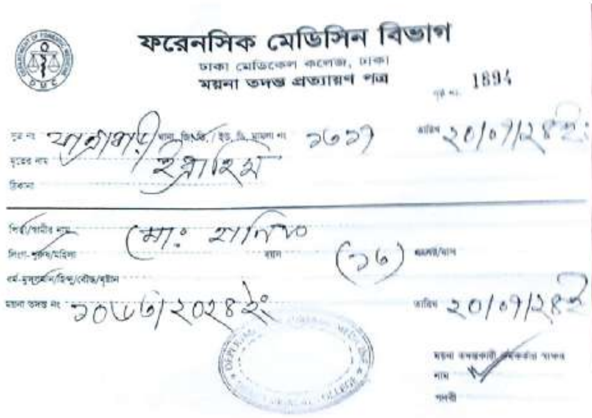
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ন পত্র

1894

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণনাম	: শহীদ মো: ইব্রাহিম খলিল
জন্ম তারিখ	: ০১ মে ২০১২
পেশা	: ছাত্র (হিফজ মাদ্রাসা)
পিতার নাম	: মো: হানিফ মিয়া
মাতার নাম	: ছখিনা বিবি
মাতার পেশা	: অন্যের বাসা বাড়িতে কাজ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩
পরিবারের মাসিক আয়	: ৯০০০ (মাতার আয় পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস)

সহোদর

নাম	: মো: ইয়াকুব আলী, বয়স: ২০ বছর
পেশা	: কাপড়ের দোকানের কর্মচারী
বর্তমান ঠিকানা	: হাজী বাদশা মিয়া রোড, থানা: ডেমরা, জেলা: ঢাকা

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

১. শহীদের বড় ভাইয়ের একটি চাকরির বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

২. পরিবারটি দীর্ঘ ২৫ বছর ভাড়া বাসায় থাকে, তাদের একটি বাসস্থানের খুব প্রয়োজন

৩. নিয়মিত আর্থিক সহায়তা করা যেতে পারে

“যৌক্তিক আন্দোলনে হার না মানা আসিফ”

শহীদ মো: আসিফ ইকবাল

ক্রমিক : ০৩২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩২

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: আসিফ ইকবাল ১ আগস্ট ১৯৯৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা এম এ রাজ্জাক (৫৯) পেশায় সাবেক জিএম। তার মা রাবেয়া সুলতানা (৫২) পেশায় গৃহিণী। পিতার বর্তমানে কোনো আয়ের উৎস নেই। তার পিতা-মাতার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা শোচনীয়। শহীদ মো: আসিফ ইকবাল পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হওয়ার কারণে তাকেই একটি পর্যায়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। তিনি ঢাকায় একটি বায়িং হাউজে চাকরি করতেন। ঢাকার মিরপুর পল্লবীতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। ছেলের আয়েই তাদের বৃদ্ধ মা-বাবা এবং বোনের সার্বিক খরচের সংস্থান হতো। শহীদের একমাত্র বোন শারমিন (২৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স এ অধ্যয়নরত। সংসারের হাল ধরার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বৃদ্ধ মা-বাবা অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করছেন।

শাহাদাতের সুধা পান:

২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। যত দিন যায় আন্দোলনের গতি ততই বাড়তে থাকে। ১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে আন্দোলনের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে। সেদিনই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তার গুন্ডা লীগকে লেলিয়ে দেয়।

পরের দিন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে ট্রাক ও বাসযোগে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, এবং ছাত্রলীগ দেশি ও বিদেশি আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার পশুর মতো ঝাপিয়ে পড়ে। শহীদ মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল ছাত্র-জনতার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় বাসা থেকে বের হন। উদ্দেশ্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করা। এরপর মিরপুর-১০ নাম্বার

ফলপট্টি সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেন। সকাল থেকেই সেদিন মিরপুর এলাকায় ছাত্র-জনতার ঢল নামে।

একদিকে ছাত্র জনতার তিব্র আন্দোলন অন্যদিকে স্বৈরাচার সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিবন্ধকতা। এই ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য তারা ছাত্র জনতার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল রাজধানীর মিরপুর এলাকা। স্বৈরাচারী সরকার তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করার জন্য। যার অংশ হিসেবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে হেলিকপ্টার দিয়ে উপর থেকে গুলি করা হয়। আসিফ সেনপাড়া মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করে বের হলে হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলি তার বুকে এসে বিদ্ধ হয়। একটি ভিডিওতে দেখা যায় গুলি লাগার পরেও তিনি হাঁটার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান। তীব্র গোলাগুলির মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন তাকে উদ্ধার করে আল হেলাল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন মা-বাবার একমাত্র ছেলে শহীদ আসিফ ইকবাল। তাকে গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

রেখে যাওয়া স্মৃতি

ছোটবেলা থেকেই তিনি মিশুক ছিলেন। সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করাই ছিল তার অভ্যাস। মা-বাবা এবং বড়দেরকে তিনি সম্মান করতেন। পরোপকার করতে ভালোবাসতেন।

এক নজরে শহীদের তথ্য

নাম	: মো: আসিফ ইকবাল, পেশা-চাকরিজীবী
জন্ম	: ০১ আগস্ট, ১৯৯৫ সাল
পিতা	: এম এ রাজ্জাক
মাতা	: রাবেয়া সুলতানা, পেশা-গৃহিণী
আহত হওয়ার তারিখ, সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫:৩০, মিরপুর ১০, ফলপট্টি
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৬ টা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নোহাটা, ইউনিয়ন : সর্দারপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: মাগুরা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ২৮/৭, থানা: মিরপুর পল্লবী, জেলা: ঢাকা

“ঘাতকের গুলি লালুর খুলি ভেদ করে বেরিয়ে যায়”

শহীদ লিটন হাসান লালু

ক্রমিক : ০৩৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৩

শহীদ পরিচিতি

২০১২ সালের ২ জানুয়ারি ঢাকার মিরপুরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জুলাই বিপ্লবের অন্যতম এক কিশোর শহিদ লিটন হাসান লালু। আদর করে তাকে লালু বলেই ডাকতো সবাই। পিতা মো: হাফিজ ও মাতা মোসাম্মৎ আসমা দম্পতির কোল উজ্জ্বল করে আসা ছয় সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন লালু। পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারণে পড়ালেখাটা বেশিদূর করতে পারেননি লালু। উপায়ান্তর না পেয়ে মিরপুরে একটা ফুলের দোকানে চাকরি নেন।

শহীদ লালুর পিতা মো: হাফিজ স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে একটু একটু করে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, দারিদ্রতার সাথে লড়াই করছেন। নির্লজ্জ সরকারের লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের কাছে বারবার যেন তিনি পরাজিত হতে থাকেন। তাদের জীবনের অন্ধকার আর কষ্টপীড়িত আকাশে ছয় সন্তান যেন মিটিমিটি করে জ্বলা ছয়টি শুকতারা! আর সবার ছোট হওয়ায় লালু যেন ছিল অন্যদের তুলনায় একটু বেশি উজ্জ্বল; দীপ্তিময়!

খুব অল্প বয়সেই সে পরিবারের সুবিধা অসুবিধা বুঝতে পেরেছিল। বাবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম আর মায়ের দুঃখ-কষ্টকে হৃদয়ে ধারণ করতে পেরেছিল। তাইতো যে বয়সে লেখাপড়া, খেলাধুলা আর বন্ধুদের সাথে হইহুল্লোড় করে সময় কাটানোর কথা, সে বয়সেই লালু তার বাবা আর ভাইদের সাথে পরিবারের হাল ধরতে প্রাণপন চেষ্টা করেছে এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের বাজারে। অথচ পরিবারের এই উদীয়মান উজ্জ্বল নক্ষত্রকেই চিরতরে থামিয়ে দিল স্বৈরাচারের বুলেট! শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর সাত মাস দুই দিন।

যেভাবে শহীদ হলো

২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় কোটাবিরোধী বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ওই মাসের শেষের দিকে সেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়।

স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের নানা রকম নাটক, মিথ্যাচার, অনাচার, অত্যাচার আর তাল বাহানার কারণেই ছাত্রদের আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসায়। বিভাগীয় শহর থেকে বিপ্লব ছড়িয়ে যায় জেলা, উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, গ্রামে-গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায়। সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে, ঘরে-বাইরে সবখানে। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সকলের মাঝে যেন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন, বিপ্লব আর সংগ্রাম। কোটাবিরোধী আন্দোলন এক দফা সরকার পতনের দাবিতে পরিণত হয়। সকলের মুখে একই স্লোগান- এক দফা এক দাবি হাসিনা তুই কবে যাবি?

লালু দোকান থেকে বাসায় যেতে পারে না কারফিউ আর অঘোষিত অবরোধের কারণে। তার বাবা কাজে যেতে পারেন না, বলেন দেশের অবস্থা খারাপ। মা রান্না করতে পারেন না-ঘরে বাজার নেই। মানুষ দুই বেলা খেতে পারে না-ঘরে খাবার নেই। রিক্সাওয়ালা মামা বলেন-মানুষ ভালো নেই। লালুর মহাজন বলেন-ব্যবসা ধ্বংস। নাগরিক সুবিধা নেই। মোড়ে মোড়ে কেবল তল্লাশি আর গুলি। লালু ভাবে এসব কি? জীবনে আর কখনও এমন পরিস্থিতি দেখেনি সে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে শুনে সে বড় হয়েছে। কিন্তু এখন তো একাত্তরের সেই শোনা ঘটনাগুলো যেন প্রতিদিন নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে লালু।

না! লালু আর সহ্য করতে পারছে না! চারদিক থেকে ভেসে আসা স্লোগানগুলো লালুর সারা শরীরে কিসের যেন জাগরণ তৈরি করে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদগুলো তাকে কেমন যেন নাড়া দেয়। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন লালুকে রাজপথের দিকে টেনে নিয়ে যায়। লালু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বিবেক তাকে ঘরে বসে থাকতে দেয় না।

এভাবেই সরকার পতনের গণআন্দোলনের উন্মাদনা বাসা বাধে জীবনের অধিকাংশ সময় ফুলের সাথে থাকা কুসুম-কমল ছেলে অকুতভয় কিশোর লিটন হাসান লালুর তেজদীপ্ত হৃদয়ে। আর কি ঘরে বসে থাকা যায়? এই বন্দী দশা আর কত? না। অনেক হয়েছে, আর না। অবশেষে লালুও বেরিয়ে পড়ে মুক্তির সন্ধানে।

লালু সারাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে মিরপুর-১০ এর ফলপট্টি মোড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ৪ আগস্ট সকাল ১১ টার দিকে বাসা থেকে বের হয়। বন্ধুদের সাথে সেও আন্দোলনে যোগ দেয়। সেখানে অবস্থানরত পুলিশ বাহিনী বিক্ষোভকারীদের উপর অতর্কিতে গুলি চালায়। পূর্ণ করে বর্বরতার ষোল কলা। এই সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মিরপুর থানার ঘাতক পুলিশ বাহিনীর গুলিতে লালুর মাথার খুলি এফোড় ওফোড় হয়ে যায়। তার মাথার সামনের দিকে দুটি গুলি লাগে, যা পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। আহত লালুকে অন্যান্য আন্দোলনকারীরা দ্রুত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স হাসপাতালে নিয়ে যায়। টানা তিন দিন হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থেকে ৭ আগস্ট ২০২৪ সকাল ৯:৫০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে একটি পরিবারের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সন্তান লিটন হাসান লালু। মহল্লার সকলের কণ্ঠে যেন বেরিয়ে আসে শোকের আর্তনাদ। মিরপুর পানির ট্যাংকি মসজিদে জানাজা শেষে বাদ আসর মিরপুর কালসি কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় কিশোর শহিদ লিটন হাসান লালুকে।

হৃদয়ের প্রশান্তি হারালো পরিবার

লালু ছিল পরিবারের সবচেয়ে ছোট এবং সবার আদরের। তার পরিচিতজনেরা জানান,ছোট বয়স থেকেই পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের জন্য উপার্জন করত লালু। শহীদ হওয়ার আগে তার মাসিক আয় ছিল ৯০০০ টাকা। পরিবারের যেকোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোঁজ নিত সে। সেই আলোচিত লালু এখন পরিবার, মহল্লার গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও স্বীকৃত একটি নাম।

দেশের জন্য; দেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, নিজের জীবন, বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জনগণের জন্য মুক্তি কিনে

এনেছে ছোট্ট লালু। সে বুঝিয়ে দিয়েছে, শুধু শারীরিক কাঠামোতেই বড় হওয়া যায় না; ইচ্ছা, সাহস ও ত্যাগের বিনিময়েও জীবনে বড় হওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যায় দেশ ও জাতির জন্য; মানুষের জন্য।

লালুর প্রতি তার মায়ের ভালোবাসা ছিল অসীম। যখন লালু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে পথে নামে তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে তার জীবন এতো দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবার নয়, পুরো এলাকাবাসীকেই যেন শোকের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। লালুর পিতার জীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম যেন এক মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে যায়। মিরপুরের ফলপট্টি গলিতে যে পরিবারের আলো এক সময় জ্বলজ্বল করতো, সেই আলো আজ নিভে গিয়েছে। শহিদ লিটন হাসান লালুর শোকে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেননা সে ছিল মায়ের আদরের ছোট ছেলে। শহীদ লালুর মৃত্যু তার পরিবারের জন্য যেমন অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি এই মৃত্যুর শোক যেন আজও কেঁদে কেঁদে ভেসে বেড়ায় মিরপুরের আকাশে বাতাসে।

পাশে দাঁড়াতে হবে

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কিশোর শহীদ লিটন হাসান লালুর বাবা মো: হাফিজ। ৬০ বছর বয়সেও বেঁচে থাকার জন্য অটো চালাচ্ছেন জনাব হাফিজ। মা মোসা: আসমা একজন গৃহিণী। তার বয়স ৫০ বছর। বড়ো ভাই মো: মিলন (৩৩) এবং মেজ ভাই মো: নয়ন (৩০) দুজনেই ফুটপাতে ভ্যানে ক্ষুদ্র ব্যবসা করেন। সেজো ভাই মো: রতন (২২) এখনও বেকার আছেন। একমাত্র বোন মোসা: রতনা (১৯) ৯ম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। ছোট ভাই লালু শহীদ হওয়ার পরে বোনের পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর লালুর ইমিডিয়েট বড় ভাই মো: রিদয় (১৪) একজন বেকার কিশোর।

নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন একটি পরিবারের অতি আদরের এবং উপার্জনক্ষম সন্তান লালুর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পুরো পরিবার। লালুর মায়ের চিকিৎসা খরচ আর সাংসারিক খরচ কিভাবে হবে তা কেউ জানে না। এই সময়ে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা পেলে হয়তো বা আরো একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবে ঢাকার মিরপুরে পল্লবী ই ব্লক-এর ৭০ নং বাসায় ভাড়া থাকা কিশোর শহীদ লিটন হাসান লালুর পরিবারটি।

এক নজরে শহীদ লিটন হাসান লালু

শহীদের পূর্ণ নাম	: লিটন হাসান লালু
জন্ম তারিখ	: ০২-০১-২০১২
জন্মস্থান	: মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
পেশাগত পরিচয়	: ফুলের দোকানের কর্মচারী
মাসিক আয় ছিলো	: ৯০০০ টাকা
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: ৭০ নং, ই-ব্লক, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা
পিতার নাম	: মো: হাফিজ
মাতার নাম	: মোসা: আসমা
ভাইয়ের সংখ্যা	: ০৪
বোনের সংখ্যা	: ০১
ঘটনার স্থান	: মিরপুর-১০, ঢাকা
আক্রমণকারী	: মিরপুর থানার ঘাতক পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:৩০
মৃত্যুর তারিখ সময় ও স্থান	: ৭ আগস্ট ২০২৪, সকাল ৯:৫০ ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সাইন্স হাসপাতাল, ঢাকা
কবরস্থান	: মিরপুর-১২, ঢাকা

“স্বৈরাচারের কবল থেকে রক্ষা পেল না ১৫ বছরের কিশোর আলভী”

শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভী

ক্রমিক : ০৩৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৪

শহিদ পরিচিতি

দরিদ্র পিতা মাতার একমাত্র ছেলে সন্তান শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভীর জন্ম ২০০৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলায়। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। ছোট বেলা থেকেই সে ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ঢাকার মিরপুরের কালশীর দেশ পলিটেকনিক স্কুল এন্ড কলেজে নবম শ্রেণিতে আলভী পড়াশোনা করত। সে পড়াশোনায় যেমন মনোযোগী ছিল তেমনি সামাজিক কাজ কর্মেও নিজেকে নিয়োজিত রাখত। সহপাঠীদের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করত। তার বাবা জনাব মো: আবুল হাসান একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মা মোসা: সালমা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করেন।

তার ছোট একটি বোনও রয়েছে, যার বয়স মাত্র ৮ বছর। তাদের গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলায়। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিল আলভী বড় হয়ে পরিবারের হাল ধরবে। কিন্তু তা আর হল না। মা একটু আসছি বলে সেই যে গেল, আর ঘরে ফিরল না শহীদ আলভী। ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্তরে পুলিশ বাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করে ছোট্ট শিশু শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভী। তার মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হবে। তাও আর পূরণ হল না। ছেলের শখের কম্পিউটার, বই-খাতা, সব পড়ে আছে, নেই কেবল ছেলেটা।

শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা

দিনটি ছিল ৪ আগস্ট ২০২৪ রবিবার। শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভী সকালে ঘুম থেকে উঠে তার মাকে বলে, "মা, আমি একটু আসছি।" এরপর দুপুরে বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার বেরিয়ে যায়। মা তাকে বারবার বলে, "বাবা তুমি যেও না, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।" কিন্তু আলভী আর ফিরে আসেনি। ৪ আগস্ট ২০২৪ ছাত্রজনতা তাদের নায্য দাবী আদায়ের জন্য মিছিল নিয়ে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে প্রবেশ করলে পুলিশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রজনতাকে লক্ষ করে গুলি চালায়। তাদের গুলির হাত থেকে ১৫ বছরের কিশোর আলভীও রক্ষা পায়নি।

গুলি বিদ্ধ হয়ে শহীদ আলভী মাটিতে শুয়ে পড়ে। আলভীর আর্তনাদ আর চিৎকার শুনে তার বন্ধুরা এগিয়ে আসে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ডা. আজমল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মায়ের বুক খালি করে আলভী চিরতরে না ফেরার দেশে চলে যায়। ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মা পাগলপ্রায় হয়ে ছেলের কাছে ছুটে যায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও সহপাঠীদের বক্তব্য

শহীদের মায়ের বক্তব্য: "আমি আমার ছেলেকে আর কখনও ফিরতে দেখব না। আজ এক মাস হয়ে গেল, আমি বেঁচে আছি কিন্তু কিভাবে বেঁচে আছি সেটা বলতে পারব না। মনে হয় জীবিত লাশ হয়ে বেঁচে আছি।"

মায়ের এই কণ্ঠে ব্যথা আর গভীরতা স্পষ্ট। সন্তান হারানোর বেদনা একমাত্র মা'ই বুঝে। ছেলে হত্যার বিচার দাবী করে তিনি বলেন, "যারা বাবার (ছেলের) জীবন নিল, আল্লাহ তাদের বিচার করবেন।"

শহীদের বাবার বক্তব্য: "কী অপরাধ ছিল আমার ১৫ বছরের ছেলের? কেন তাকে গুলি করা হলো? যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার আল্লাহ করবেন।" তিনি আরও বলেন," আমার ছেলে স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। এতটুকুই তার অপরাধ। যারা আমার পরিবারকে নিঃস্ব করেছে আমি তাদের বিচার চাই।"

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ শাহরিয়ার হাসান আলভী তার পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান। তার আরও একটি ছোট বোন রয়েছে। তার বোনের বয়স মাত্র ৮ বছর , ৩য় শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা জনাব আবুল হাসান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। গ্রামের জায়গা জমি বিক্রয় করে মিরপুরের পল্লবীতে একটি ফার্মেসী দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই ব্যবসায়ে লোকসান করে ব্যবসা বাদ দিয়ে দেন। তিনি এখন বেকার। তার মা মোসা: সালমা খাতুন একজন গৃহিণী। বাসায় বসে টুকটাক সেলাইয়ের কাজ করেন। শহীদ শাহরিয়ার আলভীর দাদা-দাদী যদিও গ্রামে থাকেন কিন্তু তাদের খোঁজ-খবরও তার বাবাকেই নিতে হয়। গ্রামে অল্প কিছু জায়গা জমি আছে আর আলভীর বাবা সামান্য কিছু টাকা পাঠাত তা দিয়েই সংসার চলত। কিন্তু এখন আলভীর বাবার অবস্থাই শোচনীয়।

কালশী কবরস্থান মসজিদ ও মাদ্রাসা

মৃত ব্যক্তির দাফনের সনদপত্র

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শাহরিয়ার হাসান আলভী, পেশা: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ০১/০২/২০০৯
পিতা	: জনাব মো: আবুল হাসান
মাতা	: মোসা: সালমা খাতুন
শাহাদাতের তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
গুলি বিদ্ধ হওয়ার স্থান	: মিরপুর ১০ গোলচত্বর
শাহাদাতের স্থান	: ডা. আজমল হাসপাতাল
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম বহরবুনিয়া, ইউনিয়ন: ১১ নং বহরবুনিয়া, থানা: মোড়েলগঞ্জ, জেলা: বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: পল্লবী, মিরপুর ১০, ঢাকা

'যৌক্তিক আন্দোলনে হার না মানা আসিফ'

শহীদ মোঃ সেলিম আলী শেখ

ক্রমিক : ০৩৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৫

শহিদ পরিচিতি

মোঃ সেলিম আলী শেখ ১৫ মে ১৯৮৮ সালে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার করুয়া ইউনিয়নের আশ্রমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন সাধারণ ফেরিওয়ালা। ঢাকায় ১৪ বছর ধরে বসবাস করে বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর মনের ভেতর লালন করছিলেন দেশমাতৃকার স্বপ্ন। তাইতো তিনি বসে থাকলেন না। বৈষম্য ও স্বৈরাচারমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টায় ঘাতক পুলিশের গুলিতে মিরপুর আলোক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘটনার বিবরণ

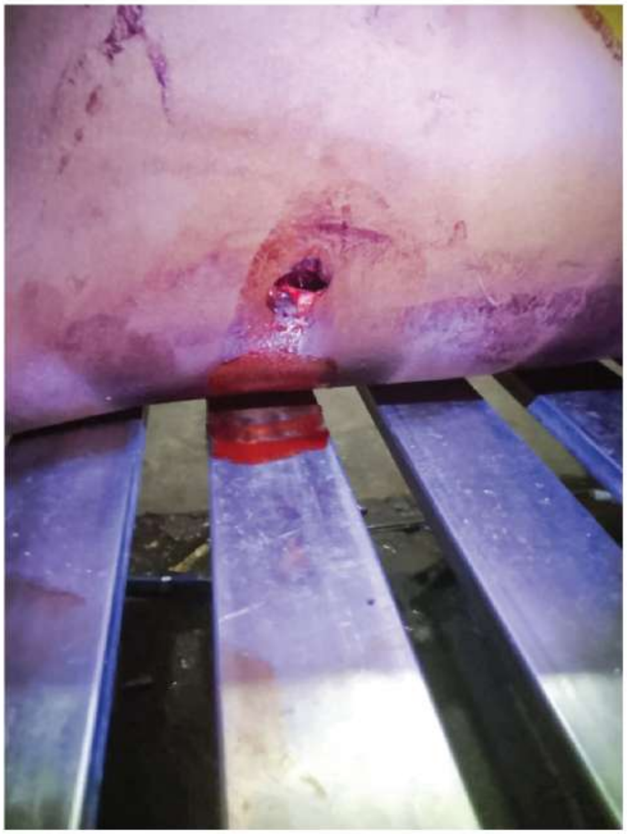

১৯ জুলাই বিকাল ৪ টায় সেলিম আলী শেখ বাসা থেকে বেরিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেন। মিরপুর ১০ এর ২২ নং রোড তখন বিক্ষোভে উত্তাল। এই ক্ষোভ ছিল সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

সেখানে উপস্থিত ছাত্র-জনতা রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল প্রতিবাদমুখর। সেলিমের বুকে সকল জুলুম ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। তিনি মনে করতেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে সমান সুযোগ ও ন্যায় নিশ্চিত করতে হবে। সকল ভয় উপেক্ষা করে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে।

বিকাল ৫ টার দিকে আন্দোলন আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তৎকালীন সরকারের পেটুয়া বাহিনী পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায়। সেই গুলি এসে লাগে সেলিমের ডান বাহুতে। শরীর এফোড়-ওফোড় হয়ে বেড়িয়ে যায় গুলিটি। তার সহযোদ্ধারা তাকে দ্রুত আলোক হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু বিকাল ৬টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ সেলিমের পেশাগত জীবন ছিল কষ্টের। তবুও বুকের পাঁজরে আগলে রেখেছিলেন জীবিকার চাকাটি। সেলিমের মৃত্যুতে তার পরিবারে এক অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা হয়। কেননা, তিনি একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে আমৃত্যু পরিবারকে সুখী করার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। শহীদ সেলিম তার আয় রোজগার দিয়ে নিজের পরিবার ও গ্রামে থাকা বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখাশোনা করতেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।

সেলিমের মৃত্যুর পর তার পরিবার শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তার স্ত্রী আসমা শোকে পাথর প্রায়। সন্তান কুলসুম, শাওন ও ৩ বছরের ছোট আরিয়ান পিতাকে হারানোর শোক সইতে পারছেন না। অবুঝ আরিয়ান প্রতি মুহূর্তে বাবাকে খুঁজে ফিরছে।

সেলিমের মৃতদেহ তিন ঘণ্টা পরে পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয়। প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ২০ জুলাই সকালে দ্বিতীয় জানাজার পর তাকে দাফন করা হয় তার জন্মভূমি ময়মনসিংহে। সেলিমের মৃত্যু কেবল তার পরিবারের জন্য নয়, বরং পুরো জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, তিনি শুধু পরিবারের দায়িত্ব পালন করতেন না, বরং ন্যায়বিচারের পক্ষে দেশের তরুণ প্রজন্মের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন।

সেলিম আলী সেকের জীবন ও মৃত্যু আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় যে, লড়াই ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। আরও মনে করিয়ে দেয় ন্যায়ের পক্ষে কিভাবে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়। তার অসীম সাহস ও ত্যাগ আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। শহীদ সেলিম আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার আদর্শ ও সংগ্রামের চেতনা চিরকাল জাতির হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে।

স্বজনদের বক্তব্য

শহীদ সেলিমের ভাই বলেন, "আমার ভাইরে যারা মারছে, আমি তাদের বিচার চাই।"

শহীদের সন্তান গার্মেন্টসকর্মী ছেলে শাওন বলল, "আমার আব্বু খুব ভালো লোক ছিলেন। আমার একটা বোন ও ছোট ভাই আছে। আমাদের সংসার চালাতে খুবই কষ্ট হয়।"

চাচি নার্গিস বেগম বলেন, "সেলিম খুবই ভালো মানুষ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো। তার জন্য এলাকার মানুষ অনেক কান্নাকাটি করেছে।"

প্রস্তাবনা

সেলিম আলী শেখের মৃত্যুতে নিদারুণ অভাবে পড়েছে তার পরিবার। ঢাকার ভাড়া বাড়িতে অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করছে তার স্ত্রী-সন্তান। যেকোনো সময় ভাড়া বাসা ছেড়ে দিতে হতে পারে। কিন্তু গ্রামে মাথা গোঁজার কোনো ঠাই তাদের নেই। বাড়ি করার মত উল্লেখযোগ্য জমিও নেই। তার পরিবারের জন্য গ্রামে এক টুকরো জমিসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করলে মাথাগোঁজার ঠাঁই পাবে পরিবারটি। এছাড়া এককালীন আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি সরকার ছোট ছেলেটির পড়াশোনার দায়িত্ব নিলে উপকৃত হবে পরিবারটি।

এক নজরে শহীদ মোঃ সেলিম আলী শেখ

শহীদের পূর্ণ নাম	: মোঃ সেলিম আলী শেখ
জন্ম তারিখ	: ১৫-০৫-১৯৮৮
জন্মস্থান	: ময়মনসিংহ
নিজ জেলা	: ময়মনসিংহ
পেশা	: ফেরীওয়ালা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আশ্রম পাড়া, ইউনিয়ন: করুয়া পাড়া থানা : হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ।
বর্তমান ঠিকানা	বাসা-৭, সি ব্লক, লেন-১৮ মিরপুর ১০, থানা: কাফরুল, জেলা: ঢাকা
পরিবার সংক্রান্ত তথ্য	
পিতার নাম	: কলিম উদ্দিন, বয়স: ৮২ বছর
মায়ের নাম	: মোসা: সকিনা বেগম, বয়স: ৭৫ বছর
মাসিক আয়	: ১৫০০০, আয়ের উৎস: ফেরি করত
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: ছেলে
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৮
পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য	
স্ত্রী	: আছমা খাতুন
সন্তানদের নাম	: ১. কুলসুম, বয়স: ২০ (বিবাহিতা), ২. শাওন, বয়স: ১৮ (গার্মেন্টস কর্মী) ৩. আরিয়ান, বয়স: মাত্র ৩ বছর
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট/এলাকা	: মিরপুর ১০, ২২ নং রোডে
আক্রমণকারী	: কাফরুল থানার পুলিশ বাহিনী, আওয়ামী সন্ত্রাসী ও হেলমেট বাহিনী (ছাত্রলীগ)
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই বিকাল ৫ টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৬ টায় মিরপুর ১০ আলোক হসপিটাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: ময়মনসিংহ

“নতুন প্রভাত আনতে
যারা জীবন দিল দান।
রক্ত দিয়ে গড়ল তাঁরা স্বাধীন দেশের মান”

শহীদ ওবায়দুল ইসলাম

ক্রমিক : ০৩৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৬

শহীদের জন্ম ও পরিচয়

শহীদ ওবায়দুল ইসলাম ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ কুমিল্লা জেলার চালিভাঙ্গা ইউনিয়নের মেঘনা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। ওবায়দুল ইসলামের পিতার নাম ওমর আলী (মৃত) এবং মাতা আবেদা খাতুন (৭২)। ৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের বছরে জন্ম শহীদ ওবায়দুল ইসলামের। ৫৩ বছর পর দ্বিতীয় স্বাধীনতার বছরেই পৃথিবী ছাড়তে হলো শহীদ ওবায়দুল ইসলামকে।

পারিবারিক জীবন

ওবায়দুলের শৈশব কেটেছে জন্মস্থান কুমিল্লাতেই। অভাবের সংসার, খুব বেশি পড়ালেখা তাই তার কপালে জোটেনি। কুমিল্লায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর অর্থের অভাবে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অভাবী মানুষের পেটের ভাত জোগানোর চ্যালেঞ্জের কাছে পড়ালেখা গৌণ হয়ে যায়। ওবায়দুলের হয়েছিলও তাই। জীবিকার তাগিদে তিনি কাজ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন কাজকর্ম করে সংসার চালাতেন। আরেকটু উন্নত জীবনের আশায় হয়তো রাজধানীতে এসেছিলেন। রাজধানীতে এসে তিনি ভাড়ায় চালিত সিএনজি চালাতেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই ছিলো তার পেশা। সিএনজির উপার্জনে চলতো স্ত্রী ছেলে-মেয়েসহ চারজনের সংসার। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে যাত্রাবাড়ীর গোবিন্দ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

পরিবারের বট বৃক্ষের মৃত্যু এবং একটি পরিবারের ওপর নেমে আসা অমানিশা

শহীদ ওবায়দুল ইসলাম দুই সন্তানের জনক। ছেলে মাজহারুল ইসলাম মাজহার (২৫) এবং মেয়ে মোসাম্মাৎ মায়া খাতুন (১৯)। মেয়ে মায়া বিবাহিত। আর শহীদ ওবায়দুল তার আদরের ছেলে মাজহারকে এতদিন পৃথিবীর কঠিন জীবন বুঝতে দেননি। একাই টেনেছেন সংসারের ঘানি। একরকম চলেই যাচ্ছিল জীবন। কিন্তু বাবা নেই এখন। তাই মাজহারের মাথার ওপর পুরো সংসার। এতদিন যাকে জীবিকার চিন্তা করতে হয়নি বাবার জন্য, সেই মাজহার এখন একটি জুতার দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ নিয়েছেন মাসিক ৬০০০ টাকা বেতনে। শহীদ ওবায়দুলের স্ত্রী মরিয়মের (৫৪) বয়স হয়েছে, তিনি এখন অসুস্থ। স্বামী হারানোর শোক নিয়েই তিনি এখন দিন পার করছেন।

শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা

স্বাধীনতার বছরে জন্ম নেয়া ওবায়দুলকে চব্বিশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিতে হলো স্বৈরাচারী হাসিনার ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে। স্বাধীনতার বছরেই জন্ম এবং স্বাধীনতার বছরেই মৃত্যু। আহা জীবন! এমন কত শহীদের বিনিময়ে আমাদের ২৪ এর স্বাধীনতা। সত্যিই তো,

এই দেশের জন্য যদি করতে হয়
আমার জীবন দান
তবু দেব না দেব না লুটাতে ধুলায়
আমার দেশের সম্মান।

'নতুন প্রভাত আনতে যারা জীবন দিল দান। রক্ত দিয়ে গড়ল তাঁরা স্বাধীন দেশের মান' তাদের এই আত্মত্যাগ কেবল আমাদের জন্য। একদিকে স্বৈরাচারী হাসিনার উল্লাস, অন্যদিকে তার পেটুয়াদের পিশাচ রাজ্য গঠন। এসব দেখে শহীদ ওবায়দুল ইসলামের ঘৃণায় ধিক্কার আসে। মনের মধ্যে জাগ্রত হয় পাষণ্ড বধের তীব্র ক্ষোভ। এদিকে চারিদিকের আন্দোলনও যেন যুদ্ধে রূপ নেয়। নতুন ঊষার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন ২৪ এর শহীদ মরহুম ওবায়দুল। সিএনজি গ্যারেজে রেখে আন্দোলনে শামিল হন তিনি। কবির ভাষায় 'শাহাদাতে চলে শত ব্যথা ভুলে, তোমার প্রেমের ফুল হৃদয়ে তুলে। আছে সেই আলোময় ফুলের পথে, বিজয়ের পূতঃ উদ্যান!' সেই শাহাদাতের আলোকে রাঙিয়ে তুলতে আন্দোলনে যোগ দেন সিএনজিচালক শহীদ ওবায়দুল ইসলাম।

'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়'

৫ আগস্ট ২০২৪

৫ আগস্ট ২০২৪। একইসাথে ভীষণ অনিশ্চিত, ভয়ংকর এবং একটি বিজয়ের দিন। রোডমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা সারা বাংলার মানুষের। অপেক্ষা খুনী হাসিনার পতনের। অপেক্ষা একটি নতুন ইতিহাসের। এর মধ্যেও থেমে নেই স্বৈরাচারের আগ্রাসন। একটার পর একটা গুলি চলছে। মুহুর্মুহু গুলি চলছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পুরো সময়টাতেই রণাঙ্গন হয়ে থাকা যাত্রাবাড়ী তখন যুদ্ধক্ষেত্র। মাঠে পুলিশ, সরকারের পোষা আওয়ামীলীগের নানান বাহিনী, রক্ত আর লাশের স্তূপ। আর সবদিনের মতো জীবিকার তাগিদে ওবায়দুল ঐদিনও সিএনজি চালাতে এসেছেন। এমন রণাঙ্গন দেখে তিনি চলে যাননি, ভয় পাননি বরং মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সিএনজি দিয়ে গুলিবিদ্ধ যোদ্ধাদের আহত দেহকে হাসপাতালে নিতে সাহায্য করেছিলেন

তিনি।

পুলিশ সেদিন নরপিশাচ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পর শহীদ ওবায়দুল ঘাতকদের নজরে পড়লেন। তখনও জনতার আহত দেহ ওবায়দুলের দু-হাতের উপর। সিএনজিতে উঠাতে যাবেন, সেই মুহূর্তে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি চালানো হলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ওবায়দুল। কিছুক্ষণ আগেও যিনি আন্দোলনের মিছিলে স্লোগান দিয়েছিলেন, উদ্ধার করছিলেন অগণিত ছাত্র-জনতাকে। তাকেই উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন কতক ছাত্র-জনতা। তড়িঘড়ি করে ছাত্র-জনতা এই মহাবীরকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে তারা বাঁচাতে পারেনি অকুতোভয় শহীদকে। সেখানেই বিকাল ৪টায় বাংলাদেশকে স্বৈরাচারী হাসিনার হাত থেকে মুক্ত করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন শহীদ ওবায়দুল ইসলাম। পরবর্তীতে লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায়। আত্মীয়-স্বজনের চোখের জলে সিক্ত হন তিনি। জানাজা শেষে কুমিল্লার চালিভাঙ্গা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় এই মহান বীরকে।

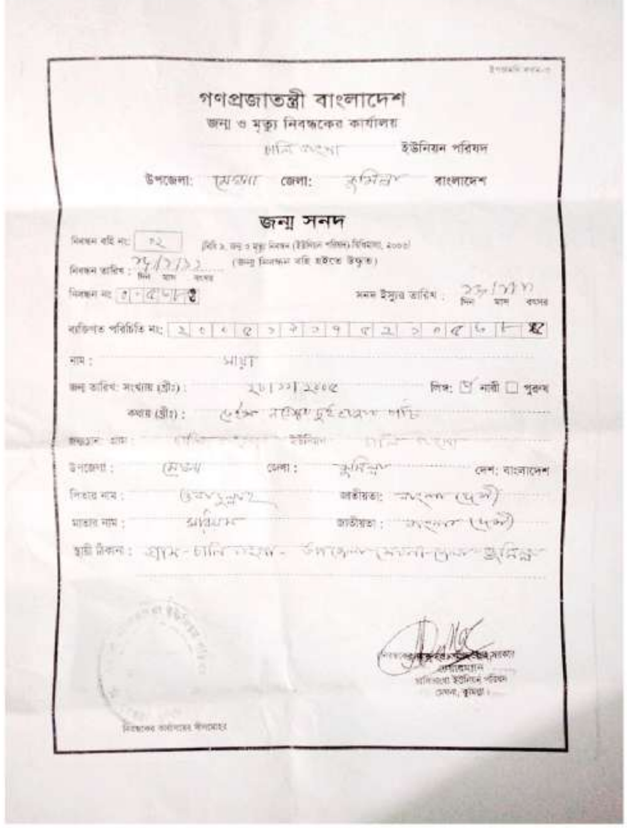
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: জেলা: বাংলাদেশ
জন্ম সনদ
নিবন্ধন বহি নং:
নিবন্ধন তারিখ:
নিবন্ধন নং:
সনদ ইস্যুর তারিখ:
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং:
নাম:
জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রীঃ):
লিঙ্গ: নারী পুরুষ
কথায় (খ্রীঃ):
জন্মস্থান: গ্রাম:
উপজেলা: জেলা: দেশ: বাংলাদেশ
পিতার নাম: জাতীয়তা:
মাতার নাম: জাতীয়তা:
স্থায়ী ঠিকানা:
নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

বিজয়ের আনন্দ এবং হারানোর বেদনা

৫ আগস্ট আমরা দ্বিতীয়বার মতো স্বাধীনতা অর্জন করলাম কিন্তু শহীদ ওবায়দুলরা এ স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না। ৫ আগস্ট যেমন ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন, দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্তির দিন তেমনি অনেককে হারানোর বেদনার দিন। ৫ তারিখে পলায়নের আগেও খুনী হাসিনার ভয়ংকর আগ্রাসন চলছিলো। নাম না জানা অনেকেই ৫ তারিখে শহীদ হন। বিজয়ের আনন্দ ঐ পরিবারগুলোতে আসেনি। আমরা শহীদদের এই আত্মত্যাগ যেন কোনোভাবেই কখনও না ভুলে যাই।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পুত্রকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে।
২. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক অথবা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে।
৩. যেহেতু শহীদের গ্রামের বাড়ীতে নিজস্ব জমি আছে। তাই স্থায়ী বাড়ী করে দেয়া যেতে পারে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: ওবায়দুল ইসলাম
পিতার নাম	: ওমর আলী
মাতার নাম	: আবেদা খাতুন
পেশা	: সিএনজি চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চালি ভাঙ্গা, থানা: মেঘনা, জেলা: কুমিল্লা
মৃত্যুর তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, দুপুর ৩টা
কিভাবে মারা যান	: পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে মারা যান
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানা সংলগ্ন
কবরস্থান	: গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান, চালিভাঙ্গা, কুমিল্লা
জন্মতারিখ ও বয়স	: ২১/০৩/১৯৭১ (৫৩)
সম্পদের পরিমাণ	: পৈতৃক দুই-তিন শতক বসতি জমি রয়েছে
স্ত্রী	: মরিয়ম বেগম (গৃহিণী)

সন্তানদের বিবরণ

১. মাজহারুল ইসলাম মাজহার

বয়স : ২৫
পেশা : জুতার দোকানের কর্মচারী
সম্পর্ক : ছেলে

২. মোসা: মায়া খাতুন

বয়স : ১৯, বিবাহিতা
সম্পর্ক : মেয়ে

“একটা সোনার পাখি হারিয়ে গেল”

শহীদ মো: হৃদয় হাওলাদার

ক্রমিক : ০৩৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৭

শহীদ পরিচিতি

মো: হৃদয় হাওলাদার। ঝালকাঠি সদরে জন্ম নেওয়া একজন সংগ্রামী, একজন সাদামাটা মানুষের প্রতিচ্ছবি। ঝালকাঠীর শিরযুগ গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা এই তরুণের জন্ম ১ জানুয়ারি, ২০০৪। পিতার নাম শহিদ হাওলাদার। পিতা পেশায় সহযোগী রাজমিস্ত্রী। যিনি জীবনের ৪০টি বসন্ত পার করেছেন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। আর মা কুলসুম বেগম, বয়স মাত্র ৩৬ পেশায় গৃহিণী। ছোট ভাই রিয়াদ হাওলাদার (১২) ও ছোটবোন মরিয়ম (০৫)সহ পাঁচ সদস্যের এই পরিবার জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলছিল।

পিতার দিনমজুরি আর শহীদের মুদির দোকানে কাজ করে অর্জিত অর্থ দিয়ে পরিবারের দৈনিক চাহিদা মেটানো হতো। মাসিক ১৫,০০০ টাকা আয়ে জীবনটা কোনোভাবে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বপ্নের পরিধি যেন সবসময়ই সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও তিনি ছিলেন এক দৃঢ়চেতা যুবক। হৃদয় শুধু পরিবারের প্রতিই নয়; দেশের প্রতিও ছিলেন অসীম দায়বদ্ধ।

১৯ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৬ টায় স্বৈরাচারী হাসিনার পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাত ৮টায় তার জীবনাবসান ঘটে।

ঘটনার বিবরণ

মিরপুরের এভিনিউ-৫ এলাকার সরু গলির শেষ মাথায় একটি ছোট্ট বাসায় বাস করতেন শহীদ মো: হৃদয় হাওলাদার। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা তার শৈশব থেকেই তাকে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করে তোলে। দৈনিক মজুরির ওপর নির্ভর করে চলা পরিবারে দারিদ্রতা যেন নিত্যসঙ্গী। পাঁচ সদস্যের এই পরিবারে সংসার চালানোই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। শহীদ হৃদয় ছোটবেলা থেকেই পরিবারের জন্য কিছু করার তীব্র ইচ্ছা লালন করতেন।

হৃদয় পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতায় খুব বেশি এগোতে পারেননি। পরিবারের জন্য কিছু করতে হবে এই চিন্তাই তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। মিরপুরে একটি মুদির দোকানে চাকরি নেন, সেখানে মাসিক ১৫০০০ টাকার বিনিময়ে কাজ শুরু করেন। এই সামান্য আয়ে কোনোভাবে সংসারের খরচ চললেও তা ছিল খুবই কষ্টকর। এর আগে, ফুসফুসের অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি ৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন যা তার পরিবারের ওপর মারাত্মক ধরনের বোঝা হিসেবে বিরাজ করছিল। সেই ঋণ শোধ করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য।

শরীরের অসুস্থতা নিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অর্থনৈতিক সংকট, ঋণের বোঝা আর পারিবারিক দায়িত্ব হৃদয়কে আরও দৃঢ় করে তোলে। তিনি নিজের কষ্টকে পাশ কাটিয়ে পরিবারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার মনে ছিল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। বৈষম্য, দুর্নীতি আর সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। হৃদয় কখনো সমাজের অবহেলিতদের প্রতি তার সহমর্মিতা হারাননি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হলে হৃদয়ও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার কাছে হয়ে উঠল নৈতিক দায়িত্ব।

১৯ জুলাই বিকালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিতে বাসা থেকে বের হন হৃদয়। তখন ছিল সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র হামলায় আহত নিহতদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। সেই সাথে আন্দোলনের উত্তেজনাও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তবুও দমতে রাজি নয় আন্দোলনকারীরা। সকল পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা রাজপথে ছিল। তাদের কণ্ঠে শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্লোগান। পুলিশ ও হাসিনার গুন্ডা বাহিনীর হামলায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় মিরপুর-১০। সন্ধ্যায় ঘটল নির্মম ঘটনাটি। পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। হঠাৎ একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় হৃদয়ের বুকে। গুলিটি সরাসরি তার ফুসফুসে আঘাত হানে। ঠিক সেই জায়গায়; যেখানে আগে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। যন্ত্রণায় কাতর শহীদকে তার সহযোদ্ধারা যথাদ্রুত মিরপুরের আলোক হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থায় শেষ রক্ষা হয়নি।

হাসপাতালের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর আগেই তার জীবন প্রদীপ নিভে যায়। রাত ৮টায় হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার, বন্ধু, সহযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে তাকে বিদায় জানাতে কালশী কবরস্থানে ভোর ৫টার দিকে দাফনের আয়োজন করেন।

শহীদ হৃদয়ের জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তার সংগ্রামের গল্প আজও জীবিত রয়েছে। জুলুম ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার লড়াই চিরকাল আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। হৃদয়ের আত্মত্যাগ একটি প্রদীপের মতো আলোকিত আগামীর পথ দেখাবে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ হৃদয় হাওলাদারের মৃত্যুতে তার পরিবারে গভীর সংকট নেমে এসেছে। উল্লেখযোগ্য কোনো জমিজমা না থাকার কারণে

এবং হৃদয়ের দীর্ঘদিনের ফুসফুসের রোগের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার ফলে তারা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়ে গিয়েছেন। হৃদয় মাসে ১৫,০০০ টাকা উপার্জন করে পরিবারের দেখাশোনা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে সেই উপার্জনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিবারটি আরও বেশি বিপদে পড়েছে। হৃদয় বাদে ৪ সদস্যের পরিবার চালাতে গিয়ে হৃদয়ের বাবা হিমশিম খাচ্ছেন।

স্বজনদের বক্তব্য

শহীদ হৃদয় হাওলাদারের চাচাতো বোন কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে যান। তিনি বলেন, "ও কেমন ছিল বলতে গেলে বুক ফেটে যায়। অমায়িক ব্যবহার ছিল ওর। কথায়, কাজে, চলনে-বলনে কাউকে কষ্ট দিতো না। নিজের ছোট ভাইয়ের চেয়েও ওকে ভালো জানতাম। খারাপ কোনো রেকর্ড ওর নাই। ওর যখন ফুসফুসে অপারেশন হয়েছিল সারা এলাকার মানুষ ওর জন্য কেঁদেছিল। যে যেভাবে পেরেছিল সহযোগিতা করেছিল। পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার পরেও একইভাবে মানুষ কেঁদেছে ওর জন্য। বংশের বড় ছেলে ছিল। লম্বা-চওড়া দেখতে ভালো ভাইটি আমাদের আশা ভরসার প্রতীক ছিল। ফ্যামিলিটা দেখাশোনা করতো। ওর কোনো তুলনা নাই। একটি সোনার পাখি হারিয়ে গেল। সত্যিই ভাইটি আমাদের সম্পদ ছিল।"

প্রস্তাবনা

এই পরিবারের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। প্রথমত, একটি নিরাপদ বাসস্থানের অভাব রয়েছে। বর্তমানে শহীদ পরিবারটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে। দ্বিতীয়ত, বাবার জন্য একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা হলে তিনি স্বাবলম্বী হতে পারবেন। তৃতীয়ত, পরিবারের ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা প্রয়োজন। কেননা, তাদের লেখাপড়া অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

যদি এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়িত হয়, তাহলে পরিবারটি পুনরায় স্বপ্ন দেখার সুযোগ পাবে। একটি নিরাপদ বাসস্থান, বাবার ব্যবসার সুযোগ এবং ছোটদের শিক্ষার নিশ্চয়তা তাদের জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। একটু সহযোগিতা তাদের পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারে। কিন্তু প্রিয় স্বজনকে হারানোর অভাব কখনোই পূরণ হবার নয়।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: হৃদয় হাওলাদার
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-২০০৪
জন্মস্থান	: ঝালকাঠী
পেশাগত পরিচয়	: মুদী দোকানের কর্মচারী
মাসিক আয়	: ১৫০০০/-
আয়ের উৎস	: মুদি দোকানে চাকরি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শিরযুগ, ইউনিয়ন: শিরযুগ প্রতাপপুর, থানা: সদর, জেলা: ঝালকাঠী
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: এভিনিউ-৫, এলাকা মিরপুর ১০, থানা: কাফরুল, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: মো: শহিদ হাওলাদার
পিতার পেশা ও বয়স	: সহযোগী রাজমিস্ত্রী, ৪০ বছর
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৩৬ বছর
মায়ের নাম	: কুলসুম বেগম
ছোট ভাই	: রিয়াদ হাওলাদার (১২), ৫ম শ্রেণিতে পড়ে
ছোট বোন	: মরিয়ম (৫)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০
আক্রমণকারী	: কাফরুল থানার পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ৬ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮ টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: কালশী, মিরপুর

“পরিবারের একমাত্র ভরসা ছিলেন সেও চলে গেলেন রবের তরে।”

শহীদ মোঃ নুর হোসেন

ক্রমিক : ০৩৮

আইডি: ঢাকা সিটি ০৩৮

পরিচিতি

শহীদ নুর হোসেন ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। এসএসসি পাশ করার পর তিনি ঢাকার একটি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হন। পড়শোনার পাশাপাশি তিনি নিজেকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখতেন। তার পিতা জনাব আব্দুর রশিদের আকস্মিক মৃত্যুতে তার জীবনে নেমে আসে এক কালো মেঘের ছায়া। পিতাকে হারিয়ে শহীদ নুর হোসেন এতিম হয়ে যান। মৃত্যুকালে জনাব আব্দুর রশিদ এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। অভাবের সংসারে জনাব আব্দুর রশিদের আয়েই ছেলে-মেয়ের পড়ালেখার সকল খরচ চলত।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে শহীদ নুর হোসেনের মাতা মোছাঃ নুরন্নাহার চিনু সন্তান-সন্ততি নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে সংসারের দায়-দায়িত্ব শহীদ নুর হোসেনের উপর অর্পিত হয়। সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে নিজের পড়াশোনার দিকে আর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। পড়ালেখা করে বড় মানুষ হওয়ার স্বপ্ন তার কুড়িতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দেন। দিন হাজিরা কাজ করে যা আয় হত তা দিয়েই তাদের তিন সদস্যের সংসার চলত। ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ, পরিবারের ভরণপোষণের খরচ বহন করতে তাকে প্রাণপন পরিশ্রম করতে হত। পরিবারের অভিভাবককে হারিয়ে নিজেই অবতীর্ণ হন অভিভাবকের ভূমিকায়। ছোট ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে হয় শহীদ নুর হোসেন কে। তার ছোট ভাই মোঃ আবির হোসেন পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করে। শহীদ নুর হোসেন অল্প বয়সেই পরিবারের পছন্দের এক মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

শহীদ নুর হোসেন ছাত্র অবস্থা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সবসময় সমাজের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করতেন। বাস্তবতার কারণে নিজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে না পারলেও তিনি সবসময় ছাত্রদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, এই অকুতোভয় সাহসী যুবক নিজের জীবটাও বিসর্জন দেন।

৫ আগস্ট ২০২৪ রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশের নৃশংস গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

যেভাবে নুর হোসেন শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করলেন

ছাত্রদের কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলনে আওয়ামী নরপিশাচদের হামলায় মুহূর্তেই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন রুপ নেয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। দেশের মুক্তিকামী মানুষ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। চতুর্দিক থেকে মানুষ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। ১৫ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা নায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শাহাবাগ ও ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গোণ্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গোণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা গোণ্ডাদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটায়ে রক্তাক্ত করে। রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, **"তুমি কে আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার।"** মুহূর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকাসহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। হুমকি, গুম-খুন, হত্যা, গ্রেফতার, জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন দমনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শহীদ নুর হোসেন ছিলেন এই আন্দোলনের একজন সম্মুখ যোদ্ধা। বৈষম্যবিরোধী স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট সোমবার ছাত্র-জনতা লং মার্চ টু গণভবন ঘোষণা করে। সারাদেশ থেকে মুক্তিকামী জনতা গণভবনের দিকে রওনা করে। স্বৈরাচারের ঘাতক-দালাল আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিপথগামী পুলিশ সদস্যরা একত্রিতভাবে ছাত্র-জনতার উপর টিয়ারশেল, ছররা বুলেট, গ্রেনেড, বোমা, সাজোয়াযান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে থাকে। অসংখ্য মানুষ হামলায় আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও অনেকে। তবু ছাত্র-জনতা জুলুমের সাথে আপোষ করেন না। জালিমের বুলেটকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

শহীদ নুর হোসেনও ছিলেন এই আন্দোলনের এক অকুতোভয় সাহসী যোদ্ধা। ছাত্র-জনতার সাথে সেদিন তিনিও যুক্ত হয়েছিলেন। স্বৈরাচারের ঘাতকদের সাথে প্রাণপনে যুদ্ধ করেন। শাহাদাত বরণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এক সাহসী যুবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছাত্র-জনতার তোপের মুখে পড়ে স্বৈরাচার সরকার। অবস্থা বেগতিক দেখে স্বৈরাচার খুনি শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। ৫ আগস্ট ২০২৪ বেলা এগারোটার দিকে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর খুনি শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার যোগে ভারতে পালিয়ে যায়। শেখ হাসিনার পালানোর খবর ছড়িয়ে পরলে সারা দেশে আনন্দ মিছিল বের হয়।

ঢাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা আনন্দ মিছিল নিয়ে গণভবনের দিকে আসেন। কিন্তু স্বৈরাচারের ঘাতক দালাল সন্ত্রাসীরা তাতেও আক্রমণ করে। শহীদ নুর হোসেন আনন্দ মিছিল নিয়ে গণভবনের

উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। যখন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে আসেন তখনই তিনি আক্রমণের শিকার হন। সেখানে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ জনতাকে লক্ষ্য করে অতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামী সন্ত্রাসীর দল। এক পর্যায়ে শহীদ নুর হোসেন গুলিবিদ্ধ হন। কয়েকটি বুলেট এসে তার বুকে লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি সেখানেই শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করেন। ছাত্ররা অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না। তাকে স্থানীয় ডেলটা হেলথ কেয়ার যাত্রাবাড়ী লিমিটেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, তিনি আগেই মারা গিয়েছেন। তার মৃত্যুতে পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সকলেই শোকাহত হয়ে পড়ে।

শহীদ সম্পর্কে তার নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য

শহীদ নুর হোসেনের বন্ধু বোরহান উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪-১৫ সেশনের ছাত্র। তিনি বলেন, "মো: নুর হোসেন আমার স্কুল বন্ধু। সে অনেক ভালো মানুষ ছিল। সবসময় সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় কাজের শেষে আন্দোলন নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তিত ছিল। ১৮ জুলাই থেকে নূর হোসেন নিয়মিত মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করছিলেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বিজয় মিছিলে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ অতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। অনেক মানুষ সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে শহীদ নুর হোসেনও ছিলেন। শহীদ নুর হোসেন চিরকাল আমাদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। আমি আমার বন্ধু হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই এবং তার পরিবারের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।"

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মো: নুর হোসেন একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তার পিতা জনাব মো: আব্দুর রশিদ ১০ বছর আগে মারা যান। শহীদ নুর হোসেনের পরিবারের কোনো নিজস্ব সম্পত্তি নেই। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শহীদ নুর হোসেন রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাতেন। তার একক আয়েই সংসার চলত। তার পরিবার যাত্রাবাড়ীতে একটি ভাড়া বাসায় থাকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন। ছেলেকে হারিয়ে শহীদ নুর হোসেনের মা দিশেহারা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
মোঃ নুর হোসেন
Name
MD. NUR HOSSAIN
মোঃ আব্দুর রশিদ
নুরেন্নাহার চিন্টু
Date of Birth 06 Sep 1996
NID No. 375 252 5471

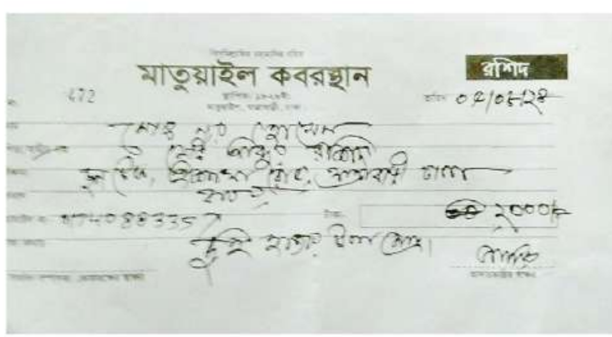

মাতুয়াইল কবরস্থান
রশিদ

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: নুর হোসেন, পেশা: রাজমিস্ত্রি
জন্ম তারিখ	: ০৬/০৯/১৯৯৬
জন্ম স্থান	: ঢাকা
পিতা	: জনাব মো: আব্দুর রশিদ (মৃত)
মাতা	: নুরন্নাহার চিনু, পেশা: গৃহিণী
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর আড়াইটার দিকে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, যাত্রাবাড়ী
দাফন	: মাতুয়াইল কবরস্থান
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শহীদ আব্দুর রহমান জিসান

ক্রমিক : ০৩৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুর রহমান জিসান কুমিল্লার সন্তান। জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮-০৬-২০০১ তারিখে। পৈতৃক নিবাস কুমিল্লা হলেও তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন ঢাকায়। তার স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম : উত্তর পশ্চিমগাঁও, ইউনিয়ন: উত্তর পশ্চিমগাঁও, থানা : লাকসাম, জেলা কুমিল্লা। বর্তমান ঠিকানা: বাসা নম্বর ১৬৬, রায়েরবাগ, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা। বাবার নাম জনাব বাবুল মিয়া, মা মোসা: জেসমিন। **তার মৃত্যুর পর স্বামী শোকে স্ত্রী মিষ্টি আক্তার আত্মহত্যা করে মৃত্যু বরণ করেন।** কুমিল্লা জেলার লাকসাম বাজারে জিসানদের ৬.৫ কাঠার একটি প্লট আছে। জিসানের বাবা একজন প্রবাসী। ঢাকায় তারা ভাড়া বাসায় থাকেন। জিসানের আছে দুই বোন। মোসা: জান্নাতুল ফেরদৌস বিবাহিত। মাইমুনা আক্তার সুমাইয়া অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। জুলাইর শুরুতেই ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবী জানিয়ে আন্দোলন করতে থাকে। আন্দোলন জোরদার হয় পতিত প্রধানমন্ত্রীর একটি কথায়। আন্দোলনকারীদের রাজাকারের বাচ্চা বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল সে। মুহূর্তে আন্দোলন জোরদার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সরকারও চলে যায় হার্ড লাইনে। আন্দোলন দমন করতে প্রয়োগ করে সর্বশক্তি। কার্ফিউ জারি করে। গুলি করে হত্যা করে আন্দোলনকারীদের। জনতা একাত্মতা ঘোষণা করে। রাজপথ থেকে, ভার্সিটির সকল হল থেকে বিতাড়িত হয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ। তবু সরকারের দমননীতি, হত্যানীতি থেমে থাকেনি। রাজপথে প্রতিদিনই বাড়তে থাকে জনতার সমাগম। আন্দোলনকারীদের পাশে থাকে সকল পেশাজীবি ও শ্রমজীবি মানুষ। যার যার অবস্থান থেকে সহায়তা করে প্রত্যেকেই।

শহীদ আব্দুর রহমান শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন। তিনি আর নিজেকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। প্রতিদিনই বিভিন্ন সভা সমাবেশে যোগ দিতে থাকেন। তিনি ছিলেন পানি সরবরাহকারী। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ করতেন। আন্দোলনকারীরা রাজপথে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করছেন। গরমে, ঘামে পানির প্রয়োজনিয়তা দারুণভাবে উপলব্ধি করেন জিসান। তিনি বিভিন্ন পয়েন্টে পানি সরবরাহ করেন বিনামূল্যে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যাত্রাবাড়ির রশিদবাগ পয়েন্টে সেদিন তিনি নিজে থেকে পানি সরবরাহ করছিলেন। হাসিনার পুলিশ বাহিনী রশিদবাগ রোডের মাথায় এসে অতর্কিতে হামলা করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হন জিসান। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। ২০ জুলাই বিকাল ৫:৩০ মিনিটই শহীদ আব্দুর রহমান জিসানের পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত। তাকে মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ আব্দুর রহমান জিসানের শ্বশুর মো: মতিউর রহমান। তিনি বলেন, "জিসান একজন ভালো মনের মানুষ। তিনি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পানি সরবরাহ করতেন। তিনি একজন পরোপকারী মানুষ ছিলেন। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। আমার মেয়ে জিসানকে খুব ভালোবাসতো। তার মৃত্যুতে আমার মেয়ে শোকে কাতর হয়ে যায়। বিষয়টি সে সহ্য করতে পারেনি। নিজেও আত্মহত্যা করে। আমি আমার মেয়ের জামাইর হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আব্দুর রহমানের বাবা ছিলেন প্রবাসী। বিদেশ থাকতে তার মাসিক আয় ছিল ৫০ হাজার টাকা। তিনি এখন দেশে আছেন। জিসান তার বাবার একমাত্র পুত্র। পুত্র শহীদ, পুত্র বধূ আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন। বাবা বিদেশ যেতে পারছেন না। পরিবারটি স্বভাবতই আর্থিক কষ্টে আছেন। পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছেন না। তারা এখন অসচ্ছল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ বাবুল মিয়া
Name
MD BABUL MIYA
পিতা
মোঃ মোবারক মিয়া
মাতা
শামছুনী আকতার
Date of Birth 11 Apr 1983
NID No. 955 031 1972

শহীদের পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র

মানবজমিন
গুলিতে মারা যান জিসান শোকে আত্মহত্যা স্ত্রীর
ফের উত্তপ্ত রাজপ

পড়ছে, তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।
সঞ্জয় উইজেসেকেরা বলেন, 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, বাংলাদেশের স্বাক্ষর করা জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং আটক করা হলে শিশুদের ওপর যে প্রভাব পড়ে তা নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে ইউনিসেফ শিশুদের যেকোনো ধরনের আটক বন্ধের আহ্বান জানায়। এর অর্থ হলো, কোনো স্থানে শিশুদের উপস্থিতি বা তাদের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫

গতকাল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে ফেনীতে, ২৮৮ মিলিমিটার। বিশেষজ্ঞের হিসাবে এটি অতি ভারি (৮৯ মিলিমিটার বা বেশি) বৃষ্টিপাত। কাছের নোয়াখালী জেলার মাইজদীকোর্টে স্থাপিত আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণাগারে ২৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয় এ সময়। এ ছাড়া লক্ষীপুরের রামগতিতে ২২২ মিলিমিটার,

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫

গুলিতে স্বামীর মৃত্যু সইতে না পেরে স্ত্রীর আত্মহত্যা

খায়রুল কবির চৌধুরী ▷

'হ্যারা প্রেম কইরা বিয়ে করছে তো। স্বামীর এমন মৃত্যুর পর মেইকা আমার মেয়ে খাওনদাওন সব ছাইড়া দিছে। যখন বাসায় আমরা কেউ আছিলাম না, এই সুযোগে মেয়েটাও নিজের জীবন শেষ কইরা দিছে। আমার আরেক মেয়ে গেছিল কাঁচাবাজারে। আইয়া দেখে ঘরে ছিটকানি দেওয়া।'

কথা শেষ করার পর কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকলেন মতিউর রহমান। এরপর ভাঙা গলায় এই প্রতিবেদককে বললেন, 'ভাই, অহন আফসোস ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের। আমাদের দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই।'

গত ২০ জুলাই রাজধানীর শনির আখড়ার রায়েরবাগ এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মতিউরের মেয়ের জামাই জিসান আহমেদ (২০)। স্বামীর মৃত্যুশোকে উন্মাদপ্রায় মিষ্টি বেগম (১৯) নাওয়াখাওয়া ছেড়ে দেন। দিনরাত কাঁদতেন। জিসানের মৃত্যুর ৯ দিনের মাথায় গত সোমবার দুপুরে আত্মহত্যা করেন মিষ্টি।

জিসান আহমেদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মিষ্টি বেগম। এই ছবি এখন শুধুই স্মৃতি

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে করেন জিসান ও

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

...মিডিয়া গ্রুপ পিএলসির পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা...
...: ০৯৬১২১২০০০০, ৫৫০৩৬৮০৩-০৬, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩০৯৪৮, বিজ্ঞাপন...

One bullet, two lives and endless agony

Wife of fatally shot 19-year-old dies by suicide

NILIMA JAHAN and RAKSHANDA RAHMAN MISHA

Life had just begun for 19-year-old Jisan Ahmed, a small-time vendor who supplied water to shops in his neighbourhood from his battery-run cycle van.

Just over a year ago, he married the love of his life Mishti Akter. The newlyweds had known each other for three years before they tied the knot.

However, this blooming love story ended tragically, as both of their lives were brutally cut short.

During a clash between protesters and law enforcers

SEE PAGE 10 COL 1

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: আব্দুর রহমান জিসান
জন্ম তারিখ	: ১৮-০৬-২০০১
পিতা	: মো: বাবুল মিয়া
মাতা	: মোছা: জেসমিন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর পশ্চিমগাঁও, ইউনিয়ন: উত্তর পশ্চিমগাঁও, থানা: লাকসাম, জেলা: কুমিল্লা
পেশা	: ফিল্টার ব্যবসায়ী (পানি সরবরাহকারী)
আঘাতের ধরন	: পুলিশের গুলিতে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ
সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫:৩০
মৃত্যু	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫:৩০
ঘটনার স্থান	: রশিদবাগ রোডের মাথায়, রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ি
শহীদের কবর	: মাতুয়াইল কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. বাবার জন্য কোনো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে ভালো হবে

৩. ছোট বোনের লেখাপড়ার খরচের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে

"আমার ভাই আবু সাঈদ শহীদ হয়েছে যদি আমিও শহীদ হয়ে যাই, তাহলে হাসি মুখে বিদায় দিও।"

শহীদ মোঃ আরিফ

ক্রমিক : ০৪০

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আরিফ ২০০৭ সালের ২৩ মার্চ ভোলা জেলার লালমোহন থানার অন্তর্ভুক্ত লর্ডহাডিঞ্জ ইউনিয়নের লালচাঁদপুর ৮নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোঃ ইউসুফ ও মা ফরিদার কোল আলো করে তার আগে ও পরে জন্ম নেয় আরও ৫ সহোদর বোন। জনাব ইউসুফের নিজস্ব বা পৈত্রিক কোনো ভিটেমাটি নেই। এ কারণে বিয়ের পর তিনি শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করে স্ত্রী ও ছয় সন্তান নিয়ে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থায় চলছিল তাদের পরিবার। বৃদ্ধ বাবাকে সহযোগিতা করতে, বোনদের পড়ালেখার খরচ জোগাতে ছাত্রাবস্থাতেই আরিফ কাজের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান যান্ত্রিক শহর ঢাকাতে।

জীবনযুদ্ধেও লড়াকু এক সৈনিক শহীদ আরিফ

অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আট সদস্যের পরিবারটি চালাতে বেশ হিমসিম খেতে হতো আরিফের বাবার। একে একে বড় তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করার পর বয়সের ভারে তিনি নুয়ে পড়লে পরিবারটির হাল ধরেন শহীদ আরিফ। অসুস্থ বাবার পাশাপাশি ছোট দুই বোনের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সারথী হন শহীদ নিজেই। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন ঢাকায়, শুরু করেন তার নিজের মামাতো ভাইয়ের ভাতের দোকানে কর্মচারীর কাজ। অন্যদিকে চলছিল জীবনের প্রতিটি ধাপে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া মেধাবী শহীদ মো: আরিফের ব্যক্তিগত পড়াশোনাও। তখনও তিনি ভোলা জেলার লালমোহন থানার একটি স্থানীয় সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

বৈষম্যের প্রতিবাদে শহীদ আরিফ

প্রবল কোটা সংস্কার আন্দোলনের মুখে, স্বৈরাচারী হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত কোটাপদ্ধতি বাতিল করে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে করা এক রিটে প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করে গত ৫ জুন রায় দেন হাইকোর্ট। আর চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৫ জুন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (নবম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন আদালত। এর পরদিন পরিপত্র বাতিলের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বৈষম্য বিরোধী এই যৌক্তিক আন্দোলন। হোটেলে কাজের বিরতিতে আন্দোলনে যুক্ত হতেন শহীদ মো: আরিফ নিজেও।

শেষ বিদায় নিলেন যখন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিরস্ত্র ছাত্রদের দমাতে প্রথম থেকেই মারমুখী ছিল স্বৈরাচারের গৃহপালিত পশুতে পরিণত হওয়া পুলিশ আর আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের সন্ত্রাসীরা। ঢাকায় ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচীতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ ও এর সন্ত্রাসী বাহিনী গুলো। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে যারা আন্দোলন করছিলেন, তাদের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন আবু সাঈদ। ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী তিনি। ১৬ জুলাই আন্দোলনের সময় দুই হাত প্রশস্ত করে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবু সাঈদ। নিরস্ত্র আবু সাঈদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন আবু সাঈদ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, দেশ বিদেশের পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় দু হাত প্রশস্ত করা প্রতিবাদী আবু সাঈদের ছবি। পুরো বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে আবু সাঈদের মৃত্যুতে। চারিদিকে আন্দোলনের দামামা বেজে উঠলো এবং তা সঞ্চারিত হলো মো: আরিফের মধ্যেও। বাড়িতে বাবাকে ফোন দেন তিনি। পিতার ভাষ্যমতে তার শেষ কথা ছিল, আমার ভাই আবু সাঈদ শহীদ হয়েছে। যদি আমিও শহীদ হয়ে যাই, তবে যেনো হাসি মুখে বিদায় জানাই। এরপর আর সে কথা বলতে পারেনি।

সেদিনের হৃদয়বিদারক ঘটনা

ছাত্র আন্দোলনের ডাক আসলে প্রতিদিনের মতো সেদিনও আন্দোলনে চলে যায় আরিফ। দিনটি ছিল ১৯ জুলাই, বিকাল আনুমানিক তিনটা। যাত্রাবাড়ি এলাকায় তখন ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। বাঁধা দেয় স্বৈরাচারের পুলিশ ও

যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। নিরস্ত্র মানুষ গুলোর ওপর নির্বিচারে লাঠি চার্জ, টিয়ারশেল, ছররা গুলি, রাবার বুলেট, হ্যান্ড গ্রেনেড ও গুলিবৃষ্টি চালানো হয়। উচুঁ ভবন থেকে টার্গেট করে করে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের হত্যা করা হয়। হেলিকপ্টার থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে ছোড়া গুলিতে নিহত হয় অসংখ্য তাজা প্রাণ। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আরিফ ছাত্র-জনতাকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। আরিফের তৎপরতা ঘাতক পুলিশ ও স্বৈরাচারী সন্ত্রাসী বাহিনীর নজরে পড়ে। তাদের চারদিক থেকে অতর্কিত হামলায় রাজপথ রক্তাক্ত হতে থাকে। এমনই একটি মুহূতে বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, মোঃ আরিফ। নামের সাথে যুক্ত হয় একটি বিশেষণ 'শহীদ'!

ধর্মপরায়ণ শহীদ আরিফ

নিয়মিত সালাত আদায় করতেন তিনি। মসজিদের মুসল্লীবৃন্দের সাথে বরাবরই সখ্যতা ছিল তার। শহীদ আরিফের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, তার দোকান মালিক মামাতো ভাই, শাহাবুদ্দিন বলেন, "নিয়মিত নামাজ আদায় করত আরিফ। আমার অবর্তমানে, আমার দোকান চালাত সে। ওর আমানতদারীতা ছিল বেশ।"

পরিবারের সার্বিক অবস্থা ও সহযোগিতা প্রসঙ্গ

প্রথম প্রস্তাবনাঃ তারা ভূমিহীন পরিবার। সেক্ষেত্রে, ভূমি ও একটি আবাসযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে পরিবারটির সহযোগিতা হতো।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনাঃ শহীদের সহোদর দুই বোনের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাসিক ভিত্তিতে কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

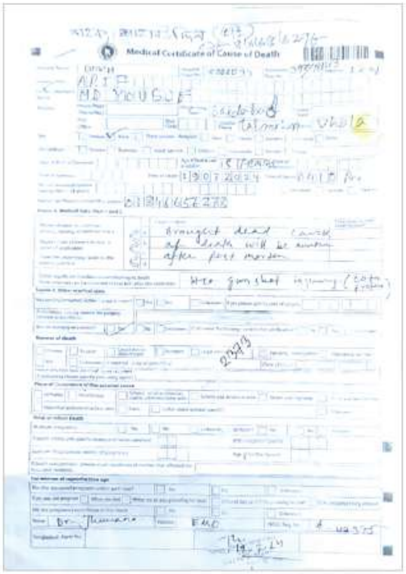

Medical Certificate of Cause of Death

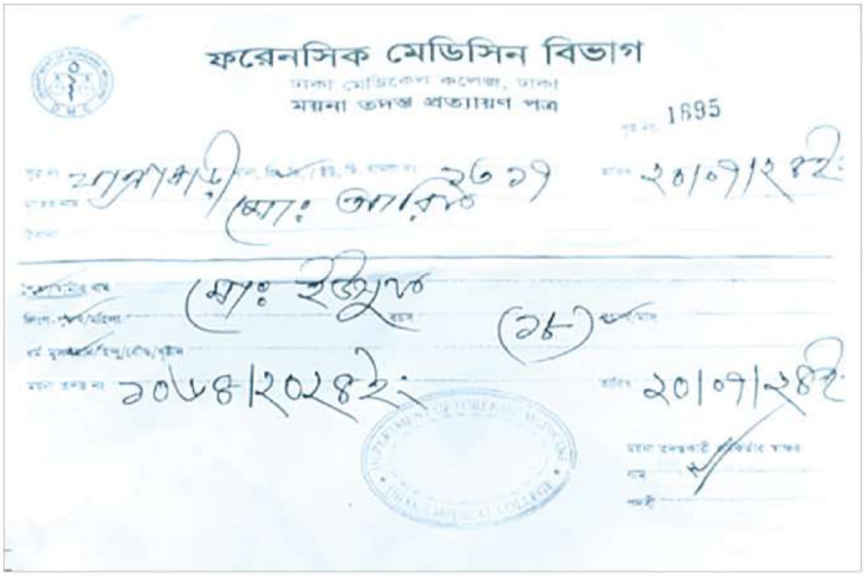

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র

1895

একনজরে শহীদ আরিফ সম্পর্কিত তথ্য

পূর্ণ নাম	: মো: আরিফ
জন্মতারিখ	: ২৩ মার্চ ২০০৭
জন্মস্থান	: ভোলা জেলা
পেশাগত পরিচয়	: ছাত্র
শ্রেণি	: আলিম দ্বিতীয় বর্ষ
প্রতিষ্ঠান	: লাটারি সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা, লালমোহন, ভোলা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চাঁদপুর, ইউনিয়ন: লর্ড হার্ডিঞ্জ, উপজেলা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
ঢাকায় থাকাকালীন ঠিকানা	: মহল্লা: বিরবাগিচা ৪নং রোড, থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: মো: ইউসুফ
পিতার পেশা	: কৃষক
মাতার নাম	: ফরিদা
মাতার পেশা	: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৮
পারিবারিক মাসিক আয়	: কমবেশি ১০ হাজার টাকা

শহীদ মোঃ সাজিদ হাওলাদার

ক্রমিক : ০৪১

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪১

শহীদ পরিচিতি

মোঃ সাজিদ হাওলাদার। তার সবচেয়ে গৌরবজনক পরিচয় তিনি ২৪ এর বিপ্লবের একজন গর্বিত শহীদ। দেশের জন্য তিনি অকাতরে দান করেছেন নিজের জীবন। তার বাবার নাম জনাব সুলতান হাওলাদার। মাতার নাম চায়না বেগম। সুন্দরকাবী গ্রামটি ঘোমদুধাল ইউনিয়নে অবস্থিত। বাকেরগঞ্জ থানা বরিশাল জেলার একটি কাব্যময় নাম সুন্দরকাবী গ্রাম। সে গ্রামেরই সন্তান শহীদ মো সাজিদ হাওলাদার। তার অবস্থান ছিল ঢাকায়। ঢাকার ঠিকানা ৭ নং বাবুর বিল্ডিং, শাহাবুদ্দিন রোড, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। পেশায় ছিলেন একজন অটো চালক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ০১-০২-২০০৩ তারিখে।

পারিবারিক জীবনে শহীদ সাজিদ ছিলেন সংগ্রামী মানুষ। শৈশবেই বাবা মায়ের বিচ্ছেদ। জীবন তার হয়ে উঠে দুঃখময়। তার ইচ্ছা ছিল পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হওয়া। দারিদ্রতা আর অভিভাবক শূন্যতার কারণে তিনি লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হন। জীবন টিকিয়ে রাখতে নেমে পড়েন সংগ্রামে। সংগ্রামী জীবনেই বিয়ে করেন। জীবন অতিবাহিত করতে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন অটো চালানো। এভাবেই জীবন চলছিল। নিজের কোনো বাসস্থান ছিল না। শ্বশুরবাড়ি ছিল আশ্রয়ের কেন্দ্র। ঢাকায় থাকতো ৫০০০ টাকা ভাড়া বাসায়। ৫ আগস্ট তার জীবনের সমাপ্তি ঘটায় পতিত সরকারের হিংস্র পুলিশ।

ঘটনার বর্ণনা

৫ আগস্ট বলা হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনের দিন। এ দিন দুপুরে পালিয়ে যায় শেখ হাসিনা। আত্মগোপনে চলে যায় আওয়ামী সরকারের সকল মন্ত্রী এমপিরা। জুলাইয়ে শুরুতেই কোটা বিরোধী আন্দোলনে তপ্ত হতে থাকে দেশ। ক্রমশঃ আন্দোলন ছাত্র থেকে ছাত্র-জনতায় বর্ধিত হয়। স্বৈরশাসকের পতনের আন্দোলনে রাজপথে নেমে আসে জনতা। সরকার শুরু করে দমন পীড়ন। জনতার বুকে ছুঁড়ে গুলি। শত শত মায়ের বুক খালি করে হাসিনা সরকার। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবির সাথে হত্যা মিশনে যোগ দেয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। মিছিলে গুলি করে। আন্দোলন তবু থামে না। ৪ আগস্ট খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনী একদিনে খুন করে শতাধিক মানুষ। গদি রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে হাসিনা। আন্দোলনকারীরা ডাক দেয় লং মার্চের। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী ছিল ৬ আগস্ট লং মার্চ টু ঢাকা ৬।

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কর্মসূচি একদিন সামনে নিয়ে আসা হয়। সরকার ইতিপূর্বেই কার্ফিউ দিয়ে দেশকে থমথমে পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। লং মার্চ টু ঢাকার উদ্দেশ্য গণভবন ঘেরাও।

৫ আগস্ট সারা ঢাকা অবরুদ্ধ। যেন যুদ্ধ নগরী। সকল বাঁধা উপেক্ষা করে জনতা ঢাকায় প্রবেশ করে। জনজোয়ার ঢাকায়। হাজার হাজার,লক্ষ লক্ষ জনতা। কোটি জনতার স্লোগানে ঢাকার রাজপথ কাঁপছে। বেলা একটার দিকেই বাতাসে খবর আসে পদত্যাগ করছেন হাসিনা। সেনাবাহিনীর অবস্থান শিথিল হয়ে যায়। ঢাকার মিরপুর ১০ এ লক্ষ লক্ষ জনতা সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে গণভবনের দিকে যাত্রা করে। দুইটায় বিজয় স্মরণীর কাছে পৌঁছাতেই আকাশে পরপর দুটো বিমান উড়তে দেখা যায়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত পলাইছে রে পলাইছে, শেখ হাসিনা পলাইছে। জনতার জয় হয়। আন্দোলনকারীরা বিজয়ী হয়।

বিজয়োল্লাসে নেমে পড়ে মানুষ। সব মানুষ যেন রাস্তায় নেমে আসে। অংশগ্রহণ করে বিজয় আনন্দে। সাজিদ হাওলাদারও সেই আনন্দে যোগ দেন।

সাজিদ হাওলাদার ছিলেন গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকারের জন্য সোচ্চার একজন তরুণ। দেশের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা দেশ ছাড়ার খবরে তিনি আনন্দ মিছিলে অংশ নেন।

হাসিনা পালিয়ে গেছে

কোথাও কোথাও তখনও তার দোসররা রয়েছেন সক্রিয়। অনুগত পুলিশ বাহিনী আর যুবলীগের গুণ্ডাবাহিনী আগের মতোই করতে থাকে খুনি আচরণ। সাজিদরা বিজয় আনন্দ উপভোগ করে ফিরছেন। রাত তখন ১২ টা। ৫ আগস্টের দিবাগত রাত। সাজিদ ও তার বন্ধুরা পৌঁছায় মেরুল বাড্ডায়। ওখানকার পুলিশ বাহিনী তখনও গুলি ছুড়তে থাকে জনতার দিকে। পুলিশের ছোড়া একটি গুলিতে নির্মম নিহত হন সাজিদ। গুলিবিদ্ধ সাজিদকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত ঘোষণার পর লাশ রাখা হয় অজ্ঞাত হিসেবে মর্গে। ৬ আগস্ট তার স্ত্রী লাশ সনাক্ত করেন। তার মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ৫ টি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।

সাজিদ হাওলাদারের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের মানুষ তাদের প্রিয় সন্তানকে চিরনিদ্রায় শায়িত করতে জড়ো হয়েছিলেন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে। তাকে বরিশালে নিজ এলাকায় স্থানীয় কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি।

সাজিদ খুব ভদ্র বিনয়ী ছিল। তার প্রতিবেশীদের মতে সে কখনও কারও সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতো না। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতো। বন্ধুদের সাথে ছিল সুসম্পর্ক। সাজিদ ছিল মিশুক স্বভাবের মানুষ।

তার শ্বশুর বলেন, "সাজিদ আমার ছেলের মতো। খুব ভালো ছেলে ছিল। আমি আমার মেয়ে জামাইর খুনিদের বিচার চাই।"

পারিবারিক অবস্থা

পিতামাতা আলাদা থাকায় একক জীবনই কেটেছে তার। বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার। শরনা আক্তার নামে ২ বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান আছে তার। তার আশ্রয় ছিল শ্বশুরবাড়ি। সাজিদ ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। তিনি মারা যাওয়ায় তার স্ত্রী শিশু কন্যাকে নিয়ে চরম সংকটে দিনযাপন করছেন। মারা যাওয়ার আগে ব্রাক ব্যাংক থেকে নিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা ঋণ। এটি একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারটির ঘাড়ে।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ সাজিদ হাওলাদার
জন্ম তারিখ	: ০১-০২-২০০৩
পিতা	: সুলতান হাওলাদার
মাতা	: চায়না বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সুন্দরকাবী, ইউনিয়ন: ঘোমাদুধাল, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	: ০৭ নং বাবুর বিল্ডিং, শাহাবুদ্দিন রোড, উত্তর বাড্ডা ঢাকা
সংসারে সদস্য	: স্ত্রী ও দুই বছরের এক কন্যা
পেশা	: অটো চালক
শাহাদাত চিত্র	: মেরুল বাড্ডায়, ৫ আগস্ট রাত ১২টায় পুলিশ গুলি করে। মাথায় ও অন্যান্য স্থানে বুলেটবিদ্ধ হন, ধারণা করা হয় তখনই মারা যান। ঢাকা মেডিকেল মর্গে লাশ সনাক্ত হয় ৬ আগস্ট।
মৃত্যু	: ৫-০৮-২০২৪, রাত বারোটায়

প্রস্তাবনা

স্ত্রীর জন্য জরুরি এককালীন নগদ অর্থ

মাসিক অনুদান / ভাতা দেওয়া প্রয়োজন

মেয়ে শিশুটির ভরণপোষণ ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলার যাবতীয় সহযোগিতা দরকার

"আমার ভাতিজি জামাই খুব ভালো চরিত্রবান আর পরোপকারী মানুষ ছিল"

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর

ক্রমিক: ০৪২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর ১৯৬৯ সালের ২৩ অক্টোবর পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন আমখলা ইউনিয়নের বাউরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম রতন খা এবং মাতা মরহুমা জরিনা খাতুন। জনাব জাহাঙ্গীর পেশায় একজন সিএনজি চালক ছিলেন। স্থায়ী ঠিকানা পটুয়াখালী হলেও পরিবার নিয়ে রাজধানী ঢাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন তিনি। জুলাই বিপ্লব তথা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করে তিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করেন।

একজন সিএনজি চালক যে কারণে শহীদ হলেন

কথায় আছে এদেশের রিকশাচালক, সিএনজি চালক গণমানুষের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। রাজপথের বহু ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষীও তারা। এই কথারই স্বার্থক দৃষ্টান্ত হলেন শহীদ মো: জাহাঙ্গীর।

দেশ যখন রসাতলের অতল গহ্বরের দিকে ধাবমান; রাষ্ট্র যখন অদক্ষ, অসৎ, দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের মাধ্যমে ন্যাক্কারজনকভাবে পরিচালিত; বাজার যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অত্যাচারে জর্জরিত; জাতি যখন অভিশপ্ত স্বৈরাচারের নির্মম নৈরাজ্যে আক্রান্ত; ক্ষতবিক্ষত এদেশের আপামর জনতা তখন নিজ নিজ জায়গায় প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত, ব্যথিত এবং প্রচন্ডভাবে হতাশায় নিমজ্জিত।

আর এই হতাশা থেকে আশার আলো নিয়ে; পরাধীনতা থেকে মুক্তির ডাক নিয়ে; বৈষম্যতা থেকে অধিকারের বার্তা নিয়ে জাতির সামনে এসে প্রথমেই শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সাধারণ শিক্ষার্থী। তাদের দাবি, মেধার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হোক। সরকার ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে মেধা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিবেচনা করা হোক। ছাত্রদের এই হক কথা; ন্যায্য দাবিকেও হেয় প্রতিপন্ন করলো নাটকবাজ আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালেও এই দাবি নিয়ে রাজপথে নেমেছিল সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তখনও চোর-ডাকাতের এই সরকার থামিয়ে দিয়েছিলো শিক্ষার্থীদের। এক সাগর কষ্ট বুকে নিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিল রাজপথ থেকে। আসলেই কি তাই? না। সেটা ছিলো মূলত উদ্যোম গতিতে ফেরার জন্য কিছুটা পিছু হটা।

তাইতো ২০১৮ সালের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনই নাম পরিবর্তন করে ২০২৪ সালে ফিরে আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়ে। এবারো তারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের দাবি পেশ করে। অথচ স্বৈরাচার সরকারের নানাবিধ টিটকারি, হঠকারিতা আর নির্লজ্জ হাস্যরসিকতা এই স্বাভাবিক দাবীকে এক বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ নিতে বাধ্য করছে যেন। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, মিডিয়ায় বিবৃতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখনী এবং সরকারের সাথে আলোচনার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

কিন্তু খুনি সরকার শিক্ষার্থীদের এমন প্রচেষ্টাকেও কোনরকম গায়ে-ই মাখলো না। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলো তাদের। তারা শিক্ষার্থীদের সুশৃংখল মানববন্ধনে করলো লাঠিচার্জ! শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মারলো টিয়ারসেল, রাবার বুলেট! শোকের মিছিলে করলো গুলি! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে-হোস্টেলে, বাসা-বাড়িতে গিয়ে শুরু করলো তল্লাশির নামে নৈরাজ্য! মধ্যরাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘুম, খুন, হত্যা! পথে-ঘাটে হামলা-মামলা গণগ্রেপ্তার! শিক্ষার্থীদের হাতে পরানো হলো হাতকড়া! কোমরে রশি! পায়ে পরালো ডান্ডাবেড়ি! প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার বাহিনীর পাশাপাশি রাজপথে নামানো হলো চরিত্রহীন ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের গুন্ডাদের।

এই দেশ আমার বাবার দেশ। এটা আমাদের ফিরে পাওয়া জমিদারি। তোরা সব রাজাকারের নাতিপুতি। এমনই ছিল যেন খুনি সরকারের মনোভাব। যার কারণেই কোটা বিরোধী বা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়ে যায় দেশের সকল স্তরের সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে একত্বতা ঘোষণা করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসে । তাদের সোজা কথা, দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবে না। শুরু হলো পরীক্ষা বয়কট, ক্লাস বয়কট আর অবৈধ সরকারের সাথে অসহযোগিতা।

একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রের হত্যাকারী সরকার দেশব্যাপী সাধারণ শিক্ষার্থীদের এরকম গণজাগরণ দেখেও কেবলমাত্র নিজেদের অহমিকা, একঘেয়েমিতা আর ক্ষমতার বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্যই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে দিল। যেভাবে পারছে সেভাবেই তারা ছাত্র হত্যা করতে লাগলো। পিটিয়ে, কুপিয়ে, জখম করে, গুলি করে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে লাগলো ছাত্রত্বের আজীবন কলঙ্ক গুন্ডা ছাত্রলীগ।

বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন শহীদ জাহাঙ্গীরের মত দক্ষ সিএনজি চালকও কি বসে থাকতে পারে? তার হৃদয়ে কি দাগ না কেটে পারে? না, পেশায় সিএনজি চালক হলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা দেখে সমাজ সচেতন একজন জাহাঙ্গীর আর বসে থাকতে পারে না। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই

প্রতিদিন শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী। নিজের সন্তানতুল্য আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের নিজের সিএনজিতে করে নিয়ে যখন ছুটছেন হাসপাতালে হাসপাতালে। এরপর তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন কী করে? তিনিও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ।

তার মনেও নানা ধরনের প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি ভাবতেন, এই দেশ কি আমার? এখানে আমার আর আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ কি? আমার সন্তানদের নিরাপত্তা কোথায়? আমরা কি আসলেই বেঁচে আছি? নাকি জীবন্ত লাশ? আমরাও কি আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের মতো বিমুর্ত হয়ে বেঁচে আছি? এরকম শত সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠতো জনাব জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে। কোনো উত্তরই তিনি খুঁজে পেতেন না। আর যখন খুঁজে পেলেন,তখন নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের পাশেই।

আসলেই তো! এই যে শিক্ষার্থীদের জন্য তার মন কাঁদে; কম ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছুটোছুটি করেন; নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্তনাদে যে তার খুব কষ্ট হয়, এটা কেন?

আস্তে আস্তে তিনি বুঝতে পারেন নিজের অজান্তেই এতোদিন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এসেছেন। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে দিলেন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে। সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে প্রকাশ্যে এবং পুরোপুরিভাবেই যোগদান করবেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে।

যেই ভাবনা সেই কাজ। আপনজনদের কারও কারও সাথে মতবিনিময়ও করেন শহীদ জাহাঙ্গীর। কারো কারো সমর্থনও পেয়ে যান তিনি। প্রতিদিন সিএনজি চালিয়ে যা উপার্জন হত তা থেকেই একটা অংশ ব্যয় করতেন আন্দোলনের জন্য। এভাবেই আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হলেন

ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে তাদের যাবতীয় সহযোগিতা করতে থাকেন শহীদ মো: জাহাঙ্গীর। ২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে ঢাকার যাত্রাবাড়ীর কাজলায় ছনটেক স্কুল রোডে তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মাঝে রুটি বিস্কুট এবং পানি বিনামূল্যে সরবরাহ করছিলেন। এমন সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ঘাতক পুলিশ গুলি করলে শিক্ষার্থীদের মাঝে থাকা জনাব জাহাঙ্গীর গুলিবিদ্ধ হন। সাথে সাথেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে সাহসী কিছু ছাত্র তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। গুরুতর আহত জাহাঙ্গীর

চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই বিকাল ৬টা ৩০ মিনিটে জান্নাতের মেহমান হওয়ার বাসনা নিয়ে মহান রবের দাওয়াত কবুল করে শাহাদাতের অমৃত পেয়ালা পান করেন। দেশবাসী হারায় এক সহজ সরল চরিত্রবান সাহসী বীরকে।

পরের দিন ২১ জুলাই ২০২৪ রবিবার, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন আমখলা ইউনিয়নের বাউরিয়া গ্রামে জানাজা শেষে শহীদ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে দাফন করা হয়।

পরিচিতজনদের মন্তব্য

শহীদ জাহাঙ্গীর সম্পর্কে তার প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তিনি একজন শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কোনো অন্যায় কাজে তিনি জড়িত ছিলেন না। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। মানুষের বিপদে নিজের কষ্টকে উপেক্ষা করেও তিনি তাদের পাশে থাকতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনেও সেই ধারাবাহিকতা রাখতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। প্রতিবেশীরা মনে করেন, দেশের বিপদে এগিয়ে আসা এই মহান শহীদের নিঃস্ব পরিবারটির জন্য জরুরীভাবে নিয়মিত সহায়তা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে শহীদ জাহাঙ্গীরের চাচাশশুর মোহাম্মদ আব্দুল আলিম সাহেব বলেন, "আমার ভাতিজি জামাই খুব ভালো, চরিত্রবান আর পরোপকারী মানুষ ছিল"। তার এমন করুন মৃত্যুতে তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন এবং সরকার ও দাতা সংস্থাকে অসহায় পরিবারটির সহায়তায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর এর জন্মস্থান এবং স্থায়ী ঠিকানা পটুয়াখালী হলেও পরিবার নিয়ে তিনি ঢাকাতেই থাকতেন। পিতা-মাতা হারা শহীদ জাহাঙ্গীরের গ্রামে ৩ শতাংশ জমি থাকলেও সেখানে কোনো বাসা বাড়ি নেই। শহীদের পরিবার এখনো ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার ৬২ নং ওয়ার্ডের কাজলা প্রধান সড়ক ছনটেক আবাসিকে ভাড়া বাসায় থাকে। শহীদ জাহাঙ্গীর পারিবারিক জীবনে ৫ সন্তানের জনক। তার বড় ছেলে মো: রবিউল ইসলাম (১৭) বঙ্গমার্কেটে একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী।

বড় মেয়ে রিয়া আক্তার (১৬) লাইসিয়াম আইডিয়াল হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। অপর তিন সন্তান যথাক্রমে নাবিউল ইসলাম (০৬), সামিউল ইসলাম (০৪) এবং মিনহা আক্তার (০২) এখনও অবুঝ শিশু। স্ত্রীসহ সাত সদস্যের পরিবারে শহীদ জাহাঙ্গীর ছিলেন একমাত্র অভিভাবক। বড় ছেলে রবিউল ইসলামের সামান্য বেতনেই এখন কোনরকমে টেনেটুনে দিনাতিপাত করছে নিঃস্ব শহীদ পরিবারটি। অন্যান্য সন্তানেরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের পক্ষে পরিবার পরিচালনায় আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। চরম এক দুর্দশায় প্রতিটি দিন পার করছে তারা। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে শহীদ সন্তানদের লেখাপড়াসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক অনেক কিছুই।

এমতাবস্থায় যদি এই পরিবার পরিচালনার জন্য মাসে অন্তত ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা যেত; কিংবা বড় ছেলেকে ব্যবসা করার জন্য ফান্ড করে দেয়া যেত; অথবা চারজন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ পরিচালনার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে হয়তো অসহায় ও মানবেতর জীবন যাপন করা থেকে বেঁচে যেতে পারতো চব্বিশের বিপ্লবের শহীদ, পরোপকারী মানুষটার রেখে যাওয়া পরিবারটি।

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর এর সংক্ষিপ্ত তথ্য

পূর্ণ নাম	: মো: জাহাঙ্গীর
জন্ম	: ২৩ অক্টোবর ১৯৬৯
জন্মস্থান	: পটুয়াখালী
পিতার নাম	: রতন খা (মৃত)
মাতার নাম	: জরিনা খাতুন (মৃত)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- বাউরিয়া, ইউনিয়ন- আমখলা, থানা- গলাচিপা, জেলা- পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: ছনটেক আবাসিক, প্রধান সড়ক, কাজলা, ৬২ নং ওয়ার্ড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
পেশাগত পরিচয়	: সিএনজি চালক
মাসিক আয় ছিল	: ৩০ হাজার টাকা
পরিবারের বর্তমান সদস্য	: ০৬
ঘটনার স্থান	: ৬২ নং ওয়ার্ড, ছনটেক স্কুল রোড, কাজলা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
আঘাতকারী	: ঘাতক পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২.০৫
মৃত্যুর তারিখ সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৬.৩০, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কবরের বর্তমান অবস্থান	: বাউরিয়া, আমখলা, গলাচিপা, পটুয়াখালী

"মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছেলেটিও
স্বৈরাচারের বলি হলেন।"

শহীদ মো: ইমন হোসেন আকাশ

ক্রমিক : ০৪৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ইমন হোসেন ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান ঢাকার শরীয়তপুরে। তার পিতা মো: মতিউর রহমান এবং মায়ের নাম মোসা: বেবী আক্তার। জন্মের কিছুদিন পরেই পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ঘটে। শহীদ ইমন তার মায়ের কাছেই বড় হতে থাকেন। তার মা ছাত্রদের মেসে রান্নার কাজ করে তাকে লালন-পালন করতেন। ইমন বড় হয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শিখে সংসারের হাল ধরেন। মা-ছেলে মিরপুরের পল্লবীতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার মা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। প্রায় সময় তিনি অসুস্থ থাকেন। অসুস্থ মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল ছেলে ইমন। ছোট থেকেই সে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শহীদ ইমন ছিলেন নির্লোভ, কষ্ট সহিষ্ণু, কর্মচঞ্চল ও ত্যাগী যুবক। তার আচরণে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন ও সহকর্মীরা খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

শহীদ মো: ইমন ছোট থেকেই তার পরিবারে এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আসছেন। শৈশবেই তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং বাবা অন্যত্র বিয়ে করে। শহীদ ইমন ও তার মায়ের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ছেলেকে আকড়ে ধরেই বাঁচতে চেয়েছিলেন মা। কিন্তু তা আর হল না। ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরে পুলিশ বাহিনীর গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন শহীদ ইমন হোসেন আকাশ।

যেভাবে শহীদ হলেন ইমন হোসেন

২৪ এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত হাসিনার দীর্ঘ ১৬ বছরের দুঃশাসনের ফসল। ক্ষমতায় এসেই হাসিনার সরকার অন্যায় অত্যাচার শুরু করে। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। আওয়ামীলীগের এমপি মন্ত্রীরা একেকটা রাঘব বোয়ালে পরিণত হয়। উন্নয়নের নাম করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে। দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজ, মানি লন্ডারিং, কালোবাজারি, সিন্ডিকেটরে মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়।

আওয়ামী সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে। জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু এই খাতটাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয়। শিক্ষা বিভাগে অযোগ্য লোকদের বসিয়ে এই খাতটাকে কলংকিত করে। সৃজনশীলতার নাম করে দেশকে মেধাশূণ্য করার সব রকম আয়োজন সম্পন্ন করে। ২০২৪ সালে নতুন এক কারিকুলাম প্রণয়ন করে নৈতিকতা বিবর্জত এক জাতি গঠনের ষড়যন্ত্র করে। অভিবাবকরা প্রতিবাদ করলে তাদের প্রতিহত করতে অমানবিক পন্থা অবলম্বন করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয় অযাগ্য লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে জাতিকে মেধাশূন্য করে ফেলে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয় লোকদের নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে দেশের পুলিশ ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দেয়। পুলিশ বাহিনীর উপর মানুষের চরম ঘৃণা আর ক্ষোভ জন্ম নেয়।

ক্রমবর্ধমান বাজার মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন একদম অতীষ্ঠ হয়ে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণির মানুষ অতিরিক্ত বাজার মূল্য বহন করতে না পেরে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে থাকে। চারদিকে ধনী-গরীবের বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে।

দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। অথচ সমাধানের কোনো উদ্যোগা দেখা যায় না। সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের চরমভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়। অযোগ্য লোকজন দিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়। দেশের মেধাবীরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। বিসিএসে ৫৬% কোটা বহাল রাখা হয়। এছাড়াও সরকারের সকল চাকরিতে ৮৫% পর্যন্ত কোটা চালু করা হয়। বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে ছাত্র-জনতা সোচ্চার হয়ে উঠে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাঠে নামে ছাত্র-জনতা।

আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ২০১৮ সালে। ডাকসুর ভিপি নুরের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা দাবী আদায়ে মাঠে নামে। আন্দোলন দমাতে নুরুর উপরে হামলা করে ক্ষমতাসীনদের দোসররা। ছাত্রলীগ হামলা চালায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর। আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী এক নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথা বাতিল ঘোষণা করে।

২০২৪ সালে এসে হাইকোর্ট এক আদেশে এই নির্বাহী আদেশকে বাতিল ঘোষণা করে। আবরও শুরু হয় আন্দোলন। ছাত্রদের কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলনে আওয়ামী নরপিশাচদের হামলায় মুহূর্তেই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন রুপ নেয় বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে। দেশের মুক্তিকামী মানুষ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। চতুর্দিক থেকে মানুষ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। ১৫ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা নায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শাহাবাগ ও ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের ন্যায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গোণ্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গোণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা গোণ্ডাদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনেরাও রক্ষা পায়নি। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটাতে

থাকে। রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে, "তুমি কে আমি কে?- রাজাকার, রাজাকার।" মুহূর্তেই ৭১'র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। এ ছিল এক বড় আয়রনি।

৪ আগস্ট ২০২৪ রবিবার দুপুর ১টার সময় ইমন হোসেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে বাসা থেকে বের হয়। মিরপুর ১০ এ এসে অবস্থান নেন। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ। ছাত্র-জনতা ইট পাটকেল ছুড়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালালে সেখানে ছাত্র জনতা টিকে থাকতে পারে না। কাঁদানো গ্যাসের ধোঁয়ায় চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী গুলি বিদ্ধ হয়ে রাস্তায় মুখ থবিড়ে পড়ে। অনেকে সেন্সলেস হয়ে যায়। আহত হয় শতাধিক। মুহূর্তের মধ্যেই মিরপুর ১০ এলাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ ইমন হোসেন আকাশ গুলিবিদ্ধ মানুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু করে দেয়। পানি নিয়ে এগিয়ে যান পিপাসার্তদের পানি পান করাতে। কিন্তু পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলির মধ্যে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। মাগরিবের কিছু সময় আগে ঘাতক বাহিনীর একটি গুলি এসে ইমনের মাথার ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করে বামপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরন করেন তিনি।

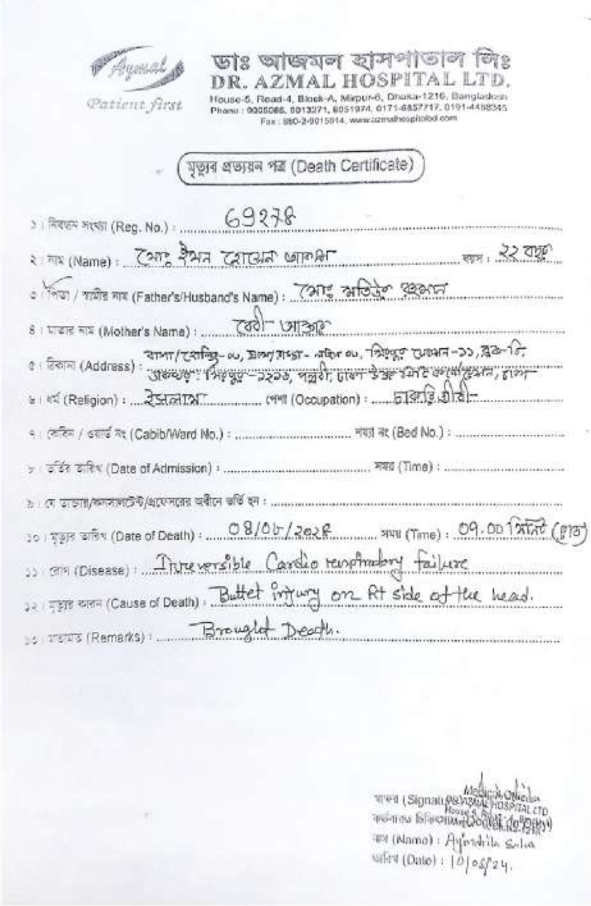
ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিঃ
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.
Patient first
House-5, Road-4, Block-A, Mirpur-6, Dhaka-1216, Bangladesh
Phone: 9005086, 8013271, 8051974, 0171-6857717, 0191-4498345
Fax: 880-2-9015914, www.azmalhospitalbd.com

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র (Death Certificate)

১। নিবন্ধন সংখ্যা (Reg. No.): 69278
২। নাম (Name): মোঃ ইমন হোসেন আকাশ বয়স: ২২ বছর
৩। পিতা / স্বামীর নাম (Father's/Husband's Name): মোঃ মতিউর রহমান
৪। মাতার নাম (Mother's Name): বেবী আক্তার
৫। ঠিকানা (Address):
৬। ধর্ম (Religion): ইসলাম পেশা (Occupation): চাকরিজীবী
৭। কেবিন / ওয়ার্ড নং (Cabib/Ward No.): শয্যা নং (Bed No.):
৮। ভর্তির তারিখ (Date of Admission): সময় (Time):
৯। যে ডাক্তার/কনসালটেন্ট/প্রফেসরের অধীনে ভর্তি হন:
১০। মৃত্যুর তারিখ (Date of Death): 08/08/2024 সময় (Time): 07.00 মিনিট (রাত)
১১। রোগ (Disease): Irreversible Cardio respiratory failure
১২। মৃত্যুর কারন (Cause of Death): Bullet injury on Rt side of the head.
১৩। মন্তব্য (Remarks): Brought Death.

স্বাক্ষর (Signature):
কর্তব্যরত চিকিৎসক
নাম (Name):
তারিখ (Date): 10/08/24.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ইমন হোসেন আকাশ

Name: MD. EMON HOSSAIN AKASH

পিতা: মোঃ মতিউর রহমান

মাতা: বেবী আক্তার

Date of Birth: 28 Sep 2002

ID NO: 1975945989

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: ইমন হোসেন আকাশ
পেশা	: ফ্রিল্যান্সার
জন্ম তারিখ	: ২৮/০৯/২০০২
পিতা	: মো: মতিউর রহমান
মাত	: মোসা: বেবী আক্তার
শাহাদাতের তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার
আহত হওয়ার স্থান	: মিরপুর ১০, গোলচত্ত্বর, ঢাকা
শাহাদাতের স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, বাদ মাগরিব, মিরপুর-১০, গোলচত্ত্বর
স্থায়ী ঠিকানা	: শরীয়তপুর, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: মিরপুর ১০, ঢাকা
দাফন	: তার প্রথম জানাজা মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এবং দ্বিতীয় জানাজা শরিয়তপুর মাতবকান্দি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়

শহীদ মো: ইমন

ক্রমিক : ০৪৪

আইডি: ঢাকা সিটি ০৪৪

শহীদ পরিচিতি

ভোলা জেলার সন্তান মো: ইমন ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ভোলা জেলার আলী নগর ইউনিয়নের সাচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত কারণে ছিলেন ঢাকায়। পিতা পুত্র মিলে সংসারের হাল ধরেন। তার পিতার নাম নান্টু (এন আই ডি মোতাবেক, কিন্ত জন্ম সনদে লেখা মো: সালাউদ্দিন) দুই নামেই ইমনের বাবা পরিচিত। একটি তার ডাক নাম, আর অন্যটি নথিপত্রে ব্যবহৃত নাম। আমরা সরাসরি ইমনের মায়ের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি।

ইমনের শাহাদাত যাত্রা

প্রতিদিনের মতো ২০ জুলাই মো: ইমন রিক্সা নিয়ে বের হন রাস্তায়। ২০ জুলাই ঢাকাসহ সারাদেশ ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। জুলাই মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে বিপ্লবের মাস। শেখ হাসিনা সরকার ভোট জালিয়াতি, দূর্নীতি, অনিয়মে দেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়। যারা কথা বলে রোধ করে তাদের কণ্ঠ। হত্যা নির্যাতন, নিপীড়ন, গুম, মামলায় কোনঠাসা করে রাখে প্রতিপক্ষকে। ইতিপূর্বে হয়েছে অনেক আন্দোলন। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে জেগে ওঠেছিল ছাত্ররা। কোটা আন্দোলনেও তারা সোচ্চার ছিল। কোটা আন্দোলন আবার সরব হয়। ছাত্ররা কোটা সংস্কারে সোচ্চার হয়।

প্রতিটি যৌক্তিক আন্দোলন দমনে সরকার ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে তাদের দলীয় ক্যাডার বাহিনী। আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী নির্মম নির্যাতন করে নিরীহ জনতাকে। জুলাই বিপ্লবেও কঠোর হস্তে দমন নীতি প্রয়োগ করে। ছাত্ররা দমে যায়নি। ছাত্ররা তাদের যৌক্তিক দাবীর সপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ভার্সিটির প্রতিটি হলে হলে সংঘবদ্ধ হতে থাকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্যাতনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজপথে ছাত্র ছাত্রীদের বেধড়ক মারপিট করে। ১৩/১৪ জুলাই পর্যন্ত আন্দোলন একটি স্বাভাবিক পর্যায়ে ছিল। ইতোমধ্যে যে কেউ যে কোন কথা বললেই তাদেরকে পরিকল্পিত কোনো ট্যাগ দিয়ে সংকুচিত করে রাখতো।

সত্য কথা, যৌক্তিক আন্দোলনকে নানা ট্যাগে আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম ছিল সরকার। ছাত্রদের কোটা আন্দোলনেও পূর্বের কৌশল প্রয়োগ করে। ছাত্ররা যখন নিজেদের যৌক্তিক দাবী নিয়ে আন্দোলন মুখর তখন শেখ হাসিনা ছাত্রদের রাজাকারের বাচ্চা বা নাতি-পুতি বলে গালি দেয়। মুহূর্তে ফেটে পড়ে ছাত্র সমাজ। আন্দোলনের আতুড়ঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্নি গর্ভ হয়ে যায়। দেশের পেটে যে অগ্নি মিটিমিটি জ্বলছিল তা আগ্নেয়গিরির রূপে দৃশ্যমান হয়। সাহসী বুক চিৎকার দিতে শিখে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফার্মের মুরগী বলে ক্ষ্যাপানো হত। তারাও জুলাই বিপ্লবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সর্বস্তরে। ছড়িয়েছে সর্ব মহলে। হাসিনার কথা ছাত্রছাত্রীরা স্লোগানে স্লোগানে ফেরত দেয়। সকল ক্যাম্পাসে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত **তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার, কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার! স্বৈরাচার!**

আওয়ামী পেটুয়া বাহিনী আহত করে ছাত্রদের। নির্মম নির্যাতন করে ছাত্রীদের। রাস্তায় নেমে আসে অভিভাবক, ছাত্রদের পাশে দাঁড়ায় শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবী সমাজ। সরকারের পুলিশ গুলি করে, র‍্যাব গুলি করে। যুবলীগ গুলি করে। রাজপথে পড়ে থাকে একের পর এক লাশ।

সরকার আন্দোলন দমন করতে জারি করে কার্ফিউ। বিজিবি, পুলিশ সতর্ক প্রহরায়। আন্দোলনকারীরাও জান বাজি রেখে মুখোমুখি অবস্থান নেয় রাজপথে। দেশ উত্তপ্ত। রাজপথ উত্তপ্ত। মো: ইমন একজন রিক্সা চালক। তার বাবাও রিক্সা চালক। পেটতো আর কোনো বাঁধা মানে না।

২০ জুলাই থমথমে অবস্থা। রুটি রুজির তাগাদায় ইমন রাস্তায় নেমে পড়েন রিক্সা নিয়ে। আগের দুই দিন স্বৈরাচারী হাসিনার পুলিশ ও যুবলীগ অসংখ্য মানুষ খুন করে। এদিন ছাত্র জনতা জীবনের মায়া ত্যাগ করেই আন্দোলন চালিয়ে যায়। ইমন তার জীবন যুদ্ধে সচল রাখে রিক্সা। রিক্সা নিয়ে বাড্ডা তেতুল তলায় আসে। অতর্কিতে আক্রমণ করা হয় মিছিলে। নিক্ষেপ করতে থাকে পুলিশ অসংখ্য গুলি। একটি গুলি আঘাত করে ইমনের

মাথার বাম পাশে। ২০ জুলাই সময় তখন ৩:৩০ মিনিট প্রায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন ২১ জুলাই সকাল ৯ টায় জানাজা শেষে তাকে কবর দেওয়া হয় ভোলার নিজ গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে।

নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর অনুভূতি

তার ভাই রাজিব বলেন, ইমন খুব ভালো মানুষ ছিল। কারও সাথে সে কোনো রকম বাকবিতন্ডায় জড়াতো না। মা বাবার কথা মতো চলতো। আমার ভাই কাজের মানুষ। আমরা গরীব মানুষ। আমরা কার কাছে বিচার চাইব? আমার ভাই হত্যার বিচার চাই। প্রতিবেশী আরজত মিয়া বলেন ইমনকে কখনও কারও সাথে ঝগড়া করতে দেখিনি। সে খুব সহজ সরল ছিল। ছোট ছেলে। এই বয়সে পরিবারের প্রতি ছিল দায়িত্বশীল। তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

প্রস্তাবনা

পরিবারটি মূলত দরিদ্র। তাদের এককালীন একটি বড় অনুদান দেওয়া যেতে পারে। বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। তার বাবাকে একটি ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

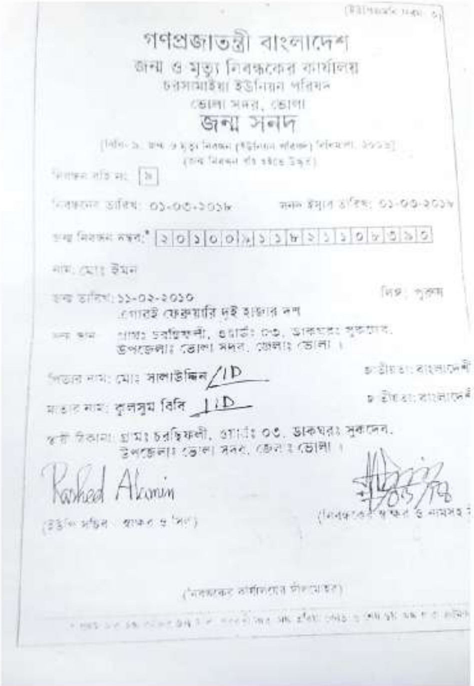

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভোলা সদর, ভোলা
জন্ম সনদ

নাম: মোঃ ইমন
জন্ম তারিখ: ১১-০২-২০১০ লিঙ্গ: পুরুষ
এগারই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার দশ
পিতার নাম: মোঃ সালাউদ্দিন
মাতার নাম: কুলসুম বিবি

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Charsamaia Union Parishad
Bhola Sadar, Bhola
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 21/08/2024
Death Registration Number 20100911821108390
Date of Issuance 21/08/2024

Date of Birth : 11/02/2010
Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	মোঃ ইমন	Name	Md Emon
মাতা	কুলসুম বিবি	Mother	Kulsum Begum
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
পিতা	মোঃ নান্টু	Father	Md Nantu
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	হত্যা	Cause of Death	Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Alauddin Howlader
Secretary

Seal & Sign
Registrar

এক নজর শহীদের তথ্য

নাম	: মো: ইমন
জন্ম	: ১১-০২-২০১০
পিতা	: মো: সালাউদ্দিন ওরফে নান্টু
মাতা	: কুলসুম বেগম
ভাই-বোন	: ৩ ভাই, ১ বোন
পেশা	: রিক্সা চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সাচিয়া, ইউনিয়ন আলী নগর, ভোলা সদর, ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ২৯৫, স্বাধীনতা,স্মরণী, জামতলা রোড, বাড্ডা ঢাকা
আহতের সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল: ৩.৩০
শাহাদাতের সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, (ঘটনাস্থলে পুলিশের গুলিতে)
কবর	: নিজ এলাকায়

শহীদ আব্দুল জব্বার

ক্রমিক : ০৪৫

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

পিতা-মাতার এলাকা নোয়াখালীতে হলেও আব্দুল জব্বারের জন্মের আগেই পরিবারসহ ঢাকাতে চলে আসায় আব্দুল জব্বার ঢাকাতেই ১৯৮৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মতিন এবং মাতা নাজমা বেগম অনেক কষ্ট করে আব্দুল জব্বার সহ আরো ৪ ভাই বোনকে বড় করেছেন। ঢাকা তেজগাঁও পশ্চিম নাখালপাড়া এলাকায় তার জন্ম। মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত পরিবারসহ বাড্ডা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাস করে পরবর্তীতে তিতুমীর কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স মাস্টার্স শেষ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিয়মিত ইসলাম চর্চা করতেন। স্বেচ্ছায় ইসলাম বহির্ভূত কোনো কাজ তিনি করতেন না। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক, কোরআনের আইন চালু হোক এর জন্য তিনি সকল সময় ইসলামী আন্দোলনকে সহযোগিতা করতেন। ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্রশিবির এবং কর্মজীবনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামকে সমর্থন করতেন। মৃত্যুকালীন অবস্থায় তার দুইটি ছেলে মেয়ে ছিল।

ছেলে সামির ইব্রাহিম ১২ বছরের এবং মেয়ে নুজাইফা ইসলাম ৩ বছরের। কর্মজীবনে তিনি সেলসের চাকরি করতেন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন এঁকেছিলেন আব্দুল জব্বার। ভেবেছিলেন এদের জন্য ঢাকাতে কোথাও অল্প কিছু জমি কিনে বাড়ি করবে এর জন্য তাকে বিদেশ যেতে হবে। অবশেষে বিদেশ গেলেন কিন্তু এমন দেশে গেলেন যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়। ৫ আগস্ট ৭:৩০ মিনিটে আওয়ামী লীগের ভাড়া করা ভারতের পুলিশের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আব্দুল জব্বারের শাহাদাতের ঘটনা

০৫ আগস্ট ২০২৪ সাল স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে। এই দিন আব্দুল জব্বার তার নিজ কর্মস্থল থেকে সকাল ১১ টার দিকে বাসায় চলে আসেন। চিন্তা ছিল ওই সময় বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণ করেছিলেন তবে দুপুরের পরে শেখ হাসিনার পতনের কথা শুনে পরিবারসহ আনন্দ উল্লাসের জন্য রাস্তায় বের হন। পতন নিশ্চিত হওয়ার পরেও বাড্ডা থানার পুলিশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। মানুষ দেখামাত্রই তারা গুলি করতে থাকে। আব্দুল জব্বার তার পরিবার নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন। আসরের নামাজ পড়ে রাস্তায় বের হলে রাবার বুলেট ও টিয়ারশেলে আহত হয়ে বাসায় চলে আসেন। স্ত্রীকে বলেন সামান্য আঘাত লেগেছে এতে সমস্যা নেই। তারপরে বাড়িতে ফোন রেখে মাগরিবের নামাজ পড়তে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। ভেবেছিলেন এখন মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু মাগরিবের নামাজ পড়ে তিনি যখন রাস্তায় নেমেছিলেন, তখন চারিদিক থেকে মানুষ ছোটাছুটি করছিল। পুলিশ আরো বেশি ভয়ংকর রূপে গুলি করছিল। কয়েকশো পুলিশ একই সাথে চারিদিকে গুলি চালাতে থাকে। আব্দুল জব্বার বিভিন্ন মানুষের সাথে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ একটি বুলেট এসে তার পেটে বিদ্ধ হয়। এখানে তিনি পড়ে যান। রাস্তার সাধারণ মানুষ তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় কিন্তু দীর্ঘ এক ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে এমজেড হসপিটালে শাহাদাত বরণ করেন। হসপিটালের মালিকপক্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে স্থানান্তর করে। বাহিরে ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনে আব্দুল জব্বারের স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে যায়। তিনি তার স্বামীকে খোঁজ করেন কিন্তু কোথাও খোজ মেলে না। বাইরে বের হয়ে দেখেন চার থেকে পাঁচটা লাশ রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের চেহারার সাথে তার স্বামীর চেহারার মিল পাওয়া যায় না। তাই তিনি স্বামীকে খুঁজতে বিভিন্ন হসপিটালে রাত তিনটা পর্যন্ত ছোটাছুটি করেন কিন্তু কোথাও মেলে না। অবশেষে তিনি তার দেবরকে সাথে করে ফজরের সময় বের হন। এলাকার কিছু লোকের পরামর্শে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্বামীকে খুঁজতে যান। হাসপাতালের ডাক্তারদের তার স্বামীর ছবি দেখালে তারা তাকে মর্গে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি কয়েকশো লাশের মধ্যে তার স্বামীকে খুঁজে পান। নিথর দেহ পড়ে আছে কোনো কথা নেই তার স্বামীর। একদিন আগেও তিনি তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে সময় কাটিয়েছেন। আজ সেই আব্দুল জব্বার আর কোন কথা বলছেন না। বলবে কি করে? আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী সংগঠন ভারত থেকে 'র' এর সদস্য ভাড়া করে নিয়ে এসে বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করছে। এরা যে ভারতের পুলিশ ছিল সেটা পরবর্তীতে তাদের বুলেট এবং অস্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। হত্যাকারী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে কোনোদিন ভালোবাসেনি। বাংলাদেশের কোনোদিন ভালো চায়নি। সে

চেয়েছিল বাংলাদেশকে বিক্রি করে; এদেশের মানুষকে হত্যা করে এ দেশটাকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা। কিন্তু অন্যায় কখনো জয়ী হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনে সেটাই প্রমাণিত হলো।

আব্দুল জব্বারের স্ত্রীর বক্তব্য

"আমার স্বামী সারাজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং সত্যের পথে থেকেছেন। বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। বিজয়ের পরেও আমার স্বামীকে এভাবে মরতে হবে কখনো ভাবিনি। আমার পরিবার এখন কিভাবে চলবে, আমার ছেলে মেয়েরা কিভাবে লেখাপড়া করবে, এখন সবই অনিশ্চিত। আয়ের কোনো উৎস আমাদের নেই। এখন আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।"

শহীদ আব্দুল জব্বারের পারিবারিক অবস্থা

স্ত্রী এখন নাবালক দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন। গ্রামের ভিটেমাটি বলতে কিছু নেই। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল জব্বার। শাহাদতের পরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে ২ লক্ষ টাকা সহযোগিতা করা হয়েছে। এই দুই লক্ষ টাকা দিয়েই এখন কোনো রকম সংসার চলছে। সংসারের সহযোগিতা করার মতো কোনো আত্মীয়-স্বজন তার নেই। স্থায়ী কোনো সম্পদও নেই।

একনজরে শহীদ আব্দুল জব্বার

নাম	: আব্দুল জব্বার
জন্ম তারিখ	: ১৫-০২-১৯৮৬
জন্মস্থান	: বাসা: ৩৭২, রাস্তা: ১২ নম্বর গলি, পশ্চিম নাখালপাড়া, ডাকঘর: তেজগাঁও-১২১৫ থানা: তেজগাঁও, জেলা: ঢাকা
পেশা	: সেলসের চাকরি
বর্তমান ঠিকানা	: ভিআইপি প্রজেক্ট, ৮ নম্বর রোড, ৫১ নম্বর বাসা, থানা: বাড্ডা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
পিতা	: মৃত: আব্দুল মতিন
মাতা	: নাজমা বেগম
স্ত্রী	: সুমাইয়া ইসলাম সুমী
ছেলে	: মো: সামির ইব্রাহিম (১২)
মেয়ে	: মোসা: নুজাইফা ইসলাম (৩)
আঘাতকারী	: পুলিশ সদস্য
আহত হওয়ার স্থান ও সময়	: বাড্ডা থানার সামনে, ০৫-০৮-২০২৪, সন্ধ্যা ৭:৩০
মৃত্যুর তারিখ,সময় ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, রাত ৮:৩০, এম জেড হাসপাতাল
জানাজা	: ০৬-০৮-২০২৪ বিকাল, ৩টা
কবরস্থান	: তেজগাঁও শিল্প এলাকা, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কবরস্থান

শহীদ মোঃ নাসির হোসেন

ক্রমিক : ০৪৬

আইডি: ঢাকা সিটি ০৪৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ নাসির হোসেন লক্ষ্মীপুর জেলার সন্তান। তিনি জন্মগ্রহণ করেন লক্ষ্মীপুরের এক কৃষক পরিবারে। তার জন্ম তারিখ ০১-০২-১৯৮৫ সাল। তার পিতার নাম মোঃ রফিকুল ইসলাম। মা নাজমা বেগম। নাসির ভাই বোনদের মধ্যে সবার বড়। তারা তিন ভাই, পাঁচ বোনের বড় সংসার। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: শায়েস্তা নগর, ইউনিয়ন: ১০ নং আশ্রাব নগর, থানা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর। বর্তমান ঠিকানা: বাসা: মাতুয়াইল, রায়েরবাগ, থানা: যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

যেভাবে নাসির হোসেন হেঁটে গেলেন শাহাদাতের পথে

শহীদ মো: নাসির হোসেন পেশায় ছিলেন একজন দর্জি। ইতিহাস সাক্ষী, দেশের প্রয়োজনে যখন জনগণ জেগে ওঠে পেশা তখন গৌণ হয়ে যায়। শ্রেণী পেশার ব্যবধান মুছে সবার পরিচয় তখন দেশপ্রেমিক জনতা। আন্দোলনের মাঠে তাদের পরিচয় তারা যোদ্ধা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই তখন নেমে পড়ে সংগ্রামে।

নাসির হোসেন দর্জি। ২৪ এর বিপ্লবে তিনি একজন বিপ্লবী যোদ্ধা। আমরা যখন ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই, ইতিহাসের পাতায় ভাসতে থাকে সংগ্রামী সিপাহশালার মুন্সি মেহেরুল্লার নাম। মুন্সি মেহেরুল্লাহ ছিলেন দর্জি। তার সময়ে মিশনারী খ্রিস্টান পাদ্রীরা মুসলমানদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করতে থাকে। তিনি বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। পাদ্রীদের জবাব দিতে নেমে গেলেন মাঠে। যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে পাদ্রীদের কথার জবাব দিতে লাগলেন। দর্জি থেকে জাতির প্রয়োজনে হয়ে গেলেন দ্বীনের দায়ী। পাদ্রীরা পরাজিত হতে লাগল তার জ্বালাময়ী বক্তব্যের সামনে। অনলবর্ষী এই বক্তা অনুভব করলেন শুধু বক্তব্য দিলেই হবে না, তাকে কাজ করতে হবে লেখালেখির মাঠেও। বইপত্র লিখতে লাগলেন। একসময় বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তায় তিনি বিক্রি করে দিলেন উপার্জনের সেলাই মেশিনটিও। যুগের প্রয়োজনে এভাবেই রাজপথে নেমে আসে এদেশের মানুষ। এখন যেটি সিএনজি নব্বইয়ে এটি ছিল বেবি। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক নুর হোসেন ছিলেন একজন বেবি চালক। আমাদের আন্দোলন, সংগ্রামে প্রান্তিক শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। তারা জেগে আছে বলেই, আমাদের সাহস থাকে অসীম। তারা দেশ বাঁচানো মুক্তিকামী বীর সন্তান।

২৪ এর বিপ্লবে নাসির হোসেনদের অবদানকে জাতি স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সাথে।

নাসির হোসেন পেশায় দর্জি হলেও দেশ নিয়ে তিনি ভাবতেন সবসময়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে তিনি মনে করতেন যৌক্তিক একটি আন্দোলন। একটা দেশকে একটা পরিবার নিজের পৈতৃক সম্পত্তি করে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে মানুষের অধিকার। কেউ অধিকারের কথা বললেই চালানো হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। নাসির হোসেন থাকতেন রাজধানীতেই। ছিলেন সচেতন। রাজনৈতিক ঘটনাবলী তার চোখের সামনেই ঘটতে থাকে।

একটি যৌক্তিক দাবী দমন করতে সরকারের দমননীতি শান্ত, নিরীহ নাসিরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জুলাইয়ের গণহত্যায় শিহরিত হন তিনি। সরকার গুলি করে হত্যা করে ছাত্র জনতাকে। লেলিয়ে দেয় পোষা বাহিনী। ছাত্রদের বুকে গুলি করে পুলিশ। ছাত্রীদের নজিরবিহীন হেনস্তা করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ। প্রতিবাদী হয়ে পড়েন নাসির হোসেন। আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। নিজে মাঠে থাকেন নিয়মিত। বাসা থেকে সরবরাহ করেন আন্দোলনকারীদের জন্য রান্না করা খাবার ও ঠাণ্ডা পানি।

১৯ জুলাই নাসির হোসেন আন্দোলনকারীদের পানি ও রান্না করা খাবার প্রদান করছিলেন। ২০ জুলাই তিনি ছিলেন রাজধানীর যাত্রাবাড়ির রায়েরবাগ পয়েন্টে। শান্তিপূর্ণ মিছিলে হঠাৎ হামলা করে স্বৈরাচারের পুলিশ। আহত হন অনেকেই। নাসির গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তার মাথা ও মুখে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় মুগদা হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২৩ জুলাই মৃত্যু বরণ করেন।

আহত হওয়ার পর তার পরিবারকে বিভিন্ন রকম হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়। আওয়ামী গুন্ডারা তার চিকিৎসা কাজে বাঁধা দেয়। পুলিশি হয়রানি, গুন্ডাদের ভয় অতিক্রম করে চিকিৎসা চালিয়ে যান তার পরিবার। মারা যাওয়ার পর জানাজা, দাফনেও তারা ভয়ভীতি দেখায়। কবরস্থান কর্তৃপক্ষও নানারকম জটিলতা তৈরী করে। সব বাঁধা অতিক্রম করে তাকে অবশেষে মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিবারের অবস্থা

তার বাবা দরিদ্র কৃষক। উল্লেখযোগ্য কোনো জমাজমি নাই। সচ্ছল না হলেও ঋণগ্রস্ত না। দিন এনে দিন খেয়ে জীবন যাচ্ছে কোনোরকমে। বিশাল পরিবার। নাসির সবার বড়ো। পরিবারের প্রতি তার দায়িত্বও বেশি। রামগঞ্জের ছেলে কাজ করতেন ঢাকার রায়েরবাগে। তার সাথে কাজ করতেন আরেক ভাই। নাসিরের বাবা এখনও দিনমজুরের কাজ করেন। এক ভাই

বেকার। এক বোন স্কুলে ও এক বোন কলেজে পড়ে। নাসির শুধু পরিবারের রুটি রুজির ভরসা না, তিনি ছিলেন ভাই বোনদের গর্ব ও সম্মানের প্রতীক। একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক। তার মৃত্যু পরিবারটির জন্য চরম হতাশাজনক।

মোঃ গুলজার হোসেনের মতে নাসির হোসেন একজন নম্র ভদ্র মানুষ। পিতার একজন যোগ্য সন্তান। তিনি তার ভাই বোনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই বিসর্জন দিয়েছেন। তার জন্ম ১৯৮৫ সালে। তিনি এখনও অবিবাহিত। বোনদের মতে তাদের ভাই শুধু ভাই ছিলেন না, ছিলেন একজন বটবৃক্ষের মতো ছায়াদার অভিভাবক। তাদের ভাই ছিলেন তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ তাদেরকে একজন মহান হৃদয়ের ভাই দিয়েছিলেন। অথচ স্বৈরাচারের বুলেট তাকে হত্যা করল। তারা এই হত্যার বিচার দাবী করে।

জিলানী ইসলাম শহীদের ছোট ভাই। তিনি জানান, শান্ত স্বভাবের নাসির এতোটা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেবেন তা ভাবেননি। নাসিরের রক্তমাখা জামা তার মা এখনো স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছেন। নাসিরের মৃত্যুতে তাদের পরিবার হতবিহবল। নাসিরের স্মৃতিতে তারা বেদনায় ভারাক্রান্ত, তবে দেশের জন্য তার আত্মত্যাগে তারা গর্বিত।

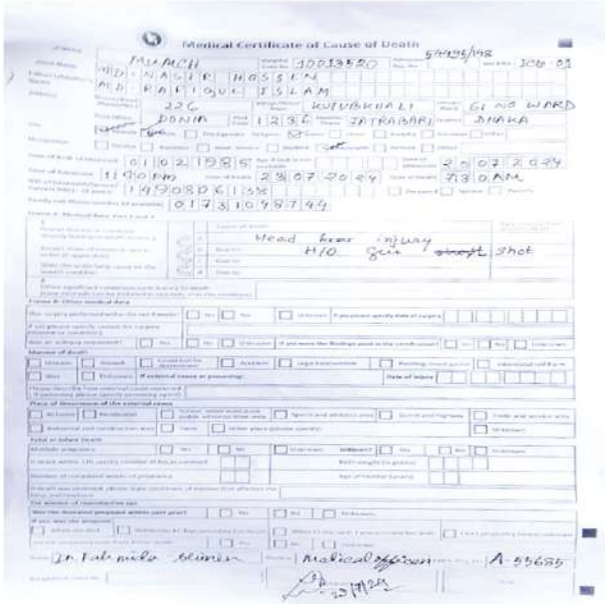

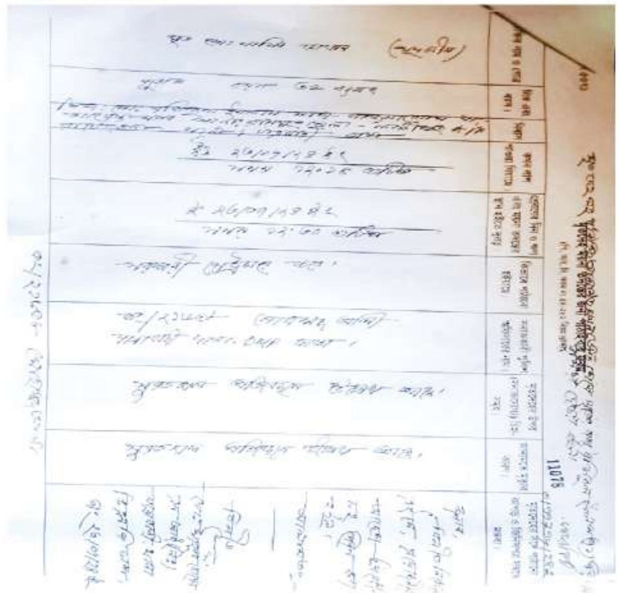

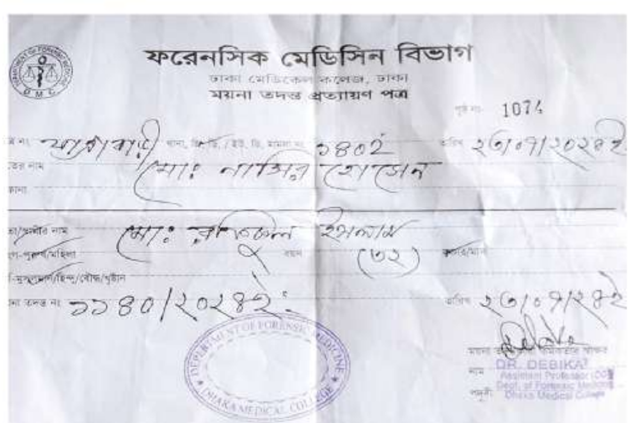

একটি শোক সংবাদ

রায়েরবাগস্থিত রশিদবাগ এলাকার বাসিন্দা **মোঃ নাসির হোসেন** গত ২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মাথায় গুলিবিদ্ধ হন এবং ২৩ জুলাই ২০২৪ ইং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

এক নজর তথ্যসমূহ

শহীদ	: মো: নাসির হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০১-০২-১৯৮৫ সাল
পিতা	: মো: রফিকুল ইসলাম
মা	: নাজমা বেগম
শহীদের ভাই বোন	: তারা তিন ভাই, পাঁচ বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শায়েস্তা নগর, ইউনিয়ন: ১০ নং আশ্রাব নগর, থানা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: মাতুয়াইল, রায়েরবাগ, থানা: যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
পেশা	: দর্জি

শাহাদাতের চিত্র

রায়েরবাগ বাজারে র‌্যাব/ বিজিবির গুলিতে ২০ জুলাই মাথায় ও মুখে গুলিবিদ্ধ হন। তখন সময় দুপুর ১২.৩০ পরবর্তীতে ২৩ জুলাই মুগদা হাসপাতালে সন্ধ্যা ৭.৩০ এ মৃত্যুবরণ করেন। মাতুয়াইল কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

প্রস্তাবনা

১. দুঃস্থ এ পরিবারটিকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এককালীন অনুদান
২. প্রয়োজন সুন্দর একটি বাসস্থান
৩. তার ভাইদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৪. বোনদের পড়ালেখার খরচ জোগান দেওয়া
৫. মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা
৬. চিকিৎসা ভাতা দেওয়া
৭. বোনদের বিবাহের জন্য এককালীন অর্থ প্রদান

মর্গে পড়েছিল শহীদের লাশ

শহীদ রাকিব হোসেন

ক্রমিক : ০৪৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪৭

শহীদ পরিচিতি

নাম : **রাকিব হোসেন**

জন্ম : ০৩-০৫-২০০০

চব্বিশ বছরের টগবগে যুবক রাকিব হোসেন। পৈতৃক নিবাস মুন্সিগঞ্জে। থাকেন ঢাকায়। তারা দুই বোন এক ভাই। মা হাসি আক্তার চাকরি করেন। রাকিব বিবাহিত ছিলেন। মা, বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে চলছিল তাদের সুখের সংসার। তার পিতার নাম চাঁদ মিয়া।

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মোসা, ইউনিয়ন: কোমারভোগ, থানা: লৌহজং, জেলা: মুন্সীগঞ্জ।
বর্তমান ঠিকানা : বাসা: ৩১৭, এলাকা: আনন্দনগর, থানা : আফতাব নগর, জেলা: ঢাকা।

যেভাবে শহীদ হলেন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দেলনে যুক্ত হতে বাসা থেকে বের হন তিনি। সেদিন ১৯ জুলাই শুক্রবার। রাকিবের মতো আরও বহু লোক ততদিনে যুক্ত হয়ে গেছেন আন্দোলনে। আন্দোলন তখন কাঁপিয়ে দিয়েছে স্বৈরশাসকের ভীত। বিগত পনের বছর যাবত ক্ষমতায় আওয়ামীলীগ। ক্ষমতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হাসিনা সরকার ততদিনে এক দৈত্যে পরিণত হয়েছে। লক্ষ তাদের ৪১ সাল। কেউ কথা বলতে পারে না। হাসিনা সরকারের পনের বছরে বাঘা বাঘা মুখ নিখোঁজ হয়ে গেছে। তারা গুম হয়ে হারিয়ে গেছে। ৫ আগস্টের পর জাতি জানতে পারল হাসিনার একটি আয়নাঘর ছিল।

সভ্যতার ইতিহাসে আয়নাঘর অসভ্য কলংক। বিরোধী দলীয় বলিষ্ঠ কণ্ঠ ইলিয়াস আলী। কেউ জানে না কোথায় তিনি। আগস্টে হাসিনা পলায়নের পর জাতি জানলো তাকে মুখে পলিথিন পেঁচিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে। তার লাশ পেট ফেড়ে বুকে পাথর বেঁধে তলিয়ে দেওয়া হয়েছে চিরতরে। স্ত্রী পুত্র কন্যারা আর কোনোদিন জানতেও পারবে না তার খবর। এমনকি পিতা, স্বামীর কবরের পাশে দাঁড়ানোর মতো স্মৃতিটুকুও নিঃশেষ করে দিয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী দুঃশাসন একটি কালো অধ্যায়।

এরকমই অনিয়ম,নিপীড়ন, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ছিল পুরো জাতি। পনের বছরে হাসিনার সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহুবার আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু নিপীড়নের মাধ্যমে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে আন্দোলনের গতিপথ।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয় কোটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে। একটি যৌক্তিক দাবীকে হাসিনা সরকার তার স্বভাবসুলভ আচরণে অগ্রাহ্য করে। আন্দোলনকারীদের ক্ষেত্রেও তারা তথাকথিত ট্যাগের রাজনীতির কু অভ্যাস অবলম্বন করে। আন্দোলনকারীদের বিএনপি, জামায়াত, জঙ্গী, রাজাকার বলে উড়িয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এবার এতে কাজ হয়নি; উল্টো আন্দোলন আরও চাঙ্গা হয়।

প্রাথমিকভাবে আন্দোলন ছিল হল কেন্দ্রিক। ক্রমশঃ তা ছড়িয়ে পড়ে টিএসসি, রাজু ভাস্কর্যসহ পুরো ক্যাম্পাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যোগ দেয় আন্দোলনে। আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে জনতা। ছাত্রদের সাথে যোগ দেয় অধিকার বঞ্চিত সাধারণ সব মানুষেরও।

রাকিব হোসেন একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণ হলেও তিনি ছিলেন সচেতন মানুষদের একজন। জুলাইয়ের আন্দোলনও তার কাছে যৌক্তিক আন্দোলন বলেই মনে হয়েছিল। মনে করার বহুবিধ কারণও আছে। দেশের মানুষ নানা কারণেই ফুঁসেছিল। জুলাইয়ের বিপ্লবে বিস্ফোরণ হল। দ্রোহ, ক্ষোভ সব প্রকাশের উপলক্ষ এই আন্দোলন। আর তাই এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে যান রাকিব।

এদিকে ফ্যাসিস্ট হাসিনা গদি রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। হানাদার বাহিনীর মতো আক্রমণ করে নিজের দেশের জনতার উপর। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে দেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধবাজ নেতার মতো। জুলাইয়ের আন্দোলন দমন করতে শত্রু সেনা খতম করার মতো হত্যা করে নিজের দেশের মানুষকে। লেলিয়ে দেয় পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনীকে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেও হত্যা করে নিরীহ জনতা। রেহায় পায়নি ঘরের ভিতর বৃদ্ধ, শিশু নারী পুরুষ। ১৮-১৯ জুলাই দেশকে শেখ হাসিনা অবরুদ্ধ করে রাখে। সরকারী বাহিনীর সাথে যোগ দেয় আওয়ামীলীগের বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা মানুষকে খুন করে নির্বিচারে।

১৯ জুলাই আন্দোলনে দেশের সচেতন জনতা সানন্দে যোগ দেয়। একটি স্বাধীন দেশে অধিকার আদায়ের মিছিলে নির্বিচারে গুলি! সচেতন কেউ মেনে নিতে পারেনি। সভ্যতার ইতিহাসে এগুলো নজিরবিহীন ঘটনা।

আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

জারি করা হয়েছিল কারফিউ। এমতাবস্থায়, ভাড়া বাসা থেকে রাকিব বেরিয়ে আসেন রাজপথে, যোগ দেন আফতাব নগর পয়েন্টে। স্বৈরাচার হাসিনার পুলিশ বাহিনী ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা এক যোগে সেদিন আক্রমণ চালিয়েছিল আফতাব নগর ও রামপুরার মাঝামাঝি স্থানে। ফলে, এলাকাটি পরিণত হয়েছিল রণক্ষেত্রে। আনুমানিক বেলা ১২ টার দিকে রাকিব গুলিবিদ্ধ হন।

সারা শহর তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কোথাও যাওয়া যায় না। সড়কে যানবাহনও ছিল না। আন্দোলনকারীরা বহু কষ্টে রাকিবকে হাসপাতালে নেয়। এদিকে রাকিব বাসায় ফেরেনি। মা ও বোন দুঃশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়ে। রাকিবের স্ত্রী আগেই চলে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। কারণ দিন কয়েক আগে তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহের ঘটনা ঘটেছিল। বিষয়টি কেবল স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝেই সীমিত ছিল। রাকিব তার মাকেও জানতে দেয়নি। মা তবুও জেনে যান। পুত্রবধুকে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি আসেননি।

ফলে বাসায় ছিল কেবল মা আর বোনেরা। রাস্তায় কারফিউ, নেট নেই- এরকমই এক দুর্দশার ভেতর তারা খুঁজতে থাকেন রাকিবকে। রাকিবের মা একজন সংগ্রামী নারী। বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। মা একাই সামলে চলেছেন পরিবারের সকল দায়দায়িত্ব। রাকিব তার একমাত্র পুত্র সন্তান। তিনিও হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ছেলে রাকিবকে। অবশেষে তিনি পেলেন সন্তানকে কিন্তু লাশ হিসেবে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে। হাসিনার পুলিশ এক দুঃখী মায়ের বুক খালি করল নিজের গদি রক্ষার্থে। রাকিব হোসেন দেশের মানুষের জন্য হয়ে গেলেন শহীদ। তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ঝালকাঠি নানার বাড়িতে। ওখানেই স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

বোন তামান্না আক্তার, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। তার চোখে বেদনার সমুদ্র। "আমার ভাই! পৃথিবীতে তার মতো আর কাকে পাব? এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর নাই কারও কাছেই। আমার ভাই খুব ভালো ছিল, বিনয়ী ছিল, হাসি খুশি ছিল। আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন। আপনারা আমার ভাইয়ের খুনিদের বিচারের দাবী জানায়েন। আমরা তো গরীব। কার কাছে যাব? কোথায় বিচার চাইব? আপনারা আমাদের দাবীটা পৌছে দিয়েন।"

এক নজরে শহীদ রাকিব হোসেন

নাম	: রাকিব হোসেন
পিতা	: চাঁদ মিয়া
মা	: হাসি আক্তার।
শহীদের পরিবার	: মা ও দুই বোন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : মোছা, ইউনিয়ন: কোমারভোগ,থানা: লৌহজং, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ৩১৭ এলাকা: আনন্দনগর। থানা : আফতাব নগর, জেলা: ঢাকা।
শাহাদাত বরণ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
স্থান	: আফতাব নগর, রামপুরা, ঢাকা
সময়	: পুলিশের গুলিতে আহত হয় বেলা ১২ টায়। মারা যান দুপুর ২.৩০ ঢাকা মেডিকেল মর্গে লাশ পাওয়া যায় তিনদিন পর
দাফন	: ঝালকাঠি (নানাবাড়ি)

প্রস্তাবনা

১. এককালীন আর্থিক অনুদান দিলে পরিবারটি স্বাবলম্বী হবে
২. তাদেরকে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৩. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি
৪. ছোট বোনটির পড়ালেখার সহযোগিতা করা

শহীদ রাসেল মিয়া

ক্রমিক : ০৪৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪৮

শহীদ পরিচিতি

দিনমজুর পিতা জনাব আবুল কাশেম এবং মাতা মাকসুদা বেগম এর ২য় সন্তান শহীদ রাসেল মিয়া ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবিকার সন্ধানে তার পিতা সুদূর নোয়াখালী জেলা থেকে রাজধানী শহর ঢাকায় আসেন। তিন সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে কদমতলীর মেরাজনগর এলাকায় ভাড়া বাসায় ওঠেন। কিছুদিন পর শহীদ পিতা প্যারালাইজড হয়ে পড়েন। অল্প বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে রাসেল মিয়ার উপর। এ কারণে বেশি দূর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। হর্কাস পেশায় যুক্ত হয়ে স্বল্প আয় দিয়েই অসুস্থ বাবা, মা ও পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে শুরু করেন শহীদ রাসেল। শহীদ সহোদর আহসান একটি মটর গ্যারেজে সহযোগী মেকার হিসেবে কাজ করেন।

রক্তাক্ত জুলাই-আগস্ট

তখন জুলাইয়ের শুরু। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের রাজাকারের সঙ্গে তুলনা করে বক্তব্য দেন সাবেক সরকার প্রধান খুনি শেখ হাসিনা। তার এমন মন্তব্যে রাজপথে অভিনব প্রতিবাদ করেন শিক্ষার্থীরা। তখন শিক্ষার্থীদের আবেগ বুঝতে না পেরে উল্টো তাদের ওপর আক্রোশ মেটান স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার ও দলটির শীর্ষ পর্যায়। শুধু তাই নয়, তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিতর্কিত ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। পিটিয়ে রক্তাক্ত করে নারী শিক্ষার্থীদেরও। সেই হামলাই গণবিস্ফোরণের বীজ বপন করে দেয়। এরপর থেকেই এ আন্দোলনের গতি পাল্টে যায়। দাবি উঠে নগ্ন হামলার বিচারের। তখনও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নরখাদক আওয়ামী লীগ সরকার কঠোর মনোভাব আর দমন নীতি চালিয়ে যায়। নিপীড়ন আর গণ-গ্রেপ্তার উল্টো বুমেরাং হয়ে উঠে। বাড়তে থাকে শিক্ষার্থীদের দাবির তালিকা। তারা সাধারণ মানুষের সংহতিও পায়।

এরপরও শিক্ষার্থীদের ঠেকাতে নরপিশাচ আওয়ামী লীগ সরকার একে একে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। অটল থাকে কঠোর নীতিতে। ঘাতক পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলি ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় গণ-বিস্ফোরণ রূপ নেয়। এরপরই অভিনব সব কর্মসূচি দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সরকার হটানোর আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। শহীদ মিনার থেকে ঘোষণা করা হয় সরকার পতনের এক দফা দাবি। শুরু হয় ছাত্র-জনতার সর্বাত্মক অসহযোগ।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতের নয়াদিল্লিতে পালিয়ে যায় সাবেক স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এরপর রাষ্ট্রপতি সরকার ভেঙে দিলে আওয়ামী লীগের টানা প্রায় ১৬ বছরের নেতিবাচক শাসনের অবসান হয়। এর ৩ দিন পর ৮ আগস্ট শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ শপথ গ্রহণ করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ অন্তর্বর্তী সরকারের ১৭ জন উপদেষ্টা শপথ নেন। উপদেষ্টাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক হতে শুরু করে প্রশাসনিক কার্যক্রম। ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনে শিশু-কিশোর-যুবক নারীসহ অন্তত ১ হাজার জনের অধিক প্রাণহানি ও কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলা-নির্যাতনে এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। নরপশু হাসিনা সরকারের দমন পীড়নের সামনে রাজপথে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। তরুণ যুবক, গৃহিণী ও অভিভাবক সবাই স্বৈরাচারের রাহুমুক্ত হতে একজোট হয়েছিলেন রাজপথে। এতে চোখের আলো নিভে গেছে প্রায় ৯০০ জনের। শরীরে বুলেটের ক্ষত নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছেন শত শত জনতা। শিশু, কিশোর, নারী থেকে শুরু করে বৃদ্ধের শরীর ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলি।

আন্দোলনে যোগদান ও সামগ্রিক ঘটনার বিবরণ

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, কুতুবখালী বড় মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করে বের হন রাসেল মিয়া। রাজধানী তখন উত্তাল। চারিদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল যেন রণক্ষেত্র পরিণত হয় যাত্রাবাড়ী ও তার চারপাশ। শহীদ রাসেল বাসায় না ফিরে গিয়ে আন্দোলনে যোগদান করেন। স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার বাহিনী আন্দোলন প্রতিহত করতে এক নাগাড়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যায়। আকস্মিক একটি গুলি রাসেল মিয়ার শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ছাত্র-জনতা। মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

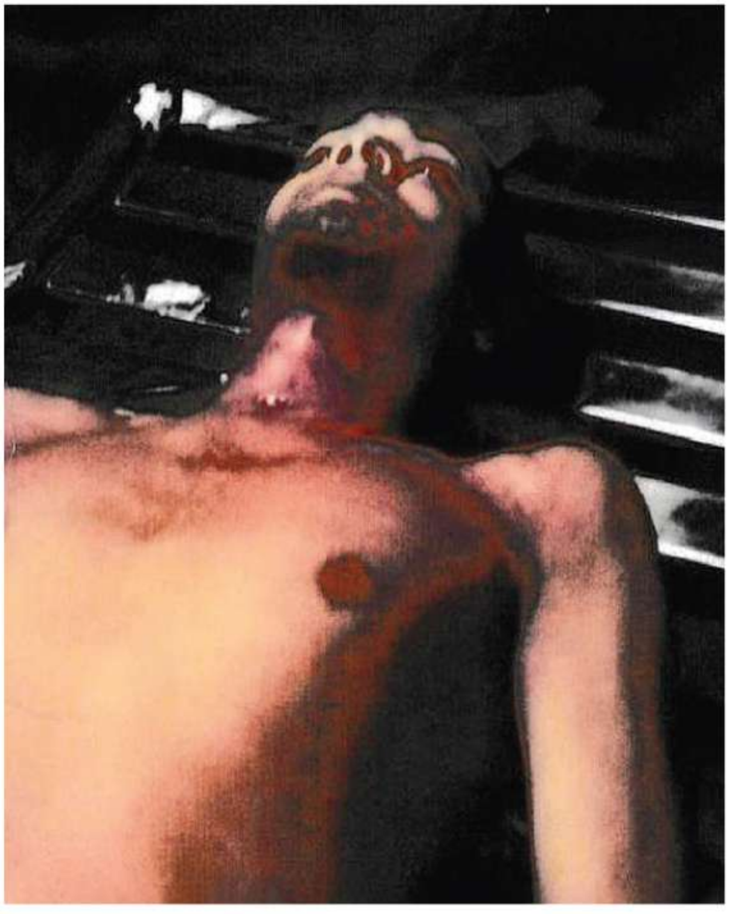

ওরা কি মানুষ?

শহীদ রাসেল মিয়ার লাশ আনতে বাধে বিপত্তি। লাশ দেয়া যাবে না এই মর্মে তার বড় ভাইকে বারবার ফেরত পাঠানো হয়। এক পর্যায়ে শহীদের বড় ভাইকে বেপরোয়া আনসার বাহিনী এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে। রক্তাক্ত করে হাসপাতালের সামনে ফেলে রাখা হয়। শহীদের লাশকে গুম করার চেষ্টা করা হয়। বিক্ষিপ্ত জনতার রোষানলে পড়ে নিরুপায় হয়ে হাসিনার মদদপুষ্ট আনসার সদস্যরা লাশ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে শহীদের লাশ জানাজা শেষে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রস্তাবনা

১ : শহীদের বড় ভাই একজন মোটর গ্যারেজের সহকারী মেকার। তাকে এককালীন সহযোগিতা করে নিজস্ব মটর গ্যারেজের মালিকানার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২ : শহীদের বাবা একজন বৃদ্ধ প্যারালাইজড রোগী। তার সুচিকিৎসা দরকার।

৩ : শহীদ পরিবারের ভরণপোষণে মাসিক সহায়তা করা যেতে পারে।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর অনুভূতি

প্রতিবেশী মোসা: রাশেদা বেগম বলেন, "শহীদ রাসেল মিয়া একজন ধার্মিক, সহজ-সরল এবং নামাজী ব্যক্তি ছিলেন। তার আচরণে এলাকার সবাই সন্তুষ্ট ছিলো। আমি তাঁর হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"

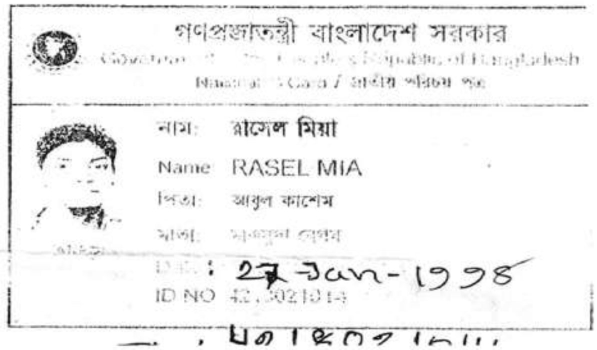

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নাম: রাসেল মিয়া

Name RASEL MIA

পিতা: আবুল কাশেম

27-Jan-1998

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: রাসেল মিয়া
পেশা	: হর্কাস সামগ্রী বিক্রেতা
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৮ (২৬)
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, জুম্মার নামাজের পর (আনুমানিক ২ টা)
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
স্থান	: কুতুবখালী বড় মসজিদের সামনে
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
স্থান	: কুতুবখালী মসজিদের সামনে
দাফনের স্থান	: জুরাইন কবরস্থান
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ১১৮৫, গ্রাম: মোহাম্মদবাগ, ইউনিয়ন: মেরাজনগর, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
পিতা	: আবুল কাশেম (বর্তমানে প্যারালাইজড)
মাতা	: মাকসুদা বেগম
বাড়ী ঘর ও সম্পদের অবস্থা	: জমিজমা ও বসত বাড়ি নেই

ভাই-বোনের বিবরণ

১. আহসান	বয়স : ৩২ পেশা: গাড়ির গ্যারেজের মেকার, সম্পর্ক: বড় ভাই
২. শিরীন আক্তার	বয়স : ২৬, পেশা: গৃহিনী, সম্পর্ক: বোন

শহীদ শাহ আলম

ক্রমিক : ০৪৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৪৯

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

শহীদ শাহ আলম কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন জয়পুর ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রেনু মিয়া ও মাতা সাফিয়া বেগমের কোল জুড়ে ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ছোট্ট থাকতেই তিনি এবং তার সহদোর ভাইদের নিয়ে তাঁদের পরিবার ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় তার বাবা বিভিন্ন কাজ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। কখনো দিনমজুরি, কখনো ফুটপাতে ক্ষুদ্র কোনো ব্যবসা, কখনো কারও প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার কাজ, এভাবেই দিন চলতো তাদের। তাই শহীদ শাহ আলমের শৈশবের অনেকটাই কেটেছে রাজধানী ঢাকায়। প্রথম দিকে তিনি স্বপরিবারে বাড্ডা এলাকায় থাকতেন। সেখানেই বাড্ডা আদর্শ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীতে শহীদের পরিবার আবার নিজ জেলা কুমিল্লায় ফিরে গেলে বহু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। এরপর ঢাকাতেই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জীবনের বিরাট একটা সময় পোশাক কারখানায় কাজ করেছেন। সর্বশেষ কর্মরত ছিলেন রামপুরা এলাকার জান গার্মেন্টসে।

শাহ আলমের বীরত্বের সেদিন

সারা দেশে তখন চলছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা কর্মসূচি 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। সেদিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই রাজধানীর রামপুরা ব্রিজ থেকে মেরুল বাড্ডা এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মাঝে কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়েছে।

সারা দেশে ছাত্রদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচী আর ১৬ জুলাই পরবর্তী শহীদ আবু সাইদ, শহীদ ফয়সাল মাহমুদ শান্তসহ দেশের অসংখ্য নিরীহ ছাত-জনতাকে হত্যার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সেদিন সকাল সাড়ে ১০টার সময় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। শান্তিপূর্ণ সে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দিতে, প্রথমেই ওই এলাকায় গিয়ে একের পর এক টিয়ারশেল আর রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে থাকে স্বৈরাচার সরকারের পেটোয়া পুলিশ। পরে উত্তেজিত ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রামপুরা ব্রিজ এলাকায় তখনও আন্দোলন করছিলো সাধারণ ছাত্ররা। কিছুক্ষণ পর বিটিভি ভবনের সামনে অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এবং আওয়ামীলীগ কর্মীরা জড়ো হতে থাকে। এক পর্যায়ে বেলা ১১টার পর তারা বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয়। এসময় শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে পুরো এলাকা সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এভাবেই সেদিন স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ আর যুবলীগের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলতে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থী আর জনতার। শিক্ষার্থীদের ওপরে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ-যুবলীগ আর নিষ্ঠুর পুলিশের এমন আক্রমণ কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না শাহ আলম। যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করা নিরিহ শিক্ষার্থীদের ওপর এমন বর্বরোচিত হামলা দেখে হয়তো শাহ আলমের মনে পড়ে গিয়েছিলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা' এর সেই বিখ্যাত চরণ গুলো,

> **"ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পড়ো না দুখে,**
> **পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।**
> **তখতে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,**
> **তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।"**

তাই একপর্যায়ে প্রতিরোধে সামিল হন তিনি নিজেও। অতঃপর আন্দোলন স্থলে দ্বিতীয়বার ফিরে আসে ঘাতক পুলিশ, এবার কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ভবন থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী-জনতার ওপর অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করে তারা। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে শাহ আলমের মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষ গিয়ে প্রতিরোধ শুরু করলে, ওই ভবনেই আটকে পড়ে পুলিশ সদস্যরা। তারপর সংঘর্ষস্থলে আসে বিজিবির কয়েক প্লাটুন সদস্য, তারাও এসে নিরীহ ছাত্র জনতার ওপর একে-৪৭, টাইপ ৫৬ কারবাইন আর অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে।

একপর্যায়ে ঘাতকের ছোঁড়া গুলি এসে লাগে শাহ আলমের বুকে আর মুহূর্তেই বুক ভেদ করে মেরুদন্ডের পাশে আটকে পড়ে সেটি। উঠে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে শাহ আলম। তার সাথে আন্দোলনরত কয়েকজন সাধারণ শিক্ষার্থী বহুকষ্টে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাথে সাথে শুরু হয় অপারেশন, দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার অপারেশনের পর গুলিটি বের করেন মেডিকেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকবৃন্দ।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা শাহ আলম আর দায়সারা চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৮ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর, একটি অপারেশনের মাধ্যমে তার দেহ থেকে বের করা হয় ঘাতকের ছোঁড়া গুলি। তবে ততক্ষণে ঘাতক বুলেট ফুসফুস আর বুক ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল শাহ আলমের, এমন তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও অস্ত্রোপচারের তারিখ বারবার পিছিয়েছে। প্রথম অস্ত্রপ্রচারের পর জ্ঞান ফিরলে শাহ আলম বারবার বুকে আর মেরুদন্ডে যন্ত্রণার কথা জানাচ্ছিলেন। এবার কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চালানোর জন্য ফুসফুসের আরেকটি অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকবৃন্দ। প্রথমে ১ আগস্ট অপারেশনের দিন নির্ধারণ করা হলেও, নানা কারণে বারবার পেছাতে থাকে অস্ত্রোপচারের দিন। ৩ আর ৪ আগস্ট অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দফার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও, আবারো তারিখ পেছানো হয়। অবশেষে শাহ আলমের স্ত্রী শিল্পী বেগমের কাকুতিমিনতিতে ৫ আগস্ট দ্বিতীয় দফার অপারেশন করা হয়। তবে তারপর থেকেই অবস্থা খারাপ হতে থাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী শাহ আলমের। অপারেশন পরবর্তী রোগীর সার্বিক অবস্থার রিপোর্ট, শাহ আলমের পরিবার নিজ দায়িত্বে ঢাকা মেডিকেলের একজন সিনিয়র সার্জনের কাছে নিয়ে গেলে, তিনি জানান, "অপারেশন পরবর্তী রোগীর অবস্থা আরো কিছুটা অবনতি হয়েছে। ফুসফুসের অবস্থা অনুযায়ী, তার অস্ত্রোপচার হয়নি।" অবশেষে, দীর্ঘ ২৬ দিন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকার পর ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার রাত ৩ ঘটিকায় জীবনের সফর শেষ করেন শাহ আলম।

> **"শেষ হলো তার জীবন সফর, নশ্বর পৃথিবীর**
> **অমর হয়ে রইলেন নব স্বাধীনতার বীর।"**

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে শহীদের মরদেহ নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জনাজা শেষে অন্তরপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ শাহ আলমের চিকিৎসা নিয়ে আক্ষেপ রয়ে গেল

শহীদ মোঃ শাহ আলমের স্ত্রী মোসাঃ শিল্পী বেগম অনেকটা আক্ষেপ নিয়ে জানালেন, তার স্বামীর চিকিৎসায় অবহেলা আর ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ সারাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনার কথা। তিনি বলেন, "আমার স্বামীকে ১৮ জুলাই ঢাকা মেডিকেল

কলেজে ভর্তি করার পর, রাত ৮টায় তার কাছে থাকা মুঠোফোন থেকে নম্বর সংগ্রহ করে জানানো হলো আমাদের। দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার পর, রাত ১২টায় অপারেশনের মাধ্যমে তার শরীর থেকে গুলি বের করা হলো। তবে, জ্ঞান ফেরার পর তিনি বুকে আর মেরুদণ্ডে তীব্র ব্যথার কথা জানাচ্ছিলেন। পরে, ৫ তারিখে আরেকটি অপারেশনের পর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছিলেন তিনি। আমরা তার অপারেশন পরবর্তী রিপোর্ট অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসককে দেখালে, তিনি বলেন অপারেশন আশানুরূপ হয়নি। এর মধ্যে হাসপাতালে নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হয়েছি আমরা। আমাদের প্রথমে আইসিইউতে বেড দিতে গড়িমসি করছিলো, মেডিকেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে আমার ভাই, নানা জায়গায় তদবির করলে বার্ন ইউনিটে একটি বেডে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে।"

আমরা তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম চিকিৎসায় সরকার ঘোষিত সহযোগিতার কতটুকু পেয়েছিলেন তারা। উত্তরে তিনি বেশ রাগান্বিত আর হতাশা নিয়ে বললেন, "তেমন কোন সহযোগিতাই পাইনি আমরা। ২৬ দিন মেডিকেলে থাকা আর ঔষধ বাবদ আমাদের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়, যার পুরোটাই আমাদের বহন করতে হয়েছে।"

শহীদ পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ শাহ আলমের অবর্তমানে পরিবার নিয়ে বেশ দুর্দশায় পড়েছেন স্ত্রী শিল্পী বেগম। পূর্বে তার উপার্জিত অর্থ দিয়েই পরিবার চলত তাদের। তাই এখন পিতৃহীন তিন সন্তান আর আগামী দিন নিয়ে বেশ চিন্তিত তিনি। শহীদের স্ত্রী জানান, "প্রথমে আমার বড় ভাইয়ের থেকে ধার নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি আমার স্বামীর। পরবর্তীতে বাসা-ভাড়া, ছেলে মেয়ের স্কুলের বেতন নিয়ে আবারও দিশেহারা হয়ে পড়ি। এরমধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়ে, তা থেকেই বাসা ভাড়ার ১২ হাজার টাকা বকেয়া পরিশোধ করি। আর বাকি টাকাগুলো এখন দৈনন্দিন চাহিদা অনুসারে খরচ করছি, জানি না এভাবে কতদিন চলবে।" এরই মধ্যে রামপুরা এলাকায় ভাড়া নেওয়া বাসা ছেড়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। অসহায় তিন সন্তানকে নিয়ে এখন উত্তর বাড্ডার ২৫ নম্বর লেনের বাবার বাড়িতেই হবে তার পরবর্তী ঠিকানা। রামপুরার বাসার সাথে ছাড়তে হচ্ছে, শহীদের তিন এতিম সন্তানের বিদ্যালয়ও। আবার গ্রামে অসহায় মা-বাবাকেও নিয়মিত আর্থিক সহায়তা করতো শাহ আলম। তাই পুত্রকে হারিয়ে দিশেহারা তার সবজি বিক্রেতা বাবা রেনু মিয়া আর গৃহিনী মা সাফিয়া বেগম।

প্রস্তাবনা

১: শহীদের পরিবারের এতিম তিন শিশু ও তার অসহায় স্ত্রীর জন্য স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা করা খুব জরুরি।

২: শহীদের দরিদ্র সবজি বিক্রেতা পিতা আর বৃদ্ধা মাকেও আর্থিক সহায়তা করা দরকার।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Joypur Union Parishad
Homna, Cumilla
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 15/08/2024 | Birth Registration Number 19831915425106920 | Date of Issuance 15/08/2024

Date of Birth : 29/11/1983 Sex : Male
In Word : Twenty Ninth of November Nineteen Eighty Three

Name	: Sha Alam
Mother	: Safiya Begum
Nationality	: Bangladeshi
Father	: Renu Miah
Nationality	: Bangladeshi
Place of Birth	: Cumilla, Bangladesh
Permanent Address	: Anantapur, Joypur, Ward - 3, Joypur, Homna, Cumilla

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
MD. JALAL MORSHED

Seal & Signature
Registrar

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
শাহ আলম
SHA ALAM
রেনু মিয়া
সাফিয়া বেগম
Date of Birth 29 Nov 1983
NID No 643 347 4522

শহীদের পূর্ণনাম	: শাহ আলম
জন্ম তারিখ	: ২৯ নভেম্বর ১৯৮৩
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
পিতার নাম	: রেনু মিয়া
পিতার পেশা ও বয়স	: ভ্যানে কাচামালের ব্যাবসা, ৬৫ বছর
মাতার নাম	: সাফিয়া বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৬০ বছর
স্ত্রীর নাম	: শিল্পী বেগম
স্ত্রীর পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩২ বছর
পরিবারের মাসিক আয়	: কোনো আয় নেই
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন

সন্তানদের নাম, বয়স ও প্রতিষ্ঠান:

১) মো: সাব্বির (১৫), আল ফোরকান হাই স্কুলের ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত
২) মো: ইয়ামিন (১১), আল ফোরকান হাই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত
৩) মোছা: ফাহমিদা (০২), আল ফোরকান হাই স্কুলের ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত

আহত হওয়ার স্থান	: রামপুরা ব্রীজের কাছে, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: বিকাল আনুমানিক ৫টা
নিহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ১৩ আগস্ট ২০২৪, রাত: ৩টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: অন্তরপুর কবরস্থান, জয়পুর, কুমিল্লা

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: অনন্তপুর, ইউনিয়ন: জয়পুর, উপজেলা: হোমনা, জেলা: কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: রোড নম্বর: ২৫, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

শহীদ আবু বকর রিফাত

ক্রমিক : ০৫০

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আবু বকর রিফাত ঢাকার মাতুয়াইল, কদমতলী এলাকার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ২০০১ সালের ১৪ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মো: আওলাদ হোসেন একজন মুদি দোকানদার এবং মাতা মোসা: বিউটি আক্তার একজন গৃহিণী। শহীদ আবু বকর রিফাতের আরও দুই ভাই ও এক বোন রয়েছে। তার বড় দুই ভাই মো: মাহবুবুর রহমান রানা এবং মো: সাইম আহমেদ। ছোট বোন মোসা: সামিয়া আক্তার।

ভাইদের মধ্য শহীদ আবু বকর রিফাত ছোটকাল থেকেই দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তার মা-পবাবারও স্বপ্ন ছিল পরিবারের ছোট ছেলে কোরআনের হাফেজ হবে। সেজন্য তাকে স্থানীয় একটি কওমী মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। অল্প সময়েই তিনি ৬ পারা কোরআন মুখস্ত করে ফেলেন। কিন্তু পারিবারিক নানান ঝামেলার কারনে তার পুরো কোরআন হেফজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পর তাকে মোহাম্মদবাগ আদর্শ জুনিয়র স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। ২০২০ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পারিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কারনে তার পড়াশোনা এখানেই ইতি টানতে হয়। পরবর্তীতে বঙ্গবাজারে একটি কাপড়ের দোকানে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ৫ আগস্ট ২০২৪ পুলিশ ও যুবলীগের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

শাহাদাতের ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুরে স্বৈরাচার সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যায়। পদত্যাগের পরপরই সারাদেশে ছাত্রজনতা আনন্দ মিছিল বের করে। রাজধানীতে আন্দোলনের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থেকে সেদিন লাখো লাখো মুক্তিকামী মানুষ আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল ঢাকার রায়েরবাগ এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে পুলিশ জনতাকে লক্ষ্য করে অতর্কিত গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে।

সেখানে শহীদ আবু বকরও ছিলেন। কয়েকটি বুলেট তার বুকে এসে লাগে। মুহূর্তেই ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার শরীর। তার নিথর দেহ মাটিতে পড়ে থাকে। কেউ উদ্ধার করতেও আসতে পারে না। পরবর্তীতে পুলিশের হামলা কিছুটা কমলে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মাতুয়াইলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে য়ায়। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পারিবারিক অবস্থা

৪ ভাই- বোনের মধ্যে শহীদ আবু বকর রিফাত সবচেয়ে ছোট। তার বাবা একজন মুদি দোকানদার এবং তার বড় দুই ভাই সৌদি প্রবাসী। আর ছোট বোন মোছাঃ সামিয়া আক্তার দারুল উলূম মহিলা কওমী মাদ্রাসায় শরহে বেকায়া জামাতে অধ্যয়নরত। যাত্রাবাড়ী মোহাম্মদবাগ এলাকায় ৬ শতক জমির উপর ১ তলা বিশিষ্ট একটি ছোট বাড়ি আছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

চাচাত ভাই মোঃ জুনায়েদ বলেন, "শহীদ আবু বকর রিফাত ছিল অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। সে ৬ পারা কোরআনের হেফজ সম্পন্ন করেছে। একজন পরহেজগার যুবক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল। সে সবসময় মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ছিল।"

Specialized Medical Care Hospital
71, Didar Vista, College Road, South Matuail, Demra, Dhaka- 1362.
সিরিয়াল: ০১৯৩৫-৫৮৯৩৩৩, ০১৯৩৮-৫৯৯৩৩৩

Name: Abu Bokor Rifat Age: 23 yrs Sex: Male Weight: ......Kg.
Diagnosis: Brought death Date: 05.08.24

Rx

Patient name : Rifat
Full Name — Abu Bokor Rifat
Age — 23 yrs

O/H -
BP - Non recordable
No pulse
No R/R
Pupil full dilated & not reacted to light

He was taken here by ... at our hospital
Brought death.

ADV
ECG. (Flat line)
Death is confirmed by ECG.

নির্ম পর ব্যবস্থাপত্র সংরক্ষণ করবেন।
ধন্যবাদ আবার আসবেন

• হাসপাতাল সেবা • ২৪ ঘন্টা সেবা • ডায়াগনস্টিক • বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বার • ICU, NICU, PICU, HDU, CCU, Dialysis

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আবু বকর রিফাত
Name: ABU BOKOR RIFAT
পিতা: মোঃ আওলাদ হোসেন
মাতা: মোসাঃ বিউটি আক্তার
Date of Birth: 14 Jun 2001
ID NO: 8475754088

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ আবু বকর রিফাত
পেশা	: দোকানের কর্মচারী
জন্ম তারিখ	: ১৪/০৬/২০০১
জন্ম স্থান	: ঢাকা
পিতা	: জনাব মো: আওলাদ হোসেন, পেশা: মুদি দোকানদার
মাতা	: মোসা: বিউটি আক্তার, পেশা: গৃহিণী
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর আড়াইটার দিকে
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, যাত্রাবাড়ী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: পূর্ব কদমতলী, মাতুয়াইল, ঢাকা

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম

ক্রমিক : ০৫১

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম (৩৯) একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও তার মন ছিল খুবই উদার। মনোবল ছিল দৃঢ় আর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া ইউনিয়ন এর কাজলারপাড়ের এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত গফুর কালু মিয়া এবং মা মৃত সেলিনা বেগম। ছোট বয়সেই তিনি তার বাবা-মা কে হারান। বড় বোন পারভিন আক্তারই নিজের ছোট ভাইকে লালন পালন করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রীসহ দুই কন্যা সন্তানের জনক। তার দুই কন্যা মোসা: মিথিলা খাতুন (২০) বিবাহিতা এবং সিনথিয়া বেগম (১৪) কাজলাপাড় উচ্চ বিদ্যালয় এর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। পেশাগত জীবেনে তিনি একজন সবজি বিক্রেতা হিসেবে এলাকায় বেশ পরিচিত। আচার-ব্যবহার ও হাসি-খুশি ব্যক্তি হিসেবে সকলেই তাকে ভালো জানতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন সবজি বিক্রেতা

শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ফুটপাতে এবং ফেরী করে সবজি বিক্রি করতেন। প্রতিদিন তিনি কাজলারপাড় এলাকার সবজি আড়ত থেকে তার আয়ের একমাত্র অবলম্বন সবজি কিনে রাস্তায় ফেরী করে বিক্রি করতেন। প্রতিদিন যে টাকা আয় করতেন তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এর মধ্যেও তার সবজি বিক্রি করতে হতো তা না হলে তার সংসার চলতো না। জুলাইয়ের শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। চূড়ান্ত রুপ নেয় ১৬ জুলাই এর পর থেকে। এমতাবস্থায়, ঢাকাসহ সারাদেশের সর্বত্রই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হয়। তারই প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম।

প্রতিদিনের ন্যায় জাহাঙ্গীর আলম সবজি বিক্রির উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। দিনটি ছিলো ১৯ জুলাই ২০২৪ সাল রোজ শুক্রবার। তিনি কাজলারপাড় এলাকার সবজি আড়ত থেকে তার আয়ের একমাত্র অবলম্বন সবজি কিনে বিকেল ৪:৩০টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে ডেমরা রোডে কাজলা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যান। সেখানে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর অনবরত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম ঘটনাস্থলে কিছু বুঝে উঠার আগেই স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ বাহিনীর একটা বুলেট এসে তার বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়।

গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হয়ে যান। তাঁকে প্রাথমিকভাবে কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। পরে স্থানীয় এলাকার লোকজন দেখে চিনতে পারলে তার ভাই হাসানকে ফোন করে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকার বিষয়টি জানানো হয়। তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের লোকজন ছুটে গেলে শহীদ জাহাঙ্গীর আলমকে উদ্ধার করে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কর্তব্যরত ডাক্তার জানায় বুকে গুলি লাগায় প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে শহীদ জাহাঙ্গীর আলমকে মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে বড় বোনের স্মৃতিচারণ

শহীদের বড়ো বোন পারভিন আক্তার বলেন, "শহীদ মো: জাহাঙ্গীর আলম একজন সহজ সরল মানুষ ছিলেন। তাকে কেউ বকা দিলে সে তা হজম করতেন তবুও কোনো কটু কথা বলতেন না। কারও সাথে কোনো ঝামেলায় জড়াতেন না। দুই মেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন। শহীদ জাহাঙ্গীর আলম এর যখন ১৪ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যায়। মা মারা যাওয়ার পর আমিই তাকে বড় করেছি। আমি ভাইকে ভালো রাখার জন্য মশারি কারখানায় কাজ করে তাদের খাবার জোগান দিয়েছি। আমি কোথাও তার মায়া ছেড়ে যেতে পারতাম না। কারণ, আমাকে এক মুহূর্ত না দেখলে আপা, আপা করে চারিদিকে খুঁজে বেড়াত। আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।"

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: জাহাঙ্গীর আলম, পেশা-সবজি ব্যবসায়ী
পিতা	: মৃত গফুর কালু মিয়া
মাতা	: মৃত সেলিনা
জন্মতারিখ	: ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সাল
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, কাজলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা / ঢালের সন্নিকটে, যাত্রাবাড়ী
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:৩০, কাজলা ব্রিজ সংলগ্ন
স্থানী ঠিকানা	: কাজলাপাড়, ইউনিয়ন- দনিয়া, থানা-যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
শহীদের বড় বোন	: পারভিন আক্তার

সন্তান হারানো পিতা আজ নিজেই হারিয়ে গেলেন

শহীদ মো: আসলাম

ক্রমিক : ০৫২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫২

শহীদ পরিচিতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। তাদের মধ্যে শহীদ মো আসলাম ছিলেন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী এক ব্যক্তি। শহীদ মো: আসলাম ঢাকা যাত্রাবাড়ির ১৭, উত্তর কুতুবখালী এলাকায় বসবাস করতেন। তার জন্মও এই এলাকায়। দরিদ্র হলেও সমাজে তিনি নম্র, ভদ্র, সহ-সরল, নামাজি হিসেবে ছিল বেশ পরিচিতি। তার পিতা মো: আলী (মৃত) ও মাতা মোসা: মমতাজ বেগম। স্ত্রীর সাথে অনেক আগেই বিচ্ছেদ হয়ে যায় শহীদ আসলামের। তিনি বৃদ্ধা মা মমতাজ বেগম (৭০), বোন শারমিন (৩৪) ও তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে যাত্রাবাড়ি উত্তর কুতুবখালীতে বসবাস করেন। তার দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো- ছেলে রিফাত হাসান (১৮) দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ। তার মেয়ে মোসা: মিম আক্তার বিবাহিতা। পরিবারের সবাইকে রেখে শহীদ আসলাম চলে গেলেন দুনিয়া থেকে।

শাহাদাত বরণের ঘটনা

মো: আসলাম রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী কুতুবখালী এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি নিজ বাড়িতে খাবার প্রস্তুত করতেন এবং সেটা বিভিন্ন হোটেল, অফিস ও বাসাতে সরবরাহ করতেন। গত ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে দুপুর দুইটায় পেশাগত কারণে উত্তর কুতুবখালী এলাকায় আড়ৎ ও সিএনজি পাম্পে খাবার (ভাত-তরকারি) বিক্রি শেষ করে বাসার উদ্দেশ্য বের হন। অতঃপর বাসায় পৌঁছানোর পর চারিদিকের চিৎকার চেচামেচি হট্টগোল তার কানে আসে।

তার বাসার পাশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিল অবস্থান করে। একপর্যায়ে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া শুরু হয়। সন্ত্রাসী পুলিশবাহিনী আসলাম সাহেবের বাসার গলিতে অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে পুলিশ আসলাম সাহেবের বাসায় ঢুকে পড়ে। এসময় নিজ বাসার সিড়িতে অবস্থান করছিলেন তিনি। কথা না বাড়িয়ে আসলাম সাহেবকে (৫৬) মাত্র এক হাত সামনে থেকে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিটি তার শরীরের বাম পাশের হাত ও কাঁধের সংযোগস্থল ক্ষত-বিক্ষত করে বেরিয়ে যায়। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

শহীদ সম্পর্কে তার ভাগ্নের অনুভূতি

"আমার মামা একজন সহজ-সরল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ব্যাক্তি ছিলেন। ভাত-তরকারি বিক্রি করে তিনি সংসার চালাতেন। আমার মামা কোনো আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না। আমি তার হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি চাই।"

বেগম মমতাজের দায়িত্ব কে নিবে

শহীদ আসলাম তার ভাড়া বাসায় ৭০ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে বসবাস করতেন। তার পিতা মো: আলীও জীবিত নাই। তাদের সাথে থাকতেন ৩৪ বছরের বোন শারমিন। বৃদ্ধা মায়ের কোনো ছেলে সন্তানও নেই যে, তার ভরণপোষণের খরচ বহন করবে। স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনী তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে।

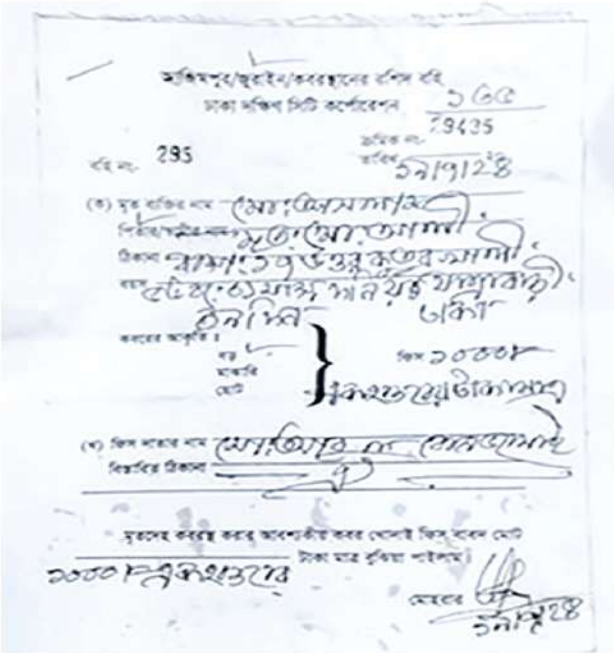

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: আসলাম
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: ১৭, উত্তর কুতুবখালী, ইউনিয়ন: দনিয়া, থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা ঢাকা
পেশাগত পরিচয় কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: নিজের বাড়ীতে খাবার প্রস্তুত করে বিভিন্ন হোস্টেল, অফিস সমূহে সরবরাহ করতেন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
শহীদের বাবা	: মরহুম মোহাম্মদ আলী
শহীদের মা	: মমতাজ বেগম
শহীদের সন্তান	: এক ছেলে ও এক মেয়ে, **ছেলে রিফাত হাসান ৫ বছর বয়সে ১৩ বছর আগে নিখোঁজ হন**
মেয়ে	: মোসা: মিম আক্তার, বিবাহিতা
শহীদের বোন	: শারমিন আক্তার (৩৪)
ঘটনার স্থান	: ৩/১ উত্তর কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী (নিজ বাসায়)
আক্রমণকারী/আঘাতকারীর	: খুনি হাসিনার পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল ও তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সময়: দুপুর ২.৩০টা
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, দুপুর ৩টা, উত্তর কুতুবখালী

পরবর্তীতে জানাজা সম্পন্ন হলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত জুরাইন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়

আজ সন্তান হারানো পিতা আজ নিজেই হারিয়ে গেলেন

শহীদ মোঃ জসিম

ক্রমিক : ০৫৩

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৩

শহীদ পরিচিতি

মোঃ জসিম ১৯৮৯ সালের ২৮ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জহির ও মাতার নাম ফিরোজা বেগম। এক সন্তানের জনক জসিম পেশায় ছিলেন একজন অটোরিকশা চালক। ছোট বেলায় বাবা মারা যাওয়ায় কাঁধে তুলে নিতে হয় মা আর ছোট ভাইয়ের দায়িত্ব। ফলে লেখাপড়া করার ভাগ্য হয়নি তার। শহীদ জসিম বাল্যকাল থেকেই মার্জিত ও বিনয়ী ছিলেন। একজন নামাজি ও পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে সুনাম ছিল তার।

যেভাবে শাহাদাতের সুধা পান করলেন

২১ জুলাই ২০২৪। দিনটি ছিলো রবিবার। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষিত 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলছে। স্বৈরাচার সরকার কারফিউ জারি করে। পুরো দেশের পরিস্থিতি থমথমে। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর তাণ্ডবে জনজীবনে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা নেমে আসে। তবুও তা শহীদ জসিমকে মসজিদে যাওয়া থেকে ফেরাতে পারেনি। ছাত্র আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল যাত্রাবাড়ী। সেখানকার গোয়ালবাড়ি মোড় শাহী মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন তিনি।

নামাজ শেষে মুসল্লিরা মসজিদ থেকে বের হলেই আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী অতর্কিত গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জসিম। ঘটনাস্থলেই শাহাদাৎ বরণ করেন।

জসিমের শাহাদাতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। তার এমন আকস্মিক মৃত্যু যেন কেউ মেনে নিতে পারছে না। জানাজা শেষে দনিয়া পঞ্চায়েত কবরস্থানে তাকে চিরদিনের জন্য শায়িত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য/অনুভূতি

"জসিমের সাথে এলাকার কারও শত্রুতা নেই। সদা হাস্যজ্জ্বল একজন ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাকে কখনও কারো সাথে দুর্ব্যবহার করতে দেখিনি।" হিরা আক্তার (শহীদের ভাবী)

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মো: জসিম ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি অটোরিকশা চালিয়ে দৈনিক গড়ে ৫০০ টাকা রোজগার করতেন। তার মৃত্যুতে বিপাকে পড়েছেন তার স্ত্রী। শহীদ জসিমের জীবন আহমেদ নয়ন (২০) নামে একজন ছেলে আছে। জীবন ফুড ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে পরিবারের হাল ধরার চেষ্টা করছে।

সহযোগিতার জন্য প্রস্তাবনা

স্থায়ী বাসস্থান, সন্তানের কর্মসংস্থান এবং স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন অর্থসহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।

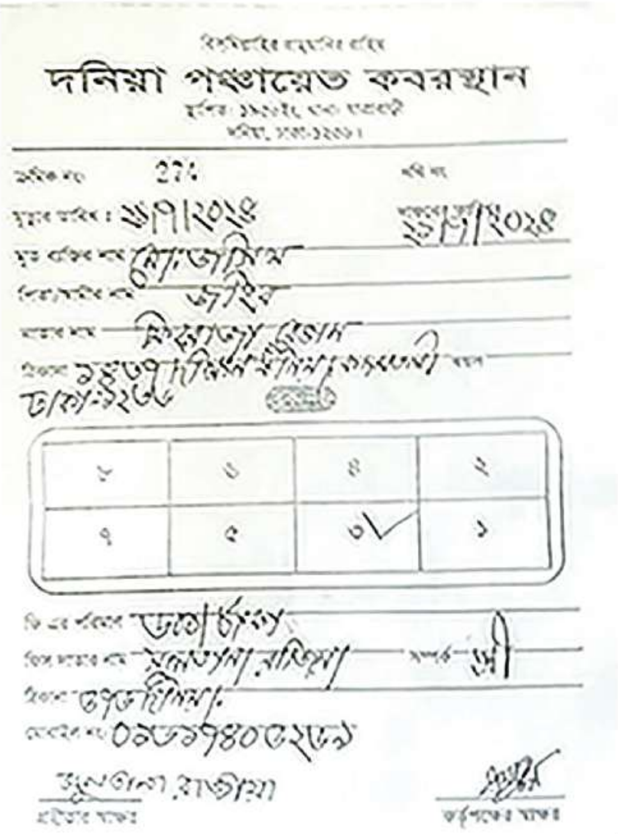

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: জসিম
জন্ম	: ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
শহীদের পেশা	: অটোরিকশা চালক
পিতা	: জহির (মৃত)
মাতা	: ফিরোজা বেগম (৬০)
স্ত্রী	: গৃহিণী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: বাড়ি নং ৫৭০, দনিয়া বাজার, কদমতলী, ঢাকা
শহীদের সন্তান	: ১ ছেলে
	: জীবন আহমেদ নয়ন (২০), ফুড ডেলিভারি ম্যান

“কার কাছে বিচার চাইব? আমার কলিজাডারে যে মারছে একদিন না একদিন আল্লাহ তার বিচার করবো।”

শহীদ জিল্লুর শেখ

ক্রমিক : ০৫৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

জিল্লুর শেখ গোপালগঞ্জের শেখ হাসান ও শাহনাজ বেগম দম্পতির প্রথম সন্তান। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কাঠি ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া গ্রামে ২০০৭ সালের ১৪ জুলাই তার জন্ম। চার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তার মেজো ভাই দশম শ্রেণিতে ও ছোট ভাই তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। ছোট বোনের বয়স মাত্র দুই বছর। প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন জিল্লুর। সন্তানের সফলতায় মুগ্ধ হয়ে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসেন তার বাবা-মা। স্কুলের রচনা প্রতিযোগিতায় হাজার শব্দে জিল্লুর জানান দিয়েছিলেন নিজের স্বপ্নের কথা। স্কুল থেকে ফিরে বাবা-মা'কে এসে বলেছিলেন- 'একদিন বড় হয়ে মস্ত বড় অফিসার হবেন।' শহীদ জিল্লুরের পিতা জনাব হাসান ঢাকার মেরুল বাড্ডায় ব্যবসা করেন। ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে মাছের আড়ৎদারী বাণিজ্য তার। বাড্ডার আফতাব নগরে পরিবারের সাথেই থাকতেন জিল্লুর শেখ। ২০২৪ সালে বনশ্রীর ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৪.৯৬ পেয়ে এসএসসি পাশ করেছিলেন তিনি। আফতাব নগরের ইম্পেরিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রথম ধাপে পা রেখেছিলেন শহীদ জিল্লুর।

মা নামাজ পড়তে যাই, বললাম যাও, নামাজ পড়ে বাসায় চলে এসো। আমার ছেলে আর ফেরেনি।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ

“কার কাছে বিচার চাইব? আমার কলিজাডারে যে মারছে একদিন না একদিন আল্লাহ তার বিচার করবো।” নাতির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবেই কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলেছেন শহীদের শতবর্ষী দাদি। শহীদের প্রতিবেশী আহমদ সালেহ বলেন- “শহীদ জিল্লুর শেখ অনেক ভালো ছিল। সে ছোট বয়স থেকে নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছিল। লেখাপড়ায়ও ছিল অত্যন্ত মেধাবী। সবসময় ছোটদেরকে স্নেহ এবং বড়দেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলত। নামাজের সময় হলে মসজিদে যেতে দেরি করত না ছেলেটি এবং অন্যায় কাজে কখনও কাউকে সমর্থনও করত না।”

শহীদ জননী বলেন, “কার কাছে বিচারের কথা বলব? আর বিচার করলে হাসিনা কি আমার ছাওয়ালরে ফেরত দিতে পারবে, আমার ছাওয়ালরে যে মারছে, আল্লাহ একদিন না একদিন তাদের বিচার করবে। আমার সন্তান অবুঝ। গত ১৫ জুলাই কলেজে ভর্তি করেছি। ঘটনার দিন জিল্লুর বলে, মা নামাজ পড়তে যাই, বললাম যাও, নামাজ পড়ে বাসায় চলে এসো। আমার ছেলে আর ফেরেনি। পুলিশ আমার অবুঝ ছাওয়ালরে কেন মারল।”

শহীদ পিতা জনাব হাসান শেখ বলেন, “ওইদিন দুপুরে নামাজে যাওয়ার আগে আমি আমার সন্তানকে ঘরে দেখে গিয়েছি। ওর বন্ধুর ফোন পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমার বাবা রক্তের উপরে শুয়ে আছে।” জিল্লুরের ফুফা ইমদাদুল মোল্লা বলেন, সন্তানদের ভালো পড়াশোনা নিশ্চিত করতে তার বাবা-মা গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসেন। কিন্তু ঘাতকের গুলি তাদের সব স্বপ্ন-আশা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।”

তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার!
“চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।”

আন্দোলন যখন তুঙ্গে

সারাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস ছিল আন্দোলনের মাস। ছাত্র-জনতা এক হয়ে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে তুলেছিল দুর্বার আন্দোলন। আন্দোলিত হয়েছিল গোটা জাতির হৃদস্পন্দন। যার উত্থাপন ছিল সরকারী চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবি নিয়ে। একপর্যায়ে তৎকালীন খুনি হাসিনা সরকার সহিংসতার মাধ্যমে ছাত্রদের দমন করার চেষ্টা করলে সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে যোগ দেয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, কোটাকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে হবে। দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে আবস্থান কর্মসূচী ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠন। যার প্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী হাসিনা মন্তব্য করে, **“মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তাদের এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা কোটা সুবিধা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা পাবে?”** হাসিনার এই বিরূপ বক্তব্যের পর, ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা রাজপথে স্লোগান দিতে থাকে, **“তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার।”** অতঃপর সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। কর্মসূচী ভেস্তে দিতে টিয়ার শেল, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলি, গুম, খুন, নির্যাতন, মামলা করে ছাত্র-জনতাকে হয়রানি করে স্বৈরাচারী হাসিনার পালিত গুন্ডা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। হাসিনার ইন্ধন পেয়ে হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ করে ঘাতক র‍্যাব। ফ্যাসিস্ট সরকারের বিজিবি সাধারণ জনতার বুকে গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। দেশীয় অস্ত্র ও রাইফেল নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে আওয়ামী দাগী সন্ত্রাসীরা।

আন্দোলনে যোগদান

বন্ধুদের সাথে রামপুরা এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন শহীদ জিল্লুর। বাসায় বললে মা রাগ করবে। এজন্য কাউকে না জানিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়তে নিয়মিত রাজপথে যাতায়াত ছিল তার। শাহাদাতের ময়দানে যোগ দিতে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ দুপুর ১২:৪৫ এর দিকে জিল্লুর তার মা'কে জানায়- 'মা নামাজ পড়তে যাই, শহীদ জননী বলেন-'যাও, নামাজ পড়ে বাসায় চলে এসো।' মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে ভালো করে অজু করে নেয় জিল্লুর।

চার রাকাত ফরজ নামাজ শেষ করে মোবাইল হাতে নেয়। খেয়াল করে দেখে, বন্ধুরা মেসেজ দিয়েছে। একসাথে আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের বুক পেতে দেয় শহীদ জিল্লুর শেখ

শাহাদাতের পথে

সময় ১:৪৫। জিল্লুর শেখ মসজিদ থেকে বের হয়ে আফতাবনগরের দিকে যাত্রা শুরু করে। এরপর বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। মিছিল নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির দিকে যাত্রা শুরু করে। আকস্মিক মিছিলকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিস্ট সরকারের পালিত পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে এলোপাথাড়ি রাবার বুলেট, টিয়ার শেল, ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে ঘাতক পুলিশ বাহিনী। হঠাৎ কয়েকটি গুলি জিল্লুরের শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের বুক পেতে দেন তিনি। একটি গুলি তার মাথা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। দ্রুত বন্ধুরা তাকে আদাবর নাগরিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথেই দুপুর ২ টার সময় শাহাদাত বরণ করেন শহীদ মো: জিল্লুর শেখ। তবুও শহীদকে নিয়ে হাসপাতালে পৌছায় তার সহপাঠীরা। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানায়- "তোমাদের বন্ধু আর নেই। তিনি দুনিয়ার মোহ ছেড়ে পরপারে মহান মনিবের কাছে চলে গেছেন।" শহীদের প্রথম জানাজা রাজধানীর বাড্ডায় সম্পন্ন হয়। পরের দিন নিজ গ্রামে ১৯ জুলাই সকাল ৮টায় কাঠি, সপ্তপল্লী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পশ্চিমপাড়া কবরস্থানে চির নিদ্রায় শায়িত হন শহীদ জিল্লুর শেখ।

শহীদের মৃত্যুতে যেন একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। তিনি ছিলেন সম্ভাবনাময় এক তরুণ, যার প্রতিভা ফুটে উঠেছিল তার পড়াশোনা সহ সকল কাজে। তার মৃত্যু শুধু পরিবার নয়, তার স্কুল, খেলার সাথী এবং পুরো সমাজের জন্য এক অমোচনীয় ক্ষতি। শহীদ চিরতরে আমাদের থেকে বিদায় নিলেও তাঁর আদর্শ, বিনয়, এবং সংগ্রাম আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

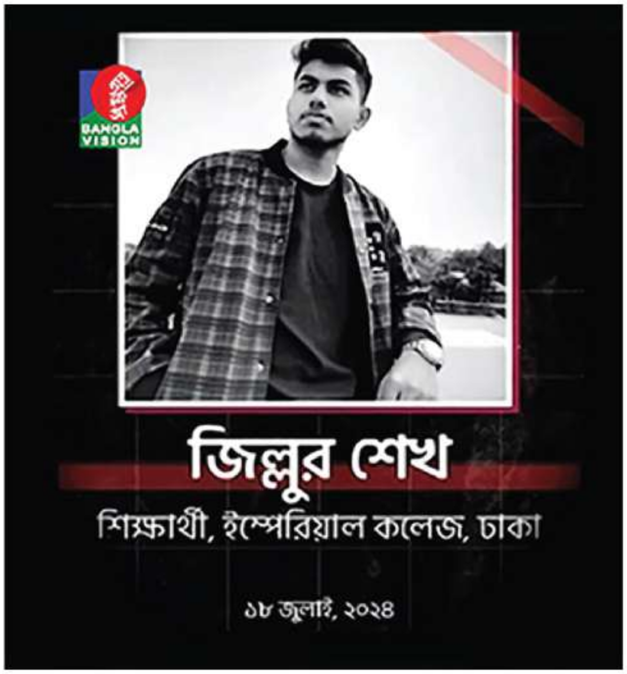

www.youtube.com › watch
আন্দোলনের মাঠে পুলিশের গুলি থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে নিজে বুক ...
আন্দোলনের মাঠে পুলিশের গুলি থেকে বন্ধুকে বাঁচাতে নিজে বুক পেতে দিয়েছিলেন শহীদ জিল্লুর শেখ · Comments143.
YouTube · BVNEWS24 · ৩ দিন আগে

www.youtube.com › watch
নামাজের কথা বলে বের হয়ে আন্দোলনে গিয়ে শহীদ হন জিল্লুর শেখ ...
নামাজের কথা বলে বের হয়ে আন্দোলনে গিয়ে শহীদ হন জিল্লুর শেখ | শহীদের গল্প - ০১ | Daily Manabzamin · Comments22.
YouTube · The Daily ManabZamin · ১ মাস আগে

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: শহীদ মো: জিল্লুর শেখ
পেশা	: ছাত্র, প্রতিষ্ঠান: ইম্পেরিয়াল কলেজ, ঢাকা, শ্রেণি: একাদশ
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৪ জুলাই ২০০৭, ১৭ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার, আনুমানিক দুপুর ২টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনে
দাফন করা হয়	: পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কাঠি, সপ্তপল্লী, জেলা: গোপালগঞ্জ
পিতা	: মো: শেখ হাসান
মাতা	: মোছা: শাহনাজ বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: শহীদ পিতার গ্রামে ১০ শতাংশ জমি রয়েছে

ভাইবোনের বিবরণ

মো: জোবায়ের শেখ
পেশা : ছাত্র
প্রতিষ্ঠান : ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
শ্রেণী : ১০ম
সম্পর্ক : ভাই
বয়স : ১৫

২. মো: জোনায়েদ শেখ
পেশা : ছাত্র
প্রতিষ্ঠান : ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
শ্রেণী : ৩য়
সম্পর্ক : ভাই
বয়স : ০৯

৩. মোসা: হীরা জাহান নূর
সম্পর্ক : বোন
বয়স : ০২

“একাকী জীবন উৎসর্গ করে গেলেন নি:সঙ্গ শেরপা মনসুর মিয়া”

শহীদ মোঃ মনসুর মিয়া

ক্রমিক : ০৫৫

আইডি: ঢাকা সিটি ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

সামাজিক অসঙ্গতি আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে সদা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন শহীদ মো: মনসুর মিয়া। কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হয়েও ন্যায় ও সত্যের পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা শহীদ মনসুর চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। ১৯৮১ সালের নভেম্বরের ৩ তারিখে ঢাকার মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন মনসুর মিয়া। তার পিতার নাম একলাল মিয়া এবং মাতার নাম খায়রুন নেসা। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তান মামুন ইমাম রিমন (১০) কে নিয়ে মনসুর মিয়ার সুখের সংসার। শিশু রিমন মাদ্রাসায় আমপারা বিভাগের ছাত্র। পেশাগত জীবনে তিনি একটি পাম্পে চাকরি করতেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মনসুর ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ২৩/০২ বছিলা, মোহাম্মদপুরে পৈতৃক জমিতে একটি ঘর থাকা সত্ত্বেও তিনি পরিবার নিয়ে আলাদা বসবাস করতেন। শাহাদাতের পূর্বে পাম্পের মিস্ত্রি হিসেবে চাকরি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তিরোধানে উপার্জনের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানের সামনে ঝুলে আছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শংকা।

শাহাদাতের ঘটনার সামগ্রিক বিবরণ

২০২৪ এর জুলাইতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ক্রমে জোরদার হতে থাকে। ধীরেধীরে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, হকার, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি বাড়তে থাকে পুলিশ-বিজিবি-র‍্যাব ও স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের সশস্ত্র সন্ত্রাসী নেতাকর্মীদের হামলা ও আক্রমণ। ছাত্রজনতা সকল খুন-গুমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রাজপথে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকে।

এমতাবস্থায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতারা ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা করেন। ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের দিকে ঢাকার মোহাম্মদপুরের বছিলা ব্রীজের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। র‍্যাব সদস্যদের সাথে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা যৌথভাবে নিরস্ত্র প্রতিবাদী ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। শহীদ মনসুর মিয়া সেখানেই গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীদের মধ্যে র‍্যাব এর পাশাপাশি স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের সদস্যরা জড়িত ছিলো। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার অব্যবহিত পরে আহত মনসুর মিয়াকে তার ভাই ও চাচাতো ভাইয়েরা দ্রুত উদ্ধার করে রাত ৮টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটলে চিকিৎসকরা তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করেন। পরের দিন অর্থাৎ ২০ জুলাই শনিবার দুপুর ৩ টার দিকে মনসুর মিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। আনুমানিক রাত ৮ টায় বছিলা গার্ডেন রোজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় অংশ নেয় তার অসংখ্য গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ী মানুষ। এলাকাবাসী ও সহকর্মীরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত দোষীদের বিচারের দাবী জানান। জানাজা শেষে রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শহীদ মনসুর মিয়াকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ মো: মনসুর মিয়া পূর্বে তার পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্মিত একটি ঘরে বসবাস করতেন। একাধিক সূত্রে জানা যায়, সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ চলছিল।

শহীদের সামাজিক অবস্থান:

শহীদ মনসুর মিয়া সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তথাপি সামাজিক বৈষম্য নিরসন এবং ন্যায়বিচারের দাবীতে তিনি বরাবরই সোচ্চার ছিলেন। তার এই রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং সামাজিক কার্যক্রম তাকে স্থানীয়ভাবে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তার জানাজায় অসংখ্য শোকসন্তপ্ত মানুষ অংশ নেয়।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পূর্ণ নাম	: শহীদ মো: মনসুর মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০৩/১১/১৯৮১
জন্মস্থান	: বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
পিতার নাম	: মো: একলাল মিয়া
মাতার নাম	: খায়রুন নেসা (মৃত)
পেশা	: পাম্প মিস্ত্রী
মাসিক আয়	: টাকা ২০,০০০/- (প্রায়)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৩ (তিন) জন
শহীদের সন্তানের বিবরণ নাম	: মামুম ইমাম (রিমন), বয়স: ১০ বছর, শিক্ষা: আমপারা (মাদ্রাসা)
আক্রমণকারী	: র‍্যাব ও আওয়ামী লীগ-যুবলীগ
ঘটনার স্থান	: বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮ টা
মৃত্যুর তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, দুপুর ৩ টা
মৃত্যুর স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবরস্থান	: রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান

সহযোগিতার জন্য প্রস্তাবনা

১. বসবাসের আবাসন প্রয়োজন

২. সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা প্রয়োজন

স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে দুনিয়া ত্যাগ করলেন হাফেজ মোসলেহ উদ্দিন

শহীদ হাফেজ মো: মোসলেহ উদ্দিন

ক্রমিক : ০৫৬

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৬

পরিচিতি

রাজধানীর বনশ্রী আবাসিক এলাকার ব্লক-এ এর আতিক মসজিদের গলিতে একটি ভাড়ায় চালিত লন্ড্রি (মদিনা লন্ড্রি) পরিচালনা করতেন মোসলেহ উদ্দিন। তিনি দ্বীপ জেলা ভোলার লালমোহন উপজেলার গজারিয়া গ্রামের মৃত হানিফ মিয়ার পুত্র। ১৯৯০ সালের ২৯ ডিসেম্বর মা রোকেয়া বেগমের কোল জুড়ে জন্ম নেন শহীদ হাফেজ মোসলেহ উদ্দিন। তার পিতা পেশায় দিনমজুর ছিলেন। একমাত্র ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেন। স্থানীয় মাদরাসা থেকে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন তিনি ।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পিতার মাধ্যমে এক সময় একটি হাট পরিচালিত হত। নদী ভাঙ্গণে হাটটি বিলীন হয়ে যায়। গ্রামের ভিটেবাড়ি ভেসে যাওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন জনাব হানিফ মিয়া। জীবিকার তাগিদে প্রত্যন্ত অঞ্চল ছেড়ে সন্তানকে নিয়ে ওঠেন রাজধানীর ভাড়া বাড়িতে। এখানে জন্ম নেন শহীদের আরো এক সহোদর। জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে ব্যবসার পথ ধরেন শহীদের পিতা।

এরপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর। পরিবারের দায়িত্ব বর্তায় হাফেজ মোসলেহ উদ্দিনের উপর। বনশ্রী এলাকায় পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ করে লন্ড্রি দোকান ভাড়া নেন তিনি। ছেলের উপার্জনে সংসার গুছিয়ে নিতে শুরু করে রোকেয়া বেগম। কিছুদিন পর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন হাফেজ মোসলেহ। শহীদ পত্নী নাসরিন আক্তারের কোল জুড়ে আসে নতুন অতিথি। খড়কুটোর সংসারে বাসা বাঁধে দুশ্চিন্তার বিরামহীন যাতনা। কারণ- একমাত্র ছেলে আফফান প্রতিবন্ধী হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে।

মুহূর্তে তাজা রক্তে শুভ্র পাঞ্জাবী লালে রূপ নেয়।

শাহাদাতের সামগ্রিক বিবরণ

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে শহীদ মোসলেহ উদ্দিন। রাজপথে রুখে দিতে দলে দলে বাহিনী প্রেরণ করে খুনি হাসিনা। স্বৈরাচারীর পাষণ্ড ক্যাডারদের ছত্রছায়ায় গাদ্দার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শিক্ষার্থীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। নির্মমভাবে সাঁজোয়া যান তুলে দেয় জলজ্যান্ত শিক্ষার্থীদের উপর। হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে দ্বিখণ্ডিত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কী নির্মমতা! কোনো মানুষ এই ন্যক্কারজনক কাজ ঘটাতে পারে?

১৯ জুলাই ২০২৪, শহীদ হাফেজ মো: মোসলেহ উদ্দীন দিপ্রহর ১২ টায় বাসা থেকে বের হন। উদ্দেশ্য নিজের কর্মস্থল মদিনা লন্ড্রি। সে সময় রামপুরা-ডেমরা সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হাজার-হাজার শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথ অবরোধ করে রাখে। ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বিটিভি ভবনের পাশ থেকে নির্বিচারে গুলি ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এমনই সময় জুমার নামাজের জন্য মসজিদ থেকে সুমধুর কণ্ঠে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসে। দোকান বন্ধ করে মসজিদে যায় হাফেজ মোসলেহ উদ্দিন। ইমাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা পাঠ শেষে নামাজ আদায় করে বের হন তিনি। সড়কে অবস্থান নেয়া আন্দোলনকারী ও জুমার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া মুসল্লিরা যার যার বাসায় যেতে সড়কে একাকার হয়ে যায়। ঘড়িতে দুইটা বেজে ত্রিশ। হঠাৎ বিটিভি ভবনের পাশে অবস্থান নেয়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি গুলি মোসলেহ উদ্দিনের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তে তাজা রক্তে শুভ্র পাঞ্জাবী লালে রূপ নেয়।

মুসুল্লিরা শহীদ মোসলেহকে বনশ্রী ফরাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়। ক্ষত বিক্ষত শহীদের দেহ থেকে ঝরে পড়া রক্তে রিক্সা রঞ্জিত হয়ে যায়। চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকগণ শহীদের পালস পরিমাপ করে জানায় তিনি আর নেই। খবর শোনা মাত্র শহীদ স্ত্রী নাসরিন আক্তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শহীদ জননী ছেলের দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়িয়ে মাতম করে কাঁদেন। পরবর্তীতে আন্দোলনের কারণে থানা অকার্যকর থাকায় পোস্টমর্টেম ও মামলা ছাড়া শহীদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। হাফেজ মোসলেহ উদ্দিনের লাশ পূর্ব রামপুরা মোল্লাবাড়ী নিরিবিলি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

করুণ পরিস্থিতি

শহীদের পত্নী নাসরিন আক্তার সন্তান সম্ভবা। তার আগামী দিনগুলো কিভাবে কাটবে তিনি জানেন না। একমাত্র সন্তান আফফানের বয়স দশ বছর। জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী শহীদ পুত্রের মাসে কয়েক হাজার টাকার ঔষধের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা, বাবার সঙ্গ, যত্ন প্রয়োজন হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন মোসলেহ উদ্দিন। তাকে হারিয়ে সংসারটি বর্তমানে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। আর্থিক অনটনে জর্জরিত হয়ে মানুষের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কিভাবে চলবে শহীদ পরিবার? শহীদ পুত্রের চিকিৎসা খরচই বা কে দেবে? কে ধরবে এই ভঙ্গুর পরিবারের হাল?

'বয়োবৃদ্ধা শহীদ জননী ছেলের শোক ভুলতে না পেরে এখনও জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। যেন এই তার কোরআনের হাফেজ শহীদ মোসলেহ উদ্দিন ঘরে ফিরবে। আর বলবে 'মা, দরজা খোল, আমি এসেছি।'

প্রিয়জনদের অভিমত

শহীদ মোসলেহ উদ্দীন সম্পর্কে তার ভাই বলেন- "তিনি খুব সরল মনের মানুষ ছিলেন। যে কোনো আমানত যথাযথ ভাবে রক্ষার চেষ্টা করতেন। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে স্বল্প আয় হলেও সেটা দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করতেন। ব্যবহারে ছিলেন অমায়িক। প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ছিলো খুব আন্তরিক"। স্থানীয় দোকানদার মিন্টু বলেন- "মোসলেহ উদ্দিন খুবই ধার্মিক ভদ্র ও নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোসলেহ উদ্দিনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা বনশ্রী ও পূর্ব রামপুরা এলাকায় মানুষের মুখে মুখে।"

'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন

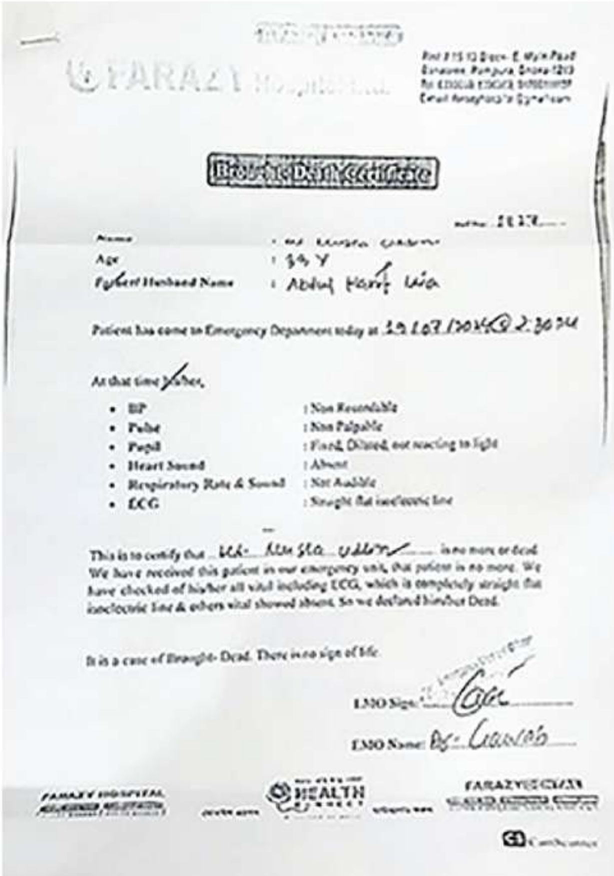

FARAZY Hospital

Brought Dead Certificate

Age : 34 Y

Father/ Husband Name : Abdul Hanif Mia

Patient has come to Emergency Department today at 19/07/2024 @ 2:30 PM

At that time his/her,

- BP : Non Recordable
- Pulse : Non Palpable
- Pupil : Fixed, Dilated, not reacting to light
- Heart Sound : Absent
- Respiratory Rate & Sound : Not Audible
- ECG : Straight flat isoelectric line

This is to certify that Md. Mosleh Uddin is no more or dead. We have received this patient in our emergency unit, that patient is no more. We have checked of his/her all vital including ECG, which is completely straight flat isoelectric line & others vital showed absent. So we declared him/her Dead.

It is a case of Brought- Dead. There is no sign of life.

EMO Sign:

EMO Name:

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: শহীদ মো: মোসলেহ উদ্দিন
পেশা	: লন্ড্রি ব্যবসায়ি, ভাড়ায় চালিত দোকান, মদিনা লন্ড্রী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০, ৩৪ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক দুপুর ২.৪৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির সামনে
দাফন করা হয়	: পূর্ব রামপুরা মোল্লাবাড়ী নিরিবিলি কবরস্থানে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গজারিয়া, পাঙ্গাসিয়া, জেলা: ভোলা
পিতা	: মৃত হানিফ মিয়া
মাতা	: মোছা: রোকেয়া বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নদী ভাঙ্গনে বিলীন
সন্তানের বিবরণ	: ১. মো: আফফান (প্রতিবন্ধী), সম্পর্ক : ছেলে, বয়স : ১০
স্ত্রী	: নাসরিন আক্তার, বয়স: ৩২, পেশা: গৃহিণী

প্রস্তাবনা

১. পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রয়োজন

২. শহীদের প্রতিবন্ধী পুত্রকে ভাতা দেয়া যেতে পারে

৩. পরিবারকে মাসিক বা এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে

“শহীদের ইসমাইলের অপরাধ তিনি পরোপকারী মানুষ ছিলেন”

শহীদ মোঃ ইসমাইল

ক্রমিক : ০৫৭

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৭

শহীদ পরিচিতি

দেশের ক্রান্তিকালে দেশের পক্ষে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষ। শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণ ভুলে সবার পরিচয় হয়ে যায় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। শহীদ ইসমাইলও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই দেশের চরম সংকটকালীন মুহূর্তে মুক্তিকামী মানুষের সাথে রাজপথে নেমে এসেছিলেন তিনি। শহীদ ইসমাইল পেশায় রিকশা চালক। তার বাবার নাম মোঃ ইব্রাহিম মিয়া, মা সাফিয়া খাতুন। জন্ম ১৯৭৮ সালের ৫ মে। তার জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার উজানচর ইউনিয়নের নতুনহাটি গ্রাম। সেখানেই তার বেড়ে ওঠা। পরে রুটি রুজির সন্ধানে চলে আসেন ঢাকায়। বাড্ডা রামপুরা এলাকায় একটি ঝুপড়ি বাড়িতে তিনি পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। মেয়েরা বিবাহিত। ছেলেটি একটি হেফজখানায় পড়ে। গ্রামের বাড়িতে তার বসতভিটা ছাড়া আর কোনো জমা-জমি নাই। স্ত্রী লাকী। ইসমাইল মিয়া ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। ১৯ জুলাই বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে তিনি স্বৈরাচারের ঘাতক বিজিবির গুলিতে আহত হন। মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন।

ঘটনার বিস্তারিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইসমাইল থাকতেন রাজধানীর বাড্ডায়। প্রতিদিন ভাড়া রিক্সা নিয়ে বের হতেন। জীবিকার তাগিদে ১৯ জুলাইও বের হয়েছিলেন রিক্সা নিয়ে। সেদিন ঢাকার রাজপথে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। আন্দোলন চলছিল রামপুরা- ডেমরা সড়কেও। এসময় বিটিভি ভবনের পাশ থেকে আন্দোলনকারীদের দিকে নির্বিচারে গুলি করে পুলিশবাহিনী। পুলিশের নির্বিচারে গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপের পাশাপাশি আরো যোগ দেয় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হয়ে ওঠে ঘাতক বাহিনী।

ইসমাইল রিক্সা চালিয়ে যেতে যেতে দেখেন চারদিকে আহত, গুলিবিদ্ধ মানুষ। নিজের কথা ভুলে যান। রিক্সা থামিয়ে লেগে যান আহতদের পরিচর্যায়। আহতদের পানি পান করান। এভাবে কেটে যায় দুপুর। আহতদের হাসপাতালে পাঠাতে উদ্যোগী হন। স্বৈরাচারের বুলেট গর্জে ওঠে। বিজিবির একটি বুলেট বিদ্ধ করে ইসমাইলের মাথায়। সাথে সাথেই রামপুরার রাজপথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন মো: ইসমাইল মিয়া। ২০ জুলাই সকাল ৮ টায় নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শাহাদাতের সময় শহীদ ইসমাইল তার দুই মেয়ে, এক ছেলে ও স্ত্রী রেখে গেছেন। মেয়ে সানজিদা ও তানজিলা বিবাহিত। ছেলে রামিন হেফজখানার ছাত্র। গ্রামের বাড়িতে শুধু তার বসতভিটা আছে। আর কোনো জমি নাই। রাজধানী উলন রামপুরা এলাকায় থাকতেন একটি ঝুপড়ি বাড়িতে। তার স্বল্প আয়েই চলত সংসার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ ছিলেন তিনি। মৃত্যুর আগে তিনি ঋণ করেছিলেন ৫০ হাজার টাকা। নিজের কোনো রিক্সা ছিল না। ভাড়া রিক্সা চালাতেন।

আত্মীয়দের মন্তব্যঃ

স্ত্রী লাকি তার স্বামীকে তার জীবনের সবচেয়ে ভালো একজন মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আর মেয়ে সানজিদা বলেন, "আমার বাবা একজন নরম দিলের মানুষ ছিলেন। সবসময় আমাদের খোঁজ খবর রাখতেন, যত্ন নিতেন। তার ছিল অমায়িক ব্যবহার। বাবার মতো এমন মানুষ আমরা কোথায় পাব? আমরা আমাদের বাবার হত্যাকারীর বিচার চাই।"

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১

শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া উচিত। তারপর প্রতি মাসে একটি সংসার চলার মতো ভাতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২

তার সন্তানের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা ভাতা দেওয়া দরকার। চিকিৎসা ভাতা ও ফ্রী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।

প্রস্তাবনা-৩

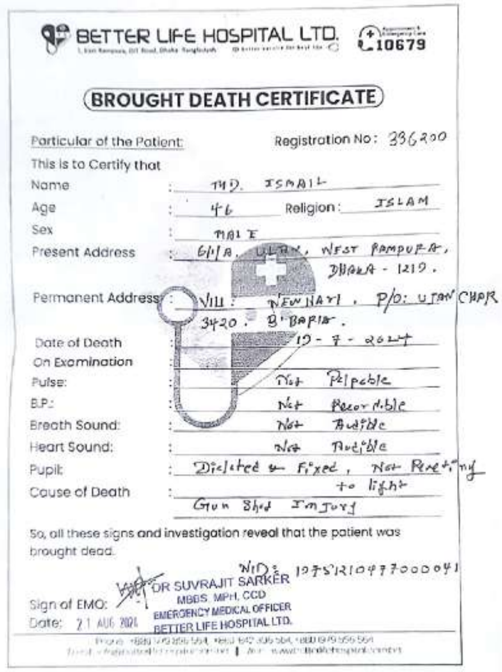

BETTER LIFE HOSPITAL LTD. 10679

BROUGHT DEATH CERTIFICATE

Particular of the Patient: Registration No: 336200

This is to Certify that

Name : MD. ISMAIL

Age : 46 Religion: ISLAM

Sex : MALE

Present Address : 6/1/A, ULAN, WEST RAMPURA, DHAKA - 1219.

Permanent Address : Vill: NEW HATI, P/O: UJAN CHAR 3420. B'BARIA.

Date of Death : 19 - 7 - 2024

On Examination :

Pulse: : Not Palpable

B.P.: : Not Recordable

Breath Sound: : Not Audible

Heart Sound: : Not Audible

Pupil: : Dilated & Fixed, Not Reacting to light

Cause of Death : Gun Shot Injury

So, all these signs and investigation reveal that the patient was brought dead.

NID: 19781210477000041

Sign of EMO: DR SUVRAJIT SARKER MBBS, MPH, CCD EMERGENCY MEDICAL OFFICER BETTER LIFE HOSPITAL LTD.

Date: 21 AUG 2024

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ইসমাইল
Name: Md. Ismail
পিতা: মৃত মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
মাতা: মৃত সাফিয়া খাতুন
Date of Birth: 05 May 1978
ID NO: 19781210477000041

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

নাম	: মো: ইসমাইল
জন্ম	: ০৫-০৫-১৯৭৮
পিতা	: মৃত মো : ইব্রাহিম মিয়া
মাতা	: মৃত সাফিয়া খাতুন
স্ত্রী	: লাকী, সন্তান : দুই মেয়ে, এক ছেলে
শিক্ষা	: ৪র্থ শ্রেণি
পেশা	: রিক্সা চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নতুন হাটি, ইউনিয়ন: উজানচর, থানা : বাঞ্জারামপুর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বর্তমান ঠিকানা	: হোল্ডিং নং ৬/১১, বাড্ডা উলন, রামপুরা, উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
আহত	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
গুলিকারী	: বিজিবি
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ৫.৩০ মিনিট, স্থান : রামপুরা, ঢাকা
জানাজা দাফন	: ২০ জুলাই ২০২৪, রাত: ৮টা
কবর	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

"আমার বাবা আমার নায়ক ছিলেন,
আমার যখন যা প্রয়োজন হয়েছে,
তিনি সব আমাকে দিয়েছেন"

শহীদ মো: বাবুল হাওলাদার

ক্রমিক : ০৫৮

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৮

পরিচিতি

মো: বাবুল হাওলাদার ১৯৭২ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলার গাওলিয়া ইউনিয়নের আপড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতার নাম জাবেদ আলী হাওলাদার ও জননী সুফিয়া বেগম। শহীদের পিতা পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। আর মা পুরোদস্তুর গৃহিণী। যে কারণে পারিবারিক অবস্থা পূর্ব থেকেই শোচণীয় ছিল। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর শহীদের বোন সাংঘাতিক অসুস্থতায় পতিত হয়। একমাত্র বোনের চিকিৎসা খরচ যোগাতে বাধ্য হয়ে পৈতৃক জমি বিক্রি করে রাজধানী অভিমুখী হন শহীদ বাবুল হাওলাদার।

যান্ত্রিক শহরের অভিজ্ঞতা

ঢাকা মহানগরীর রামপুরার উলন নারিকেলবাগ আবাসিক এলাকায় প্রিয় পত্নীকে নিয়ে এক কামরা বিশিষ্ট একটি ভাড়া বাড়িতে দিনাতিপাত শুরু করেন দেশপ্রেমিক হাওলাদার। গাঁয়ের দিনগুলোতে থাকতে আবির শৈলীর কাজ শিখেছিলেন। নতুন শহরে এসে সেই রং মিস্ত্রির কাজকেই তিনি নিজের পেশা হিসেবে বহাল রাখলেন। শুরু করলেন যান্ত্রিক শহরের প্রচলিত পরিশ্রম। কিছুদিন পর শহীদ স্ত্রী মানোয়ারা বেগমের কোল জুড়ে ধরাধামে আসেন প্রথম পুত্র পারভেজ। একমাত্র ছেলের আগমনে সংসারের চিত্র বদলাতে থাকে। পরিবারে উৎসব আমেজ বিরাজ করতে শুরু করে।

একে একে জন্ম নেয় হাসান ও পারভিন। পরিবারে যেন চাঁদের হাট বসে। ধীরেধীরে শহীদের সন্তানেরা বড় হয়। দুই ছেলেকে ড্রাইভার হিসেবে গড়ে তোলেন জনাব বাবুল হাওলাদার। কিছুদিন পর কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। দুই ছেলে উপার্জন শুরু করলে পরিবারের অর্থ মন্দা কাটতে শুরু করে। বর্তমানে তার দুই পুত্র ভাড়ায় চালিত প্রাইভেট কার চালক। তাদের রোজগারে শহীদ বাবুল হাওলাদারের রেখে যাওয়া সংসার এখনও যেন প্রানবন্ত। হঠাৎ দেশে তীব্র আন্দোলনের ডাক আসে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। যার আদি শুরু হয় ১৯৪৭ সালে।

'যতবার দেশে অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপিত হয়েছে, ততবারই খুনি হাসিনা ও তার দলবল হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।'

১৯৪৭-২০২৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ পরিক্রমা

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ধর্মের ভিত্তিতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা হয়-ভারত এবং পাকিস্তান। ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ কলঙ্কিত অধ্যায়। বিতর্কিত সংগঠন ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন 'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে উপস্থিত ছাত্রদের একটি অংশ তখনই 'নো-নো' বলে প্রতিবাদ জানায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছিল। ধর্মঘট প্রতিহত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলো। সমবেত ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ এবং গুলি বর্ষণ করে; ঘটনাস্থলে আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ এবং আব্দুল জব্বার-তিনজন মারা যান। হাসপাতালে মারা যান আব্দুস সালাম।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ হাজারো মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৯৫৬ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষার হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি কার্যকর হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ভাষা শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়। ১৯৬৯ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ২ মার্চ ১৯৭১ কারফিউ ভেঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। ৭ মার্চ ১৯৭১ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবকে দুই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে

মেনে নিতে ঘোষিত হয় "এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম,স্বাধীনতার সংগ্রাম।" আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে বিহারী-পাঞ্জাবীদের হত্যা, ধর্ষণ, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া সম্পদ লুট, ক্যান্টমেন্টে গুলোতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পরিচালিত হয় অপারেশন সার্চলাইট। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। চারিদিকে বিজয় উৎসব। ১৯৭৫ জানুয়ারি, বাকশাল গঠন। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের প্রস্থান ঘটে। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৮২ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করে বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন জারি করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরপর ১৯৮৬ সালে নির্বাচনের আয়োজন করে আবারো

রাষ্ট্রপতি হন তিনি এবং শেষে প্রবল গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর।

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসেন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। ১৯৯৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন খালেদা জিয়া। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় আসেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ২০০৮ আবারো ক্ষমতায় আসেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী খুনি শেখ হাসিনা।

২০১৩ সালের ০৫ মে শাপলা চত্তরে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে স্বৈরাচারী হাসিনার দোসর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশ বাহিনী। ক্ষমতায় এসে দেশকে লুটের রাজ্য এবং হত্যাযজ্ঞে পরিণত করে হাসিনা ও তার দলবল। ২০১৪ সালে ব্যালট বক্স লুট করে তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসে ফ্যাসিবাদী সরকার। নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো।

২০১৮ আবারও ভোট চুরি করে চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন রক্তখেকো হাসিনা। ফ্যাসিস্ট হাসিনার ইন্ধনে ২৯ জুলাই রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থী রাজিব ও দিয়াকে বাস চাপা দিয়ে পিষ্ট করে হত্যা করা হয়। ২৯ জুলাই থেকে ০৮ আগস্ট এর প্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা জানিয়ে ছাত্র-জনতা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করে। আন্দোলন প্রতিহত করতে বিতর্কিত সন্ত্রাসী সংগঠন আওয়ামী ছাত্র লীগের ক্যাডাররা শিক্ষার্থীদের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। চারিদিকে ব্যাপক সহিংসতা চালায় খুনী হাসিনার দোসরারা। যতবার দেশে অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপিত হয়েছে, ততবারই খুনি হাসিনা ও তার দলবল হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। ২০২৪ পঞ্চম বারের মত ভোট ডাকাতি করে আরও ভয়ঙ্কর রূপে ক্ষমতায় আসে নরখাদক শেখ হাসিনা। তবে এবার আর পেশী শক্তি দিয়ে টিকে থাকতে পারে না স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। দেশ থেকে পলায়ন করে প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হয়।

'আন্দোলন ও বিক্ষোভ-সংঘর্ষে বেশি মৃত্যু হয়েছে শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের'

স্বৈরাচারের উচ্ছেদিত ঘটনা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪। চারিদিকে তখন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন চলে। ছাত্ররা অলিগলি মহাসড়ক অবরোধ করে তাদের দাবি দাওয়া উত্থাপিত করে। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি ইন্ধন দেন। দলীয় ছাত্রদের হাতে লাঠিসোঁটা, রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, ককটেল, দেশীয় অস্ত্র, রাইফেল প্রভৃতি তুলে নিতে বলেন। সরাসরি পুলিশ বাহিনীকে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, ছড়রা গুলি, ও ফায়ারের নির্দেশ দেয়া হয়। যার নেতৃত্বে ছিল ঘাতক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক ডিবি প্রাধান হারুন ও তার বাহিনী। এসব বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে যায় ছাত্ররা। আন্দোলন ও বিক্ষোভ-সংঘর্ষে বেশি মৃত্যু হয় শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের।

যেভাবে তিনি শহীদ হন

স্বৈরাচার খুনি হাসিনার বরাদ্দকৃত কোটার বিরুদ্ধে সারাদেশের জনগণ আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ শামিল হয়। শহীদ বাবুল হাওলাদার তার বড় ছেলেকে নিয়ে ১৯ জুলাই ২০২৪ বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি পলাশবাগে শুরু হয়ে রামপুরার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ পুলিশ গুলি ছোড়ে। পারভেজ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সেদিন সন্তান পালিয়ে যেতে পারলেও পিতা হাওলাদার পালিয়ে যেতে পারেনি। পুলিশের একটি গুলি তার শরীরে এসে আঘাত হানে। জখম হয়ে কাৎরাতে থাকেন তিনি। অতঃপর তাকে ঢামেক হাসপাতালে নেয়া হয়। দীর্ঘ আটদিন আইসিইউ থাকার পর ২৮ জুলাই শাহাদত বরণ করেন তেজস্বী বীর শহীদ বাবুল হাওলাদার। পরবর্তীতে এই মহান গুনির লাশ জানাজা শেষে আজমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ঘটনার প্রমান

নিহতের শ্যালক সাজু বেপারী বলেন, আমার দুলাভাই শহীদ বাবুল হাওলাদার গত ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে বাম হাত ও গলার নিচে গুলি বিদ্ধ হয়। সেই অবস্থায় আমরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করি। নয়দিন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ২৮ জুলাই রাত ৮.২০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'আমি জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে থাকি।'

(সুরা তাওবা : ১১১)।

এক নজরে শহীদ মো: বাবুল হাওলাদার

নাম	: মো: বাবুল হাওলাদার, পেশা: রংমিস্ত্রী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৩-০২-১৯৭২, ৫৬ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২৮-০৭-২০২৪, রাত ৮:২০ মিনিট
শাহাদাত বরণের স্থান	: ঢামেক
দাফন করা হয়	: আজিমপুর কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আপড়, আশালির চর উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
পিতা	: জাবের আলী হাওলাদার (মৃত)
মাতা	: সুফিয়া বেগম (মৃত)
স্ত্রী	: মানোয়ারা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: পৈতৃক বাড়ি বা আবাদি জমি নেই
সন্তানের বিবরণ	: দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদ্বয় ভাড়ায় চালিত প্রাইভেটকার চালক, মেয়ে বিবাহিতা

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন। স্থায়ী বাসস্থান বা জমি নেই

২. শহীদের চিকিৎসা খরচ যোগাতে পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা যেতে পারে। ঋণের পরিমাণ-৫০,০০০/- টাকা

৩. শহীদের স্ত্রীকে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মো: আমির হোসেন

ক্রমিক : ০৫৯

আইডি : ঢাকা সিটি ০৫৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আমির হোসেন পেশায় ছিলেন একজন রিকশাচালক। তিনি ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ বরগুনা জেলার মৌপচরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঢাকার রামপুরায় উলন এলাকায় থাকতেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হন

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার জুমার নামাজের পর রিকশা নিয়ে বের হন আমির হোসেন। স্বৈরাচারী সরকারের লালিত পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীর তাণ্ডবের কারণে আগের দুই দিন তিনি রিকশা নিয়ে বের হতে পারেন নি। ঘরে খাবার নেই। সন্তানেরা না খেয়ে। বাধ্য হয়েই রাস্তায় আসতে হয় তার। দুপুর আনুমানিক আড়াইটার দিকে রামপুরা বিটিভি ভবনের সামনে পুলিশের গুলির মুখে পড়েন। একটি গুলি তাকে বিদ্ধ করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন আমির হোসেন। পরদিন সকাল ৯ টায় বরগুনায় তার নিজ গ্রামে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

তিন শিশু সন্তানের জনক আমির হোসেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। রিকশা চালিয়ে দৈনিক গড়ে ৫০০ টাকা রোজগার করতেন। রেখে গিয়েছেন ৮০ হাজার টাকার ঋণ।

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

বাসস্থান, এককালীন সহযোগিতা ও সন্তানদের লেখাপড়া কেন্দ্রিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

শহীদের পূর্ণনাম	: মো: আমির হোসেন
জন্ম	: ২০ মার্চ ১৯৯৪, বরগুনা
পেশা	: রিকশাচালক
পিতা	: আলতাফ হোসেন (মৃত)
মাতা	: খতেজান, গৃহিণী
স্ত্রী	: আননী (২৮), গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: বরগুনা জেলার ছোটবগী ইউনিয়নের মৌপচরা গ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা নং ৫৩, গলি নং ৬০, উলন, রামপুরা, ঢাকা
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: ২ ছেলে, ১ মেয়ে
বড় ছেলে	: আমিনুল ইসলাম আরমান (৭), ছাত্র
ছোট ছেলে	: আরিয়ান (৪)
মেয়ে	: আমেনা (১)

"লাশ ঘরের ফ্লোরে পড়ে থাকা ৮-১০ টি লাশ সরানোর পরে নাইমুরের লাশ চিনতে পারেন তার মা"

শহীদ মো: নাইমুর রহমান

ক্রমিক : ০৬০

আইডি : ঢাকা সিটি ০৬০

আমাদের দেশটা দীর্ঘ সময় ধরে অরাজকতা ও জুলুমের মধ্য দিয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ গত ৫ আগস্ট আমরা আওয়ামী জুলুম থেকে মুক্তি পেয়েছি তার জন্য মহান আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। আমাদের এই জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে যে সমস্ত মানুষ নিহত হয়েছে তাদের অবদান আমরা কখনো ভুলব না। শহীদ মো: নাইমুর রহমানের মতো অকুতোভয় সাহসী যুবকদের জন্যই আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করতে পারছি। নাইমুর রহমানের মতো হাজারো যুবক তাদের তাজা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বৈরশাসকের পতনের মাধ্যমে এ দেশ থেকে বৈষম্য দূর করেছে।

দীর্ঘদিন জুলুম নির্যাতন আর বৈষম্যের ভিতরে বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। অত্যাচার নির্যাতন আর বৈষম্য দেখে বাংলাদেশের ছাত্র জনতাসহ সকল মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা এবং সাধারণ মানুষ আর বিরোধী দলগুলো আন্দোলনে রাজপথে নামে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মতো তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য শপথ গ্রহণ করে। অবশেষে ৫ আগস্ট ২০২৪ এদেশের গণহত্যাকারী শাসক আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকবার স্বাধীনতার নাম লিখিত হয়।

প্রাথমিক পরিচিতি

বাপ মায়ের ভিটে মাদারীপুরে হলেও নাইমুর জন্মসূত্রে ঢাকার ছেলে। ২০০৩ সালের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারি পিতা মোঃ খলিলুর রহমান এবং মাতা মোছাঃ নাসিমা খাতুনের মুখ উজ্জ্বল করে জন্ম নেয় নাইমুর রহমান। তিনি তার আচরণে সৎ ছিলেন। তার অশ্রুসিক্ত চোখ সততাকে নির্দেশ করে এবং তার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। তিনি সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

তিনি তার পিতাকে সম্মান করতেন এবং তার মায়ের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। নাঈমুর ছোটকাল থেকেই অনেক মেধাবী ছিলেন। প্রাইমারি স্কুলে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেকগুলো সম্মানজনক পুরস্কার অর্জন করেছেন। কলেজের পড়ালেখার পাশাপাশি তেজগাঁও এলাকার নর্থ ইন্ড কফি রেস্তোরাঁয় পার্টটাইম কাজ করতেন। পড়ালেখার খরচ জুগিয়ে সংসারে বাবাকে সহায়তাও করতেন। সরকারি বড় কোনো ব্যাংকে চাকরি করবে এই আশায় ভালো সাবজেক্ট নিয়ে গুলশান কমার্স কলেজে ভর্তি হন।

কিন্তু যত ভালো বিষয়ই হোক আর যত বড় কলেজই হোক না কেন স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলে কোনো লাভ নেই। কারণ কোটার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেদের মনঃপুত ব্যক্তিদের ছাড়া চাকরি সাধারণ ছাত্রদের ভাগ্যে হবে না। নাঈমুর রহমান এই চক্রান্তকে নস্যাৎ করার জন্য বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের চক্রান্ত ঠিকই নস্যাৎ হয়। সাথে সাথে নাইমুরও দুনিয়ার সফর শেষ করেন।

শহীদ নাইমুর রহমানের শাহাদত সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

মায়ের শত বাধা উপেক্ষা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন রাজধানীর গুলশান কমার্স কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ নাইমুর রহমান। প্রতিদিনই বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মাকে বলতেন স্বৈরাচারের পতন হবেই। সেই পতন ঠিকই হলো তবে দেখে যেতে পারলেন না নাইমুর। স্বৈরাচারের দোসরদের বুলেটে প্রাণ দিলেন তিনি। হাসপাতালের মর্গে নাইমুরের মা আট থেকে দশটি লাশ সরিয়ে ছেলের লাশ খুঁজে পান। এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না স্বজন ও এলাকাবাসী।

স্বজনরা জানান, ১৯ জুলাই বিকালে নাইমুরের ফোন থেকে কল আসে বাবা মোঃ খলিলুর রহমানের ফোনে। সেই কলেই জানতে পারেন রাজধানীর উত্তর বাড্ডার এ এম জেড হাসপাতালে আছে নাইমুরের গুলিবিদ্ধ লাশ। গুলশান কমার্স কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন নাইমুর। তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় তিনি। পড়ালেখার পাশাপাশি তেজগাঁও এলাকার নর্থ ইন্ড কফি রেস্তোরাঁয় পার্টটাইম কাজ করতেন। পড়ালেখার খরচ জুগিয়ে সংসারে বাবাকে সহায়তাও করতেন। রাজধানীর গুলশান থানাধীন কালাচাঁদপুর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা মোঃ খলিলুর রহমানের বড় ছেলে তিনি। খলিলুর প্রাইভেটকার চালক হিসেবে কাজ করে সংসার চালান।

কালাচাঁদপুর পশ্চিমপাড়ার পাকা মসজিদ সংলগ্ন দুই রুমের ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকেন নাইমুরের পরিবার। শহীদের পিতা জানান, ২২ হাজার টাকা বেতনে তিনি সংসার চালান। নাইমুর ছিল তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। পড়ালেখা শেষ করে সংসারের হাল ধরবেন এমন আশা ছিল বাবা খলিলের। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন নাইমুর। গত ১৯ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডা বাজার সংলগ্ন প্রধান সড়কে পুলিশের গুলিতে মারা যান। বুকের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হন নাইমুর। তার মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বের হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ১৯ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গুলিবিদ্ধ হন নাইমুর।

তিনি বলেন, "আমার ছেলের মোবাইল থেকে একটি ফোন আসে।

আমার কাছে জানতে চায় আমি সম্পর্কে নাইমুরের কী হই?' আমি বললাম, 'আমার ছেলে।' তখন ওপাশ থেকে বলে আপনার ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। উত্তর বাড্ডার এ এম জেড হাসপাতালে আসেন। আমি সাথে সাথেই দুই ছেলে, স্ত্রী ও এক ভাগিনাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে রাস্তায় প্রচণ্ড গুলির শব্দ আর কাঁদানে গ্যাস দেখতে পাই।"

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়ে অবশেষে হাসপাতালে পৌঁছালাম। হাসপাতালের লাশঘরে আট থেকে দশটি লাশ ছিল। এর মধ্য থেকে নাইমুরের লাশ শনাক্ত করে তার মা। সাথে সাথেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। পরিবারের অন্যরাও লাশ জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তিনি বলেন, "হাসপাতালের লোক তখন বলে, "এখানে পরিস্থিতি খারাপ। লাশ বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। আপনারা লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।"

হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স চাইলে দেয়নি। পরে অটোরিকশায় করে হাতের ওপর লাশ নিয়ে বাসার উদ্দেশে রওয়ানা হই। বাসায় আসার পথে নতুন বাজার এলাকায় এলে প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে পড়ি আমরা। কোকাকোলা ব্রিজের ওখানে এলে আমার ছোট ছেলে মাইবুর রহমান আর ভাগিনার রিকশাটি আটকে দেয় পুলিশ। রিকশা থেকে নামিয়ে দেয় তাদের। তখন আমার ছোট ছেলে ভয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে। ওর বয়স মাত্র ৮ বছর।

পরে বারিধারার ভেতর দিয়ে চলে আসে তারা। তবে আমি ও আমার স্ত্রী ছেলের লাশ নিয়ে কোকাকোলা মোড়ে এলে আন্দোলনকারী ছাত্ররা আমাদের রাস্তা পার করে দেয়। তখন সোয়া ৬টা বাজে। মারামারি চলছিল পুরো এলাকায়। আমার মেজো ছেলের পায়ের ওপর নাইমুরের লাশ ছিল।

নদ্দা এলাকায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমার মেজো ছেলে সাইমুর রহমানের হাতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। অনেক কষ্টে লাশ নিয়ে প্রথমে কালাচাঁদপুরের বাসায় আসি। এরপর সেখানে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর থানার খোয়াজপুর ইউনিয়নের মঠেরবাজার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করি।" (নানাদের এলাকা)

খলিলুর রহমান বলেন, আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মামলার এক নম্বর আসামি করা হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী,পুলিশের সাবেক আইজিপি, অতিরিক্ত আইজিপি, ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ পুলিশের বেশ কয়েকজনকে। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই "

শহীদের বন্ধু এহতেশাম বিল্লাহ সিয়াম বলেন: "শহীদ নাইমুরের সাথে আমার ক্লাস টু থেকে পরিচয়। সেই থেকে আমাদের দীর্ঘ ১২ বছরের বন্ধুত্ব। সে একজন ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী মানুষ ছিল। নিয়মিত নামাজ পড়ত। পরোপকারী ও মিশুক প্রকৃতির ছিল। এই আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে শহীদ নাইমুর রহমান। আমি আমার বন্ধুর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছি এবং হুকুমদাতা-সহ হত্যাকান্ডে জড়িত প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রত্যাশা করছি।"

১৬ | যুগান্তর
বিএনপি আমলে ছাত্রলীগ পরিচয়ে বরখাস্ত
চাকরি ফিরে পেয়ে 'পুলিশ লীগ' তৈরি করেন তারা
সংকটে রাজউকের ড্যাপ
সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে শান্ত টঙ্গী গাজীপুর আশুলিয়া
মামলার ভার কমছে খালেদা জিয়ার
লাশের স্তূপে নাইমুরকে খুঁজে পান মা
সৃজনশীল পদ্ধতি ফিরছে শিক্ষাব্যবস্থায়

লাশের স্তূপে নাইমুরকে খুঁজে পান মা

লাশ নিয়ে বাসায় ফেরার পথেও হামলার শিকার হন স্বজনরা

মো. নাইমুর রহমান

যুগান্তর প্রতিবেদন

মায়ের শত বাধা উপেক্ষা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন রাজধানীর গুলশান ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী মো. নাইমুর রহমান। প্রতিদিনই বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মাকে বলতেন স্বৈরাচারের পতন হবেই। সেই পতন ঠিকই হলো তবে দেখে যেতে পারলেন না নাইমুর। স্বৈরাচারের দোসরদের বুলেটে প্রাণ দিলেন তিনি। হাসপাতালের মর্গে নাইমুরের মা আট থেকে দশটি লাশ সরিয়ে ছেলের লাশ খুঁজে পান। এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না স্বজন ও এলাকাবাসী।

স্বজনরা জানান, ১৯ জুলাই বিকালে নাইমুরের ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

লাশের স্তূপে নাইমুরকে খুঁজে পান মা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফোন থেকে কল আসে বাবা মো. খলিলুর রহমানের ফোনে। সেই কলেই জানতে পারেন রাজধানীর উত্তর বাড্ডার এ এম জেড হাসপাতালে পড়ে আছে নাইমুরের গুলিবিদ্ধ লাশ।

গুলশান ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন নাইমুর। তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় তিনি। পড়ালেখার পাশাপাশি তেজগাঁও এলাকার নর্থ ইন্ড কফি রেস্তোরাঁয় পার্টটাইম কাজ করতেন। পড়ালেখার খরচ জুগিয়ে সংসারে বাবাকে সহায়তাও করতেন। রাজধানীর গুলশান থানাধীন কালাচাঁদপুর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা মো. খলিলুর রহমানের বড় ছেলে তিনি। খলিলুর প্রাইভেটকার চালকের কাজ করে সংসার চালান।

মঙ্গলবার দুপুরে কালাচাঁদপুর পশ্চিমপাড়ার পাকা মসজিদ সংলগ্ন ওই বাসায় গিয়ে কথা হয় খলিলুর রহমানের সঙ্গে। ভবনের দ্বিতীয় তলায় দুই রুমের ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকেন খলিলের পরিবার। তিনি জানান, মাত্র ২২ হাজার টাকা বেতনে সংসার চালান। নাইমুর ছিল তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। পড়ালেখা শেষ করে সংসারের হাল ধরবেন এমন আশা ছিল বাবা খলিলের।

তিনি যুগান্তরকে জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন নাইমুর। গত ১৯ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডা বাজার সংলগ্ন প্রধান সড়কে পুলিশের গুলিতে মারা যান। বুকের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হন নাইমুর। তার মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বের হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ১৯ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গুলিবিদ্ধ হন নাইমুর।

তিনি বলেন, "আমার ছেলের মোবাইল থেকে একটি ফোন আসে। আমাকে জানতে চাই নাইমুরের কি লাগি। আমি বললাম আমার ছেলে। তখন বলে আপনার ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। উত্তর বাড্ডার এ এম জেড হাসপাতালে আসেন। তখন দুই ছেলে, স্ত্রী ও এক ভাগিনাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হলাম। যাওয়ার পথে রাস্তায় প্রচণ্ড গুলির শব্দ আর কাঁদানে গ্যাস দেখতে পাই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়ে হাসপাতালে পৌছি। হাসপাতালের লাশঘরে আট থেকে দশ লাশের মধ্যে থেকে নাইমুরের লাশ শনাক্ত করে তার মা নাসিমা। এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। পরিবারের অন্যরাও লাশ জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তিনি বলেন, হাসপাতালের লোক তখন বলে, এখানে পরিস্থিতি খারাপ। লাশ বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। আপনারা লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স চাইলে দেয়নি। পরে অটোরিকশায় করে হাতের ওপর লাশ নিয়ে বাসার উদ্দেশে রওয়ানা হই। বাসায় আসার পথে নতুন বাজার এলাকায় এলে প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে পড়ি আমরা। কোকাকোলা ব্রিজের ওখানে এলে আমার ছোট ছেলে মাহবুব রহমান (৮) আর ভাগিনার রিকশাটি আটকে দেয় পুলিশ। রিকশা থেকে নামিয়ে দেয় তাদের। তখন আমার ছোট ছেলে ভয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছে। পরে বারিধারার ভেতর দিয়ে চলে আসে তারা। তবে আমি ও আমার স্ত্রী ছেলের লাশ নিয়ে কোকাকোলা মোড়ে এলে আন্দোলনকারী ছাত্ররা আমাদের রাস্তা পার করে দেয়। তখন পোয়া ৬টা বাজে। মারামারি চলছিল পুরো এলাকায়। আমার মেজো ছেলের পায়ের ওপর লাশ ছিল। নর্দা এলাকায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা আমার মেজো ছেলে সাইমুর রহমানের হাতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। অনেক কষ্টে লাশ নিয়ে প্রথমে কালাচাঁদপুরের বাসায় আসি। এরপর সেখানে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর থানার খোয়াজপুর ইউনিয়নের মঠেরবাজার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করি।

খলিলুর রহমান বলেন, আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মামলার এক নম্বর আসামি করা হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের সাবেক আইজিপি, অতিরিক্ত আইজিপি, ডিএমপির সাবেক কমিশনারসহ পুলিশের বেশ কয়েকজনকে। আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যাদের ডাকে আন্দোলনে গিয়ে ছেলে জীবন দিল তারা কেউ খবরও নিল না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ নাইমুর রহমান
Name: MD NAIMUR RAHMAN
পিতা: মোঃ খলিলুর রহমান
মাতা: নাছিমা
Date of Birth: 01 Jan 2003
ID NO: 1963931629

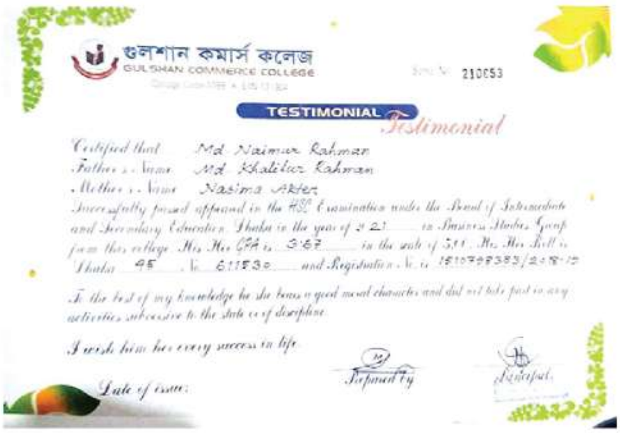

গুলশান কমার্স কলেজ
GULSHAN COMMERCE COLLEGE

Serial No. 210053

TESTIMONIAL
Testimonial

Certified that Md. Naimur Rahman
Father's Name Md. Khalilur Rahman
Mother's Name Nasima Akter
Successfully passed appeared in the HSC Examination under the Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka in the year of 2021 in Business Studies Group from this college. His/Her GPA is 3.67 in the scale of 5.00. His/Her Roll is Dhaka 95 No. 611530 and Registration No. is 1510798383/2018-19

To the best of my knowledge he/she bears a good moral character and did not take part in any activities subversive to the state or of discipline.

I wish him/her every success in life.

Date of issue:

Prepared by

Principal

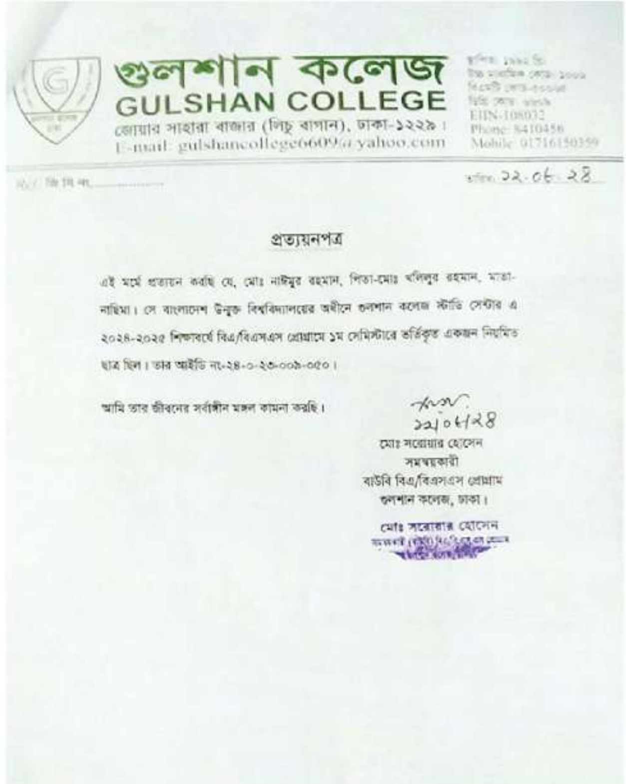

গুলশান কলেজ
GULSHAN COLLEGE
জোয়ার সাহারা বাজার (লিচু বাগান), ঢাকা-১২২৯।
E-mail: gulshancollege6609@yahoo.com

তারিখ: ২২.০৮.২৪

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ নাইমুর রহমান, পিতা-মোঃ খলিলুর রহমান, মাতা-নাছিমা। সে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গুলশান কলেজ স্টাডি সেন্টার এ ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ১ম সেমিস্টারে ভর্তিকৃত একজন নিয়মিত ছাত্র ছিল। তার আইডি নং-২৪-০-২৩-০০৯-০৫০।

আমি তার জীবনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

২২/০৮/২৪
মোঃ সরোয়ার হোসেন
সমন্বয়কারী
বাউবি বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম
গুলশান কলেজ, ঢাকা।

এক নজরে শহীদ নাইমুর রহমান

পূর্ণাঙ্গ নাম	: মো: নাইমুর রহমান
পিতা	: মো: খলিলুর রহমান
মাতা	: মোছা: নাসিমা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-২০০৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুন্সীকান্দি, ইউনিয়ন :ভান্ডারিকান্দি , থানা:শিবচর, জেলা: মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা ক-৭৫/২, কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: গুলশান কমার্স কলেজ, অনার্স প্রথম বর্ষ, একাউন্টিং
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত

পরিবারের সদস্যদের পরিচয়

পিতা	: মো: খলিলুর রহমান (৪৪) পেশায় কার ড্রাইভার
মাতা	: মোছা: নাসিমা খাতুন (৩৮) গৃহিণী
ভাই বোন	: ২ ভাই বোন নেই ১. সাইমুর রহমান(১৮) নবম শ্রেণির ছাত্র, কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা ২. মাইবুর রহমান (৮) দ্বিতীয় শ্রেণি, কনফিডেন্স স্কুল ঢাকা

আক্রমণের স্থান ও সময়	: শাহজাদপুর (উত্তর বাড্ডা) ১৯-০৭-২০২৪ বিকাল ৪:৩০
শাহাদাতের সময়	: শাহজাদপুর (উত্তর বাড্ডা) ১৯-০৭-২০২৪ বিকাল ৪:৩০
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ এবং পুলিশ
গুলি করার নির্দেশদাতা	: শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাবেক সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ আরো অনেকে
জানাজা	: ১ম জানাজা: ১৯-০৭-২০২৪, ঢাকা কালাচাঁদপুর, সন্ধ্যায় : ২য় জানাজা: ২০-০৭-২০২৪, শিবচর, মাদারীপুর (গ্রামের বাড়ি), সকালে
দাফন	: মাদারীপুর খুজপুর মটের বাজার কবরস্থান

শহীদ নুর হোসেন পিয়াস

ক্রমিক : ০৬১
আইডি : ঢাকা সিটি ০৬১

শহীদ পরিচিতি

৫ আগস্ট পলায়ন করেছে স্বৈরাচার। পতন হয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনার। বিজয়ী ছাত্র-জনতা। ঢাকায় ফুফুর বাসা থেকে বের হন নুর হোসেন পিয়াস বিজয় উল্লাসে। তখনও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গুলি ছুড়ছে ফ্যাসিস্টের পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী। পিয়াস গুলিবিদ্ধ হন মাথায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। পিয়াসের জন্ম ২০০৬ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে। বাবার নাম জনাব বাবর মিয়া। মা ফাতেমা বেগম। গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন: নোয়ান্নই, থানা: সদর নোয়াখালী। কাজের সন্ধানে এসেছিলেন ঢাকায় ফুফুর বাসায়। বাবা রাজমিস্ত্রী। পিয়াসের আছে আরও চার ভাই, এক বোন; বোন বিবাহিত। নুর হোসেন পিয়াস গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি ছিলেন বেকার।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ নুর হোসেন পিয়াস নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কাজের সন্ধানে। ইচ্ছা ছিল ঢাকায় ফুফুর বাসায় থেকে কাজ খুঁজবেন। তখন চলছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। স্বৈরাচারী সরকার কারফিউ জারি করেছিল আর মোবাইল নেটওয়ার্কও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বাসা থেকে বের হওয়া কিংবা কারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন ও বন্দি। ৫ আগস্ট জনতার আন্দোলনে পালিয়ে যায় ফ্যাসিস্ট হাসিনা। তখনও থামেনি স্বৈরাচারের দোসর পুলিশ। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় তখনও গুলি ছুড়ে তারা। পুলিশের সাথে যোগ দেয় আওয়ামী পাণ্ডা যুবলীগ। তারাও গুলি ছুড়ে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নুর হোসেন পিয়াস মাথায় (ডানপাশে) গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। শহীদ নুর হোসেন পিয়াসের জানাজা হয় বাড্ডায়। তারপর তাকে নেওয়া হয় গ্রামের বাড়িতে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে নিজ গ্রামে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ পিয়াসরা পাঁচ ভাই এক বোন। বাবা রাজমিস্ত্রী, মা গৃহিণী। বাবা-মা অসুস্থ। গ্রামে তাদের ১০ শতক জমি আছে।

আত্মীয়দের অনুভূতি

নুর হোসেনের ভাই পারভেজ হোসেন বলেন, "আমার ভাই খুব ভালো মানুষ ছিল। গ্রামের সকল ছেলেদের সাথে মিলেমিশে চলতো। খেলাধূলা পছন্দ করতো। তার ইচ্ছা ছিল একদিন অর্থ উপার্জন করে সংসারের অভাব দূর করবে। আমার তরতাজা ভাইটাকে যারা হত্যা করল আমরা তাদের বিচার চাই।"

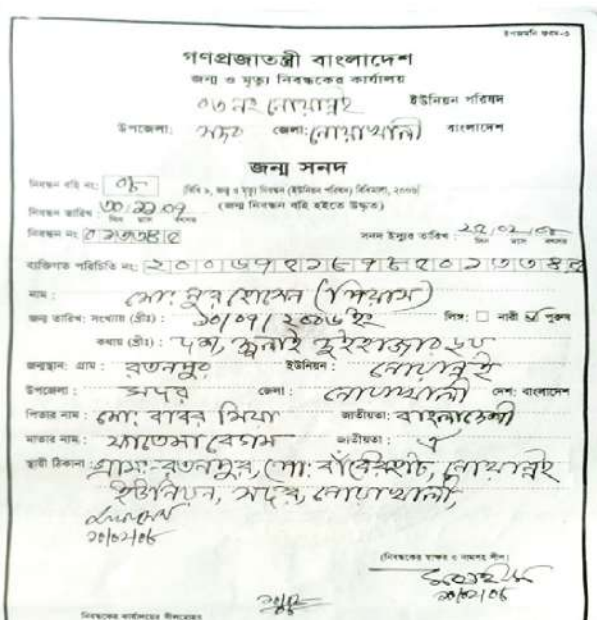

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
০৩ নং নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: সদর জেলা: নোয়াখালী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ০৮
নিবন্ধন তারিখ: ৩০/১১/০৭
সনদ ইস্যুর তারিখ: ২২/০২/০৮
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২০০০৬৭৫২১৬৭৮৫০১৩৩৪৫
নাম: মো: নুর হোসেন (পিয়াস)
জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রী): ১০/০৭/২০০৬ ইং
লিঙ্গ: পুরুষ
জন্মস্থান: গ্রাম: রতনপুর ইউনিয়ন: নোয়ান্নই
উপজেলা: সদর জেলা: নোয়াখালী দেশ: বাংলাদেশ
পিতার নাম: মো: বাবর মিয়া জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: ফাতেমা বেগম জাতীয়তা: ঐ
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-রতনপুর, পো: বাঁধেরহাট, নোয়ান্নই ইউনিয়ন, সদর, নোয়াখালী,

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

বিজয় মিছিলের শহীদ নুর হোসেন পিয়াস

প্রস্তাবনা

১. তার বাবা-মা অসুস্থ। তাদের মাসিক ও এককালীন অনুদান জরুরি।
২. শহীদের পিতার জন্য ব্যবসার পুঁজির বরাদ্দ জরুরি
৩. তার ভাইদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরি প্রদান।
৪. পড়ালেখার সার্বিক সহযোগিতা।
৫. পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা আজীবন বিনামূল্যে করার ব্যবস্থা করা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩ নং নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডাকঘর: বাঁধেরহাট, সদর, নোয়াখালী।

নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদপত্র

1766

বাংলাদেশ। তিনি আমার ইউনিয়নের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র ভাল। আমার জানামতে তিনি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজে জড়িত নহেন।

আমি তাঁহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

মোঃ দিলদার হোসেন জুনায়েদ
চেয়ারম্যান
৩ নং নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

৩নং নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা

এক নজরে শহীদ নুর হোসেন পিয়াস

নাম	: নুর হোসেন পিয়াস
জন্ম	: ১০-০৭-২০০৬
শাহাদাত	: ০৫-০৮-২০২৪
পিতা	: বাবর মিয়া
মাতা	: ফাতেমা বেগম
শহীদের ভাই-বোন	: চার ভাই এক বোন
লেখাপড়া	: ৬ষ্ঠ শ্রেণি
পেশা	: বেকার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রতনপুর, ইউনিয়ন : নোয়ান্নই, থানা: সদর, নোয়াখালী
ঘটনার স্থান	: ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে
দাফন	: নিজ এলাকায়, স্থানীয় কবরস্থানে
শাহাদতের চিত্র	: হাসিনা সরকার পলায়নের পর বিজয়োল্লাসে নেমে আসেন রাজপথে। স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ গুলি চালায়, আর তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

وَ لَا تَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ قُتِلُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اَمۡوَاتًا ؕ
بَلۡ اَحۡیَآءٌ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ یُرۡزَقُوۡنَ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

-সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৬৯

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী